# মোহিনী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড | কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক :
ময়ুখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মজুমদার

করকমলেষু—

আমাদের প্রকাশনায়
লেখকের অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ-

---

আঁধার পেরিয়ে

বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে

রিসেপশনিস্ট

ফরেস্ট বাংলো

নির্জনে খেলা

ব্ল্যাক ক্যাট ( অনুবাদ )

লাল মৃত্যুর মুখোশ ( অনুবাদ )

লীডার প্রেম ( অনুবাদ )

# এক

কদম্ব ফুলের মত নরম হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়ল মঞ্চের ওপর। করতালের ধ্বনি দিতে দিতে মঞ্চে এসে ঢুকলেন গুরু মাধবী আম্মা। পা দুটি তাঁর বিচিত্র আলপনা আঁকতে আঁকতে বৃত্তাকারে এগিয়ে চলেছে। গানের একটি পদ বেজে চলেছে গলায়। তালমের বোল পায়ের ছন্দে কণ্ঠের সুরে নিখুঁত হারমোনি।

মাধবী আম্মার ঠিক পেছনে ছায়ার মত অনুসরণ করে আসছে প্রেমা মেনন। বিকশিত প্রেমা। গুরুর চরণ বিন্যাসের নির্ভুল অনুকরণ করে চলেছে সে। শুধু চরণ নয়, কর-চরণ-বিন্যাস। একটি শ্বেত কুমুদ যেন হাওয়ার ছোঁয়ায় হিন্দোলিত হচ্ছে। আজ মঞ্চে প্রেমার প্রথম প্রবেশ রজনী। পদ্মনাভপুরম প্যালেসের দর্শক আসন পূর্ণ হয়ে গেছে বহু আগে। সহস্র চোখ আন্দোলিত ঢেউ-এর দেহে ভেঙে পড়া সূর্যরশ্মির মত প্রেমার ওপর আছড়ে পড়ছে। কেরালার নৃত্যের আকাশে নতুন নক্ষত্র ফুটে উঠল। গুরু মাধবী আম্মা দর্শকদের সামনে আজ দিয়ে যাবেন সেই নবোদিত নক্ষত্রের পরিচয়।

মোহিনী-নর্তকী প্রেমার পেছনে নাচের অভিনয় করে এগিয়ে আসছে যন্ত্র-সঙ্গীতের পুরো দলটি। কেউ বাজিয়ে চলেছে তিপি, কারো মুখের ছোঁয়ায় বেজে উঠেছে মুখবীনা, কেউ বাজাচ্ছে এডাক্কা, কেউ বা বোল তুলছে টপ্পু মাদ্দলমে।

মঞ্চ পরিক্রমা শেষ করে দলটি নেমে এল নীচে। প্রদক্ষিণ করল সারা প্রেক্ষাগৃহ। তারপর এক সময় মঞ্চের ওপর ফিরে এল ওরা। মাধবী আম্মা যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে বসলেন অর্ধবৃত্তাকারে। থেমে গেছে গান, থেমে গেছে বাদ্য, স্তব্ধ নাটমণ্ডপম্। প্রেমা এগিয়ে এল ধীর পদক্ষেপে। নমিত দেহে দুই করে করল গুরুর চরণবন্দনা। আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়াল মঞ্চের মাঝখানে।

বিপরীত মুখে জানু দুটি ভেঙে অর্ধমণ্ডলম্ মুদ্রায়, অর্ধ উপবেশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা। বুকের ওপর ঈষৎ ব্যবধানে দুটি বাহু নমিত। মাথার কেশগুচ্ছ বামে চূড়াবদ্ধ। রূপার চন্দ্রাকৃতি নেট্টিচুট্টি ঘিরে রেখেছে সেই কেশকলাপ। তার নীচে সাদা মল্লিকা বা মল্লাপ্পুর দোস্‌হতি বেষ্টনী। কানে ঝুলছে ঝুমকোর আকারে কুড়া কাড়্কন। মাট্টলের টানে চুলের সঙ্গে বাঁধা।

নাকে হীরের মুক্তির ওপর আলো পড়ে ঝলসে উঠছে। নীচে দুলছে মুক্তোর বিলাক। গলায় সোনার পুতলিমালা। হাতে হস্তকটকম্। মোহিনী আট্যমের মোহিনীমূর্তি।

সাদা পুডাবা পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা। সোনালী জরির পাড় চরণ, কটি আর বক্ষোদেশ বেষ্টন করে হারিয়ে গেছে। মুখে মৃদু হাসির আভা। চোখের তারা স্থির। শুধু কালো ভ্রূ দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শরতের আকাশে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে এসে দাঁড়িয়েছে একখণ্ড সাদা মেঘ। কিনার ঘিরে সোনার আলোর রেখা। গুরু মাধবী আম্মার কথা মনে পড়ছে প্রেমার। দেহ আর আত্মাকে যোগ যুক্ত করবে, তবেই তোমার দেহের শাখায় শাখায় ফুটে উঠবে আনন্দের ফুল।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাই এতক্ষণ নিজের মধ্যে যোগযুক্ত হচ্ছিল প্রেমা।

এবার চোখের কোণে তাকিয়ে সুর-শিল্পীদের জানিয়ে দিল, সে প্রস্তুত। মুহূর্তে বেজে উঠল সোলকুট্টুর বোল। মাধবী আম্মার কণ্ঠে প্রার্থনার সুর। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগল প্রেমার প্রসাধিত দেহ। রম্‌ঝম্ বেজে উঠল পাদস্বরম্। বোলের বাঁধনে প্রেমা বেঁধে নিচ্ছে দেহখানি। হস্ত, চরণ, নয়ন সব কিছু যেন বোলের তালে ধীর থেকে মধ্যলয়ে, মধ্য থেকে দ্রুত লয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে। হস্ত চরণ প্রক্ষেপে নয়ন বিভঙ্গে প্রেমা আজ মোহিনা।

দর্শকের আসনে বসে ইন্দ্র দেখছে প্রেমাকে। তার মনে হচ্ছে সমুদ্র মন্থন শুরু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শৈবাল আর মাছেরা সে দোলায় হিল্লোলিত।

এবার শুরু হয়েছে স্বরযতি। সরগম সাধছেন মাধবী আম্মা, নাচছে প্রেমা। নাচতে নাচতে লয় বাড়ছে আবার কমছে। কটির ঊর্ধে বাহু বক্ষ আন্দোলিত হচ্ছে।

ইন্দ্র দেখছে কেরালার জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে নারিকেল বৃক্ষের সারি, তারা রাতের হাওয়ায় দুলছে। দীর্ঘ কাণ্ডের ওপর পত্রপুঞ্জ হাওয়ার বেগে ঘুরে ঘুরে দোল খাচ্ছে। প্রেমার দেহ সেই দোলায় দুলছে। তার মেরুদণ্ডটি হয়ে গেছে বৃক্ষের ঋজুকাণ্ড। তার ওপর স্থাপিত বক্ষস্তন যেন সে বৃক্ষের সুপুষ্ট ফল। আর আন্দোলিত বাহুযুগল বৃক্ষের দীর্ঘ পত্রযুক্ত শাখা।

স্বরযতি শেষ হলে শুরু হল বর্ণম্। গান চলেছে। বাসকসজ্জায় সজ্জিত রাধা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে প্রিয়তমের। চোখেমুখে প্রিয় মিলনের

উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে অভিনয় করে চলেছে প্রেমা। দর্শকের আসনে বসে প্রতিটি দর্শক ভুলে গেছে তাদের বয়স। মহাকালের নিষ্ঠুর ভাঙনকে যেন নিজের যৌবন দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে প্রেমা। প্রতিটি দর্শককে সে যেন বলছে, মহাকালের বাঁধন মুক্ত হয়ে তুমি এস আমার অনন্ত প্রতীক্ষার পথ বেয়ে। আমার সমস্ত যৌবনের দান আমি তোমার হাতে তুলে দেব বলে অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসে আছি। তুমি আমার সেই প্রার্থিত পুরুষ। তোমাকে জরা স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি অনন্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি। আমি আমার যৌবন দিয়ে তোমাকে ছুঁয়ে দেব। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বোল। পল্লবী অনুপল্লবী ছুঁয়ে ছুঁয়ে গানে বাজছে শুধু, এসো এসো এসো, কেন তুমি এখনও উদাসীন!

বর্ণম্-এর পরে স্টেজে নেমে এল ক্ষণিক অন্ধকার। অমনি এক ঝাঁক পারাবত যেন চঞ্চল পাখনায় শব্দ তুলতে তুলতে উড়ে চলল আকাশে।

করতালি ধ্বনি যেন থামতেই চায় না।

আবার আলো লুটিয়ে পড়ল মঞ্চে। এবার পদম্। সরগম নেই, বোল নেই। শুধু গানে গানে মনের আকুতি জানিয়ে চলা। সমস্ত দেহে ফুটিয়ে তোলা সেই আকুতির আক্ষেপ।

আলেই পায়ুদে কন্না
এন মনম্ আলেই পায়ুদে
উন্ আনন্দ মোহন বেণু গান মদিল…।

তোমার আনন্দ মোহন বেণু গানে আমার মনে ঢেউ উঠেছে কৃষ্ণ। আমি সেই তরঙ্গে ভেসে চলেছি।

হে বিনোদ মুরলীধর আমি এত করে ডাকছি, তবু কেন তুমি নিশ্চল শিলার মত দাঁড়িয়ে আছ। সময় পার হয়ে যায়, কেন বুঝছ না প্রিয়তম। আমার অসহ্য যন্ত্রণার উপশম, আমার মৃত্যু আজ তোমার সামান্য ইচ্ছার দোলায় দুলছে।

নীলাম্বরীরাগের করুণ মূর্চ্ছনা প্যালেসের মসৃণ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ছে শ্রোতাদের বুকের ওপর।

আবার অন্ধকার আবার করতালি আবার আলোর ফুটে ওঠা। এবার প্রেমা যেন পেয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদকে। তাই আনন্দকে সে আর ধরে রাখতে পারছে না। তিলানার সপ্ততালে সে নিজের খুশীকে নাচের মুদ্রায় প্রকাশ করে চলেছে। অর্থহীন গানের একটা সুর শুধু ভেসে আসছে। সমস্ত দেহ কি যেন প্রকাশের বেদনায় শিউরে মঞ্জরিত হয়ে উঠছে।

যেদনা আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে আনন্দে। সমস্ত দেহের কম্পনে, মুক্ত বিভঙ্গে, কর-চরণ বিন্যাসে ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছে দেহের শাখা ভরা বসন্তের পর্যাপ্ত পুষ্প।

কখনো উপবেশন মুদ্রায়, কখনো বা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে সারা মঞ্চে প্রদক্ষিণ করে চলেছে প্রেমা।

ইন্দ্রের চোখে ফুটে উঠছে একখানা কদম্বু ভাল্লম। কেরালার ব্যাকওয়াটার বা কায়েলের ঢেউতে ওঠা-নামার খেলা খেলতে খেলতে ভেসে চলেছে সেই সজ্জিত তরণী।

ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল অন্ধকার আর সেই পাল তোলা তরণী তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের আলোড়িত সমুদ্রে।

আলোড়নে তখন পদ্মনাভপুরম্ প্যালেসও উদ্বেলিত। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উঠে পড়েছেন দর্শক আসন ছেড়ে। তাঁরা চঞ্চল পায়ে চলেছেন গ্রীণ রুমের দিকে। প্রেমাকে অভিনন্দন জানাতে হবে। শিল্পীকে দিতে হবে তার সৃষ্টির জন্য সাধুবাদ। হয়তবা তন্বী প্রেমার জন্যে আরও বেশী কিছু।

ইন্দ্র কিন্তু দাঁড়াল না, কিংবা গ্রীণরুমের দিকে পা বাড়াল না। মঞ্চকে পেছনে রেখে উৎসাহী জনতার জটলার ভেতর দিয়ে পথ করে বেরিয়ে এল বাইরে।

প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টখানায় ঈষৎ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। হাল্কা ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে লাগল বাতাসে। এতক্ষণ প্যালেস হলে যে ঘোরের ভেতর কাটছিল, সিগারেটের ধোঁয়ায় তার অনেকখানি কেটে গেল।

ক্যালেণ্ডারের গণনায় শীতের মাস কিন্তু নামগন্ধ নেই শীতের। এ প্রদেশের নাকি এই দস্তুর। না শীত না গরম। অর্থাৎ চরম কিছু নেই এর আবহাওয়ায়, শুধু আবহাওয়া কেন মানুষের মনেও। ইন্দ্র কেরালায় আসার আগেই শুনেছিল এসব। নীল নীল আকাশ আর সমুদ্রের মত উদার আর উদ্বেল এ দেশের নারী পুরুষের মন। দিগন্তজোড়া নারকেলের বন যেন চিরসবুজ আর সতেজ করে রেখেছে মালয়ালী এই মানুষগুলিকে। এদের এই অবাক পৃথিবীর ভেতর জেগে উঠেছে লোকসঙ্গীতের আশ্চর্য সব সুর, গড়ে উঠেছে কথাকলি, মোহিনী আট্যম, কৈকট্টিকলি, তুল্লাল ইত্যাদি নাচ।

ইন্দ্র প্যালেসের সামনের রাস্তায় উল্টোদিকে রেখেছে গাড়ীটা। তাই নৃত্যগৃহের বাইরের আলোর চোখ বাঁধানো উজ্জ্বলতা নেই এখানে। কয়েকটা

নারকেল গাছের ছায়া পথের ওপর ভেসে আসা আলোটাকে অনেকখানি শুষে নিয়েছে। ছায়ার ধূসর চাদরটায় নিজেকে আড়াল করে রাখতে বেশ ভাল লাগছে ইন্দ্রের। আজ পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আকাশটা কেমন যেন বিহ্বল।

দুটো সিগারেট পুড়িয়ে তৃতীয়টির প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে ইন্দ্র দেখল প্রেমা, সরিতা, মাধবী আম্মা নাটমণ্ডপের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। সঙ্গে উদ্যোক্তাদের কয়েকজন। দর্শকেরা কিছু আগে উচ্চগ্রামে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেছে। ইন্দ্র অনুভব করেছে তাদের উত্তাপ। অনুষ্ঠান তাদের নাড়া দিয়েছে, তারই সোচ্ছ্বাস প্রকাশ তাদের উষ্ণ আলোচনায়। ছোট্ট দলটি এসে দাঁড়াল ইন্দ্রের সামনে। ইন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রেমাই কথা বলল, আপনাকে একটু কষ্ট ফেলব মিঃ রায়। মাধবী আম্মাকে ওঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আপনি স্ট্রেট চলে যাবেন হোটেলে। মিঃ পিল্লাই আমাকে লিফ্‌ট দেবেন। গাড়ী আজ আর দরকার নেই, সকালে পেলেই চলবে।

সরিতা প্রেমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি কিন্তু আমাদের কারেই ফিরছি দিদি। অল দ্য বেস্ট।

মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, ঘণ্টা খানেকের ভেতর প্রেস-ইণ্টারভিউ শে· হয়ে যাবে। তারপরই তোমার দিদিকে আমার কারেই তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব। কাল জন্মভূমির পাতায় রিপোর্টটা বের করতে চাই।

ইন্দ্র শুধু শ্রোতা। সে নির্দেশটুকু জেনে নিয়েই গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরে বসল। মাধবী আম্মা আগে ঢুকলেন। সরিতা তাঁর পাশে বসার আগে বলল, মিঃ রায় আমি কিন্তু পেছনে বসছি।

ও সিয়োর।

মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ী প্রেমাকে নিয়ে দমকা হাওয়ায় পাতার মত উড়ে চলে যেতেই ইন্দ্র তার গাড়ীতে স্টার্ট দিল। কিছুপথ দুখানা গাড়ী সামনে পেছনে চলল। হেডলাইটের আলোগুলো হোসপাইপের জলের মত পথটাকে যেন ধুয়ে চলেছিল। মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ী এখন অন্য রাস্তা ধরেছে, ইন্দ্র যাবে ঠিক তার উল্টো পথে। ইন্দ্রের হেডলাইটের আলো বাঁকের মুখে মুহূর্তে ছুঁয়ে গেল পিল্লাই-এর অ্যামবাসেডরখানা। ফুলের বিনুনী গাঁথা প্রেমার মাথাটা কি মিঃ পিল্লাই-এর স্টিয়ারিং-এর কাছে অনেকখানি সরে এসেছে!

এক পলকের আলোর ঝলক, কোন একটা সত্যে কি এত তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়। ইন্দ্র ভাবনায় ছেদ ফেলে দিয়ে গাড়ীখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য

পথ ধরেছে। খানিক দূর যাবার পরেই পড়ল একটা গ্রাম। চাঁদের আলোয় নারকেল গাছের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে পথের ওপর। গাড়ীর জোরাল আলোয় মুছে মুছে যাচ্ছে। একটা ছোট সাঁকোর ওপর দিয়ে গাড়ীটা পার হয়ে এল। চাঁদনি রাতে একখানা উদাসী নৌকা ভেসে যাচ্ছে। ডানদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাদা বালির প্রান্তর। তার পরেই আলোছায়ার অন্ধকার ঢাকা গ্রাম।

হঠাৎ চোখে পড়ল সমুদ্র। নারকেলগাছের ফাঁকে ল্যাণ্ডস্কেপের মত আঁকা হয়ে আছে। এখন সমুদ্রের আরও কাছ দিয়ে যাচ্ছে গাড়ীটা। তিন চারটে জেলে নৌকো বালির ওপর কাৎ হয়ে আছে। এবার মাধবী আম্মার গ্রামে ঢুকল গাড়ী। একটা টালির ছাওয়া বাড়ীর সামনে গাড়ীটাকে এনে দাঁড় করাল ইন্দ্র। এখান থেকেই পদ্মনাভপুরম্ প্যালেসে যাবার সময় মাধবী আম্মাকে গাড়ীতে তুলে নিয়েছিল প্রেমা। তখন প্রেমাই চালাচ্ছিল গাড়ী। পাশে বসেছিল সরিতা। পেছনে মাধবী আম্মার সঙ্গে বসেছিল ইন্দ্র।

মাধবী আম্মার মুখে ইন্দ্র এই আধঘণ্টার ভেতর একটিও কথা শোনেনি। নেমে যাবার সময় মাধবী আম্মা সরিতাকে বললেন, প্রেমাকে বোলো সে যেন প্রতিদিন রুটিন মাফিক নাচ অভ্যেস করে যায়। আজ যে সোনার লছমীমালা ও রাজাবাহাদুরের হাত থেকে পেল, তার মর্যাদা যেন ও রাখতে পারে। এতদিন ও শুধু ছিল আমারই চোখের সামনে এখন ও সবার চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবার হবে ওর আসল পরীক্ষা। অনেকের সামনে এসব কথা আমি ওকে বলতে পারিনি, আমার হয়ে তুমি ওকে বোলো।

সরিতা গাড়ী থেকে নেমেই দাঁড়িয়েছিল। সে মাধবী আম্মার হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করল। মাধবী আম্মা যেন তদ্গত হয়েই বলে চললেন, ও যে কত বড় গুণী তা ও নিজেই জানে না, শুধু মনের দুরন্ত চপলতাকে যদি ও জয় করতে পারে তাহলে সবাইকে ছাড়িয়ে ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। একটু থেমে আবার বললেন, অনেক দূরের পথ যেতে হবে আর তোমাদের আটকে রাখব না। সময় পেলেই চলে এসো দুবোনে।

মাধবী আম্মার কুড়িলের সামনে এখন জলছে একটি ভিলাক্কু। স্নিগ্ধ হলুদ একটুখানি আলো প্রবেশ পথের অন্ধকারটুকু মুছে নিয়েছে।

মাধবী আম্মা চলে গেলেন। ঘরের ভেতর ঢুকে ওয়াদিল বন্ধ না করা অব্দি তাঁর দিকে চেয়ে রইল সরিতা।

গাড়ী এখন ফিরে চলেছে। যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ ধরে। সেই

যে রাস্তার মোড়ে দুখানা গাড়ী আলাদা হয়ে গিয়েছিল, সেদিকেই চলেছে ইন্দ্রের গাড়ী। খানিক এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে সোজা কোভালমের পথ।

মোড়ে এসে পৌঁছল গাড়ী। ইন্দ্র কোভালমের দিকেই বাঁক নিচ্ছিল, কিন্তু সরিতার কথায় ব্রেক করল।

সরিতা বলে উঠল, আচ্ছা খানিক দূরেই তো জন্মভূমির অফিস, প্রেমা আছে কিনা দেখে গেলে হয় না? থাকলে এই গাড়ীতেই ফিরতে পারত।

ইন্দ্র কথা বলল, যাওয়া যেতে পারে কিন্তু মিস মেনন গাড়ী নিয়ে আপনাকে বাড়ীতে রেখে সোজা হোটেলে চলে যেতে বললেন।

সরিতা বলল, তাহলে থাক, সোজা বাড়ীর দিকেই চলুন।

কোভালমের পথ ধরল গাড়ী। রাত এগারোটা বেজে গেছে। একটু আগে পথের ধারে চার্চের একটা ঘড়ি সময়টা ঘোষণা করেছিল। গ্রামের ভেতর দিয়ে পথ চলেছে। গাঁয়ের মানুষ বড় একটা জেগে নেই। রাস্তার মোড়গুলিতে দোকানপাটে দু-একটা আলোর টুকরো বন্ধ ঝাঁপের ফোকর দিয়ে ঘর পালানো ছেলের মত ছিটকে বেরিয়ে আসছে। এখন পথের ওপর ছুটে চলা গাড়ীর আওয়াজটা কানে এসে বাজছে। গাঁ ছাড়িয়ে ফাঁকা প্রান্তরে এলেও বহুদূর জুড়ে সেই নারকেল গাছের সমারোহ। উঁচু থেকে নীচু হয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ঝরছে। চাঁদের পাতলা দুধের মত আলোয় স্নান করছে গাছগুলো। একটা অলৌকিক জগত বলে মনে হয়। গাড়ী চালাতে চালাতে নারিকেলের সবুজ সমুদ্রে আলোর খেলা দেখছিল ইন্দ্র।

হঠাৎ গাড়ীটা একটা আওয়াজ তুলে থেমে গেল।

ইন্দ্র সীটে বসেই পরীক্ষা চালাল। ইঞ্জিন চালু আছে কিন্তু গাড়ী নড়ছে না। ফার্স্ট গীয়ার, সেকেণ্ড গীয়ারে দিয়েও যখন গাড়ীকে নড়ান গেল না তখন ইন্দ্রের মনে হল, ডিফারেন্সিয়াল বক্সের রিয়ার অ্যাকসেল কেটে গেছে। কিছু করার নেই।

এখন উপায়,—হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাসের মত কথাটা বেরিয়ে এল ইন্দ্রের মুখ থেকে।

সরিতা বলল, কাছে পিঠে কোন গ্রাম তো চোখে পড়ছে না। তাছাড়া এত রাতে গ্রামের ভেতর মিলবেই বা কি। মানুষজনকে ঘুম থেকে তুলে যে বলব, চল গাড়ীখানাকে ঠেলে নিয়ে, তাও তো সম্ভব নয়।

ইন্দ্র বলল, অতএব।

সরিতা ভাবনার ভেতরেও হেসে ফেলে বলল, আসুন, রাতটা গাড়ীর ভেতর বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

ইন্দ্র আর সরিতা দুজনে গাড়ীটাকে ঠেলে নিয়ে পথের ধারে একটা নিঃসঙ্গ নারকেল গাছের তলায় এল।

সরিতা গাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ে বলল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আমি কিন্তু ঘুমব।

ইন্দ্র একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ঘুম আসবে আপনার ?

সরিতা শব্দ করে নড়েচড়ে বসে বলল, কেন আসবে না বলুন ?

ইন্দ্র বলল, এ সব তো অঙ্ক কষে বলা যায় না, অনুমান করা যায় মাত্র।

সরিতা সীটের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল, আপনার অনুমান ভুলও তো হতে পারে।

ইন্দ্র বলল, তা পারে।

সরিতা জলতরঙ্গের মত হেসে উঠে বলল, আমাকে কি সত্যি কুম্ভকর্ণ ঠাওরালেন নাকি ? এ অবস্থায় কেউ ঘুমোতে পারে ?

ইন্দ্রও হেসে উঠল। বলল, তাহলে আসুন দুজনেই জাগি।

সরিতা সামনের সীটের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, আপনি নিশ্চয় খুব ভাল গল্প বলতে পারেন।

ইন্দ্র সীটে বসে সিগারেট টানতে টানতে বলল, কি করে জানলেন ?

সরিতা বলল, বলুন না, আমার অনুমান ঠিক কিনা ?

ইন্দ্র বলল, গল্প হয়ত দু-একটা বলতে পারি কিন্তু ভাল বলতে পারি কিনা তাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

সরিতাকে ছেলেমানুষীতে পেয়ে বসল বলুন না, বলুন না একটা।

ইন্দ্র বলল, এই পরিবেশে আপনার গল্প শুনতে ভাল লাগবে ?

খু—উ—ব, সরিতার স্বরে উৎসাহের জোয়ার।

ইন্দ্র বলল, তাহলে আমার পছন্দ মত গল্প আপনাকে শুনতে হবে।

সরিতার মাথার বিনুনী সুদ্ধো দুলে উঠল, রাজী। যা শোনাবেন তাতেই রাজী।

ইন্দ্র অমনি বলল, ভূতের গল্প।

সরিতা বেশ খানিকটা দমে গেল। নিভু নিভু গলায় বলল, ভূতের গল্প।

ইন্দ্র বলল, কেন ভূতটুতে বিশ্বাস নেই নাকি ?

সরিতা কাতর গলায় বলল, ভয় দেখাবেন না, দোহাই আপনার।

বলতে বলতে দরজাটা খুলে ঝুপ করে নেমে সামনের দরজাটা খুলে ঢুকে পড়ল। দরজা টেনে ভাল করে লক্ করে ইন্দ্রের কাছে সরে বসল।

ইন্দ্র ওর কাণ্ড দেখে বলল, পেছনের সীটের দুদিক কিন্তু লক্ করা হয়নি, সুযোগ পেলে ঢুকে পড়তে কতক্ষণ।

সরিতা ইন্দ্রের রসিকতাকে তলিয়ে দেখার দরকার মনে করল না। সীটের ওপর দিয়ে শরীরটাকে বেঁকিয়ে পেছনের একটা দরজা লক্ করে গ্লাসটা উঠিয়ে দিলে। পরে ইন্দ্রের কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ডান দিকের দরজা লক্ করে কাঁচটা তুলতে লাগল।

মেয়েটার যেন কোনদিকে খেয়ালই নেই। একটা চব্বিশ বছরের যুবকের গায়ে আঠারো বছরের মেয়ের ছোঁয়া লাগলে কি হতে পারে সে ব্যাপারে সরিতা যেমন যেন একেবারেই বেহুঁস।

ইন্দ্রের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে সরিতার ফুলে গাঁথা বিনুনী। মুখের বাঁ দিকটা ছুঁয়ে আছে ইন্দ্রের চুলে ভরা মাথা।

একটা উত্তেজক পানীয় এইমাত্র যেন ইন্দ্রের গলায় কেউ ঢেলে দিয়েছে। পানীয়টা ধীরে ধীরে সারা শরীরে অদ্ভুত এক ধরনের জ্বালা জড়িয়ে দিচ্ছে।

সরিতা কিন্তু কাজ শেষ করে চুপটি করে বসে পড়ল সীটে। ইন্দ্রকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বলল, কি হল, বলুন।

ইন্দ্র নিজেকে সহজ করে নিল। ডানদিকে জ্যোৎস্না ঝরা সহস্র সহস্র নারকেল গাছের সারি। হাওয়ায় মাথাগুলো দুলছে। ঝিকমিক করছে চাঁদের ভাঙা ভাঙা আলোগুলো। ঠিক যেন মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নার কিরণঝরা সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে শত শত স্নানার্থী স্নান লীলায় মেতেছে।

ইন্দ্র বলতে লাগল, অনেক অনেকদিন আগে কেরালা ছিল পালের জাহাজে ভেসে আসা বিদেশীদের ব্যবসার বড় রকমের একটা ঘাঁটি। এখানকার গোলমরিচ, হাতির দাঁত, চন্দন কাঠ আরও বহু রকমের জিনিস বিদেশে বহু দামে বিক্রি হত। এসব কথা ইতিহাস থেকে ভূরি ভূরি মিলবে, কিন্তু একবার একখানা বোম্বেটে জাহাজ কিছু ভিন্ন রকমের জিনিস নিয়ে আরবের দিকে যাচ্ছিল।

সরিতা কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি জিনিস?

ইন্দ্র বলল, জাহাজের ওপরে ছিল বিদেশী কয়েকজন নাবিক, কিন্তু জাহাজের পাটাতনের তলায় ছিল ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আনা কিছু সুন্দরী মেয়ে আর শ্রমিক পুরুষ। তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আরবদেশে

বিক্রির জন্যে। মেয়েগুলি বাদশাহী হারেমের জন্যে পছন্দ করে আনা, আর হতভাগ্য পুরুষগুলো বিক্রি হবে দাস হিসাবে আরবের বাজারে।

সেই মুহূর্তে সরিতা কষ্ট পেয়ে বলল, দারুণ দুঃখের ব্যাপার।

ইন্দ্র বলে চলল, আরবসাগরের বুকের ওপর দিয়ে দশ বিশখানা পাল উড়িয়ে জাহাজটা এগিয়ে যাচ্ছিল। হিসেব মত বাতাস লেগেছিল পালে। গরম কাল। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী হাওয়া জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিল ওমান উপসাগরের দিকে। কিন্তু কর্কটক্রান্তি রেখায় ঢুকেই জাহাজটা কেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কোনদিকেই আর নড়ে না। হাওয়ার ঠেলায় পাল ফুলে আছে, কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়ছে না এত বড় জাহাজটা। দাঁড়িরা দাঁড়ের ঘা মেরে মেরে সমুদ্রে ফেনা তুলে ফেলল, তবু নড়ল না জাহাজ।

সরিতার গলায় বিস্ময়, এ কি করে সম্ভব!

ইন্দ্র বলল, এইখানেই ভূতের ওপর বিশ্বাস করতে হয়। পুরোটাই ভৌতিক ব্যাপার।

সরিতা ইন্দ্রের গায়ের আরও কাছে ঘেঁষে এল। ভয়ে ভয়ে বলল, সত্যি বলছেন ভূত?

ইন্দ্র বলল, যদ্দূর শুনেছি, একটা দুষ্টু ইফ্রিদ ভূতের কাণ্ড এটা। সে অক্ষ-রেখা বরাবর সমুদ্রের তলায় ডুব দিয়ে লুপ্ত কোন একটা নগরীর গুপ্তধনের সন্ধান নিয়ে উঠে আসছিল, হঠাৎ তার মাথায় জাহাজের তলার ঠোকর লাগতেই সে বিগড়ে গেল। আর যায় কোথা, দুহাত দিয়ে জাহাজের দুটো প্রান্ত ধরে স্থির হয়ে রইল। তাকে নড়ায় কার সাধ্যি।

সরিতা বলল, তারপর?

ইন্দ্র বলল, তারপর আর কি, যেখানে মুশকিল সেখানেই আসান। ভূতের ওঝা ছিল ঐ জাহাজে। সে কেরালার কয়েক মন গোলমরিচ তিনদিন ধরে পুড়িয়ে ইফ্রিদটাকে বশ করল। তবু কি ভূতটা ছাড়তে চায় জাহাজ।

সরিতা দারুণ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বলল, তারপর ছাড়ল তো?

ইন্দ্র বলল, ছাড়ল, তবে একটা শর্তে।

কি রকম?

ভূত ওঝাকে বলল, তোমরা আমাদের বাদশার কাছে অনেক দামী জিনিস নিয়ে যাচ্ছ, তাই তোমাদের আর আটকে রাখব না। কিন্তু এই জাহাজে দুটো সুখী জীব আছে, তাদের জাহাজ থেকে ফেলে দিলেই আমি জাহাজ ছেড়ে দেব।

ওঝা এবার অনেক গুণেও বের করতে পারল না বন্দী মানুষগুলোর ভেতর সুখী কারা রয়েছে। ওরা সবাই ঘরবাড়ী প্রিয়জন ছেড়ে এসেছে, তাই ওদের কারো তো সুখী থাকার কথা নয়। বরং ওদের বুকের ভেতরে সারা আরব সাগরের কান্না উথলে উঠছে।

ইফ্রিদ ভূতটা শেষে বলল, আমি একটা আলো জ্বেলে দেব, তাতে সবার দেহের ভেতর যে মনটা আছে, তা দেখা যাবে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্র তোলপাড় করে একটা জলস্তম্ভ উঠল। জলস্তম্ভটা রাতের অন্ধকারেও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আশ্চর্য এক ধরণের আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল তার দেহ থেকে। সে আলো একসময় অতি তীব্র হয়ে উঠল, কিন্তু উত্তাপ ছিল না সে আলোতে তাই রক্ষে।

সরিতা যেন কথা বলতে পারছিল না, তবু চাপা গলায় বলল, আশ্চর্য তো!

ইন্দ্র বলল, আশ্চর্য ঐ আলোতে নয়, আলোটা যেখানে জাহাজে গিয়ে পড়েছিল সেইখানেই ছিল সত্যিকারের আশ্চর্য।

সরিতা বলল, কি ছিল ওখানে?

ইন্দ্র বলল, জাহাজের খোল থেকে মানুষগুলো তখন ডেকে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর মানুষগুলোর একটিকেও রক্তমাংসের বলে চেনা যাচ্ছিল না। সবাই স্বচ্ছ কাচের মানুষ হয়ে গিয়েছিল।

সরিতা সীমাহীন বিস্ময়ে বলল, কাচের মানুষ!

ইন্দ্র বলল, পুরোপুরি কাচের মানুষ, শুধু হৃৎপিণ্ডের কাছে প্রত্যেকের ঘন কালো একটা ছায়া পড়েছিল।

সরিতা বলল, কালো ছায়া কেন?

ইন্দ্র বলল, শোক দুঃখের চিহ্ন ওটা। সকলেই ফেলেআসা সংসারের কথা ভেবে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, তাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের ভেতর দুটি সুখীকে ধরা গেল।

সরিতা কৌতূহলী হল, কি রকম?

ইন্দ্র বলল, ওদের ভেতর দুটি হৃৎপিণ্ড ছিল রক্ত পদ্মের মত লাল। তাই দেখে ওদের চেনা গেল।

সরিতা বলল, ওরা সুখী ছিল কেন?

ওরা ভালবাসার ছোঁয়া পেয়েছিল। বাদশার মুল্লুকে গিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে জেনেও ওরা দুজনে ভালবেসেছিল দুজনকে।

তারপর ওদের খুঁজে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই আলোটা নিভে গেল। জলস্তম্ভ

মিলিয়ে গেল জলে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঢেউ-এর মাথায় ঝিলমিল করতে লাগল। সবাই তখন স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পেয়েছে। জাহাজের ক্যাপটেন আর একটুও দেরী করলে না। ওদের দুজনকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিল। ওরা কিন্তু জাহাজ থেকে পড়ে যাবার সময় কোন রকম আর্তনাদ করল না বরং বিচ্ছেদের হাত এড়াতে পারল বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল।

ইন্দ্র হঠাৎ সরিতার দিকে ফিরে বলল, বলুন তো মেয়েটি কোথাকার?

সরিতা বলল, কি জানি কিন্তু তার জন্যে দুঃখ না হয়ে বরং গর্ব হয়।

ইন্দ্র বলল, মেয়েটি কিন্তু কেরালাবাসী।

আবার প্রশ্ন করল ইন্দ্র, এখন বলুন তো দেখি ছেলেটি কোথাকার?

সরিতা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছে। সে মুখে বলল, জানি না। কিন্তু সে যে জানে তার প্রমাণ দিল ইন্দ্রের একখানা হাত ওর দুটো হাতের পাতায় চেপে ধরে।

দুজনে কেউ আর কোন কথা বলতে পারল না। জ্যোৎস্নার অলৌকিক স্রোত তখন আরও তীব্র হয়েছে। ওরা দুজনে জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত প্রেমিকের মত ভেসে চলল।

শান্ত নিস্তব্ধ রাতটা কিসের শব্দে যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা গাড়ী আসছে দূর থেকে। পেছন দিক থেকেই আসছিল। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল আলোটা।

সরিতা হঠাৎ ইন্দ্রের বুকের ওপর থেকে মাথাটা সরিয়ে নিল। কোন কথা না বলে গাড়ীর দরজাটা খুলে বেরিয়ে দাঁড়াল পথের ওপর। চূর্ণ চুল আর মথিত ফুলগুলোকে যতদূর সম্ভব ঠিক করে নিল। তারপর পেছনের দরজা খুলে সীটের ওপর বসে গাড়ীর গ্লাসগুলো নামিয়ে দিলে।

ততক্ষণ ইন্দ্র গাড়ী থেকে নেমে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছে।

পেছনের গাড়ীটা তীব্র স্পীডে এসে হঠাৎ দারুণ একটা ব্রেক কষে দাঁড়াল। ভেতর থেকে মেয়েলি গলার একটা ভয়ার্ত আওয়াজ উঠেই থেমে গেল।

গাড়ী থেকে মিঃ পিল্লাই নেমে এসেছেন।

কী ব্যাপার?

ইন্দ্র বলল, বিচ্ছিরি ব্যাপার, ডিফারেন্সিয়াল বক্সের রিয়ার অ্যাকসিল কেটে গেছে মনে হয়।

ততক্ষণে সামনের সীট থেকে নেমে এসেছে প্রেমা।

গাড়ী থেকে সরিতাও নেমে দাঁড়াল।

মিঃ পিল্লাই দু বোনের মাঝে এসে পড়লেন, ভাগ্যিস মিস মেননকে কিছু বেশী সময় আটকে রাখতে পেরেছিলাম, নইলে সারা রাত আপনাদের এই পথের ওপরেই কাটাতে হত।

ইন্দ্র মনে মনে বলল, উদ্ধার করেছ। তুমি না এলে সারা কেরালা দেশটাই সমুদ্রের তলায় চলে যেত।

মুখে বলল, মিস মেনন মনে হয় বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, ভাগ্যিস আপনি এসে পড়লেন।

সরিতা বলল, মোটেও না, ভয় পেতে যাব কেন, দারুণ ঘুম পাচ্ছিল।

প্রেমা বলল, পথে দাঁড়িয়ে রাত কাবার করে লাভ নেই, এখন সবাই মিলে ঘরে পৌছানর ব্যবস্থা করা যাক।

মিঃ পিল্লাই বললেন, সবাই আমার গাড়ীতে চলে আসতে পারেন, কিন্তু আপনার গাড়ীর কি হবে ?

তখন একটা চেন অথবা মোটা দড়ি জাতীয় কিছুর খোঁজ চলল দু গাড়ীতে। অ্যামবাসেডার প্রেসিডেন্টকে টেনে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তাও মিলল না।

ইন্দ্র বলল, ভাবনা নেই আমি গাড়ীতে আছি, দিব্যি রাতটা কেটে যাবে। ভোরের বাসে একজন মেকানিককে পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

মিঃ পিল্লাই প্রেমার দিকে চেয়ে বললেন, মিস মেনন আমি না হয় আজ রাতে আপনাদের বাড়ী পৌছে দিয়ে ফিরেই যাই। তাহলে মিঃ রায় উদ্ধার পাবেন। কোভালম বাজারের মোড় থেকে একজন মেকানিক নিয়ে চলে আসব।

প্রেমা বলল, তা হয় না, আপনার বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

অগত্যা ইন্দ্রের পরিকল্পনাই বহাল রইল। মিঃ পিল্লাই তাঁর প্রায় অক্ষত সিগারেটের দামী প্যাকেটটাই ইন্দ্রকে প্রেজেন্ট করে বসলেন। রাত জাগতে ইন্দ্রের সঙ্গী রইল সিগারেট।

ওরা মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ীতে উঠে বসল।

ইন্দ্র দাঁড়িয়ে রইল প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টে হেলান দিয়ে।

মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ী স্টার্ট নিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।

সরিতা ইন্দ্রের গাড়ীতে ব্যাগ ফেলে গেছে। তাই সে আবার ছুটতে ছুটতে। প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে।

ইন্দ্র সিগারেট টানতে টানতে বলল, কি হল, ফিরে এলেন যে ?

আপনাকে না বলে গিয়েছিলাম, তাই একটু দুষ্টুমি করতে হল। ব্যাগটা ফেলেই গিয়েছিলাম। সত্যি, ভীষণ খারাপ লাগছে আমার। একটুও ঘুমুতে পারব না রাতে।

ইন্দ্র বলল, আমার কিন্তু কোন অসুবিধেই হবে না। একটা ফুলে ভরা মাথার গন্ধে বুক ভরে আছে। রাত ভোর সারা সাগরের হাওয়াতেও সে গন্ধটুকু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

সরিতা জ্যোৎস্নার আলোয় চোখে করুণ মিনতি ফুটিয়ে দ্রুত পায়ে মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ীর দিকে চলে গেল।

ইন্দ্র কাঁচ তুলে গাড়ী লক করে বসেছিল। বাঁ দিকের গ্লাসটা সামান্য খোলা ছিল। সে স্বপ্ন দেখছিল একটি মেয়ের। এক একবার কেমন যেন মনে হচ্ছিল সবটাই স্বপ্ন। কে জানত বাংলাদেশ থেকে একেবারে আরব সাগরের তীরে তাকে একটা হোটেল চালাবার দায়িত্ব নিয়ে চলে আসতে হবে।

ইউনিভারসিটির পড়া শেষ করে তার আর বেকারের দলে ভীড় বাড়াবার ইচ্ছে ছিল না। তাই সে সোজা চলে গিয়েছিল হোটেল ম্যানেজমেণ্ট আর ক্যাটারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে।

বছর তিনেক পরে কানপুর থেকে দিল্লী হয়ে ফেরার পথে নিউজ পেপারে চোখে পড়েছিল বিজ্ঞাপনটা। সমুদ্রের ধারে আধুনিক হোটেল। অভিজ্ঞ ম্যানেজার দরকার। পোষ্ট বক্স না দিয়ে সরাসরি একটা ঠিকানা দেওয়া ছিল। তাই রেজেষ্ট্রী ডাকে দরখাস্ত পাঠিয়ে কালক্ষয় না করে সে সোজা চলে এসেছিল কেরালায়।

কোভালম বীচের পাশেই কোভালম গ্রাম। ঐ গ্রামেই নাম্বুদ্রী করুণাকরের আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্মত কেটেজম। সেখানেই সে প্রথম দেখল প্রেমা মেননকে। বয়সে তার চেয়ে কিছু ছোটই হবে, কিন্তু আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। প্রেমা মেননই তাকে কাজে যোগ দিতে বলল। তাদের পরিবারের ছোট্ট একটু ইতিহাসও কদিন পরে প্রেমার মুখ থেকেই সে শুনেছিল। এতটুকু সংকোচ কিংবা গোপন করার কোন চেষ্টাই ছিল না তার কথায়।

নাম্বুদ্রী করুণাকর যৌবনে নৃত্যশিল্পী মেনন পরিবারের একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। ফলে সমাজ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাঁকে। নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী করুণাকর অনেক কিছুই করেছিলেন। ফিসারিজ, কয়ার ইণ্ডাষ্ট্রি, কাজু এক্সপোর্ট। শেষে কোভালম বীচ থেকে কিছুদূরে

একটা হোটেল তৈরী করেন। কোভালম গ্রামে নারকেল কুঞ্জে ঘেরা 'রিট্রিট' নামে বাড়ীতে তিনি থাকতেন, আর গাড়ী করে হোটেলে যেতেন। হোটেলটাকে বাড়ীর কাছেই করতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেন নি। কর্ম আর বিশ্রামের দুটি জায়গাকে তিনি একটু তফাতেই রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বাড়ীর নাম 'রিট্রিট' রাখলেও শান্তিতে বিশ্রাম করার ভাগ্য ছিল না তাঁর। নৃত্যপটীয়সী স্ত্রী তাঁকে দুটি কন্যা সন্তান উপহার দিয়েই মারা গিয়েছিলেন। সেই সন্তানই প্রেমা আর সরিতা। প্রেমা মায়ের কাছে নাচ শিখত, আর সরিতা তখন সবে পাঁচ। মা মারা গেলে বাবা করুণাকর স্ত্রীর বান্ধবী মাধবী আম্মার তত্ত্বাবধানে প্রেমাকে রেখে দেন। মাধবী আম্মা কলা কেন্দ্রমের নৃত্যগুরু ছিলেন। মোহিনী আট্যমের পুরানো রীতি তিনি যদ্দুর সম্ভব নির্ভেজাল শেখানোর চেষ্টা করতেন।

তাঁর কঠোর তদারকী আর শিক্ষায় প্রেমা এখন নিপুণ নর্তকী। প্রেমা নাচের সঙ্গে সঙ্গে কনভেণ্টে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু ছোট বোন সরিতা একটু ভিন্ন চরিত্রের। নাচ ভালবাসলেও তার ভেতর সে নিজেকে জড়াতে চায়নি। পড়ে ত্রিবান্দ্রম কলেজে। ঘুরে বেড়ায় বান্ধবীদের নিয়ে। আজ পিকনিক, কাল সিনেমা, পরশু ব্যাকওয়াটারে ভ্রমণ। এই নিয়ে তার জগৎ। তবে প্রেমার উক্তি অনুসারে সরিতা তার চেয়েও হিসেবী। এই বয়সেই সে নাকি ব্যবসা বোঝে অনেক বেশী।

করুণাকর সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। কিন্তু দেশের মাটিতে পা দিয়ে শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলতে পারলেন না। তার আগেই প্লেনের ভেতরে হৃদরোগের শিকার হলেন।

বাবা চলে যাবার পর প্রেমাকে সাহায্য করার জন্য পিতৃকুলের অনেক আত্মীয় এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রেমা তাদের বিদায় দিয়েছিল বিনীত নমস্কারে। বাবার জীবদ্দশায় যারা আসেনি বাবার অবর্তমানে তাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল প্রেমা।

একটি একটি করে সব কটা ব্যবসাকেই সে উপযুক্ত দামে বিক্রি করে ব্যাঙ্কে ব্যালেন্স বাড়িয়েছিল। কিন্তু পারেনি হোটেলটাকে হাতছাড়া করতে। করুণাকর এক সময় মেয়েদের নাকি বলেছিলেন, ব্যবসায়ের খাতিরে ঘন ঘন বিদেশ যাওয়া তাঁর আর পোষাচ্ছে না। তিনি হঠাৎ একদিন সব ছেড়েছুড়ে ঘরে এসে বসবেন, আর শুধু থাকবে তাঁর নিজের পছন্দমত গড়ে তোলা সান অ্যাণ্ড সী হোটেলটা।

বাবার শেষ ইচ্ছা প্রেমা সযত্নে রক্ষা করতে চায়। তাই উপযুক্ত ম্যানেজার চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল সে।

ইন্দ্র বসে বসে ভাবছিল কথাগুলো। একটি বছরও পূর্ণ হয়নি তার চাকুরীর কিন্তু ইতিমধ্যেই সে বেশ কয়েকটা ব্যাপারে তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। আর এজন্য সপ্রশংস অভিনন্দন পেয়েছে প্রেমার কাছ থেকে। তার হোটেল সাজানোর পরিকল্পনা কিংবা ফরেন ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্য পাবলিসিটির ধরণ নাকি অভিনব। প্রেমার অ্যাপ্রিসিয়েশান তাকে হোটেলটাকে নিয়ে নানাভাবে ভাবতে উৎসাহিত করেছে।

তার কাজ প্রোপ্রাইটারদের পছন্দ হলেও ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ বা মেলা-মেশার কোন সুযোগ ছিল না তার। কিম্বা সে রকম কোন সুযোগ তৈরীও করে নেয় নি সে। তাই অ্যাপ্রিসিয়েশান যতখানি হয়েছিল অ্যাকোয়েন্টেন্স ততখানি হয়নি। কিন্তু আজকের ঘটনার কথা ভেবে সে নিজের মনেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। কি করে এটা সম্ভব হলো। সরিতা যে এতখানি এগিয়ে এসেছে তার কোন আভাসই তো সে পায়নি আগে। সরিতা তার কলেজ বন্ধুদের নিয়ে হয়ত এক ঝাঁক চড়ুই পাখীর মত কখনো চড়াও হয়েছে হোটেলে। সমুদ্রে স্নান সেরে বালিতে ছুটোপাটি করে, নারকেল বাগানের ছায়ায় বসে গান গেয়ে, ব্যাকওয়াটারে চিরুনাল ভাল্লম বা হোটেলের সাজানো নৌকোটা হৈ হৈ করে ভাসিয়ে আবার ফিরে গেছে রিজার্ভ করা গাড়ীতে। যাবার সময় শান্ত হয়ে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যাগ খুলে টাকা গুনে দিয়েছে। একটু দূরে তার কাজের জায়গায় বসে ইন্দ্র সরিতার এই আচরণটুকু উপভোগ করেছে।

যখনই সে সরিতার মুখোমুখি হয়েছে তখনই দেখেছে অশান্ত চঞ্চল মেয়েটি কত শান্ত আর শোভন হয়ে গেছে।

কদিন আগে প্রিমিয়ার প্রেসিডেণ্টখানা চালিয়ে হোটেলে এসেছিল সরিতা। প্রেমা পদ্মনাভপুরম্ প্যালেসে নাচবে তার জন্য একটা ইনভিটেশান কার্ড তৈরী করে দিতে হবে। একদিকে থাকবে আমন্ত্রণ, অন্যদিকে থাকবে গুরু মাধবী আম্মা আর শিষ্যা প্রেমা মেননের পরিচিতি।

অনেক দৌড়ঝাঁপ করে প্রেমা মেননের মোহিনী আট্যমের একখানা ফটোর রেখাচিত্র এঁকে ব্লক করিয়ে গোল্ড কালারে ছেপে দিয়েছে ইন্দ্র। ব্লু কালারে ছাপিয়েছে নিমন্ত্রণ চিঠিখানা। একেবারে আরব সাগরের নীলের ওপর কেরালার সোনালী সূর্য নৃত্যের লীলায় মেতেছে।

কার্ড তৈরী করে প্রেমার কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল সে। প্রেমা শুধু

একটা শব্দই উচ্চারণ করেছিল, দারুণ। আর তাতেই ইন্দ্রের ক'দিনের পরিশ্রম পুরস্কৃত হয়েছিল। চলে আসার সময় ইন্দ্রকে কিন্তু নাচ দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায় নি প্রেমা। ইন্দ্র পথে আসতে আসতে ভেবেছিল, প্রেমার আরও একটু সৌজন্য দেখান উচিত ছিল। স্বাভাবিক ভদ্রতায় নাচ দেখতে যাওয়াব মৌখিক একটা আমন্ত্রণ মাত্র। হোটেলে পৌছে তার মনে হয়েছিল, এই তার যথার্থ জায়গা, এর বাইরে পা বাড়াতে গেলেই অকারণে আহত হতে হবে।

সে ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই বসেছিল, কিন্তু গতকাল একটি জার্মান কাপ্‌লকে ব্যাক ওয়াটারে নৌকো বিহার করিয়ে শেষ বেলায় হোটেলে ফিরে এসে দেখল, তার ডেস্কে একখানা কার্ড পড়ে আছে। সঙ্গে একটুকরো চিঠি জেমস্ ক্লীপ দিয়ে সাঁটা।

নাচ দেখার জন্যে প্রেমার প্রতিনিধি হয়ে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলাম। কার্ড রেখে গেলাম। আপনার পরিকল্পিত কার্ডের মর্যাদা প্রেমা কতখানি রাখতে পেরেছে তা স্বচক্ষে দেখলে আমরা সকলেই খুশী হব।

আসা চাই কিন্তু—সরিতা।

কার্ড পেয়ে ওদের ওপর মনটা অনেক বেশী প্রসন্ন হয়ে উঠল ইন্দ্রের। ওরা তাহলে ইন্দ্রের কথা ভোলে নি। সেদিন প্রেমার মুখোমুখি নিমন্ত্রণ না করার কারণ এখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এ ব্যাপারটা অনেক বেশী শোভন আর সুন্দর হয়েছে।

কিন্তু সরিতা! কি করে কয়েক মুহূর্তের ভেতর সে এত কাছে সরে এল। বেশী কোন কথাই সে বলে নি, শুধু ফুলের কারুকাজ করা মাথাটাকে তার বুকের মাঝখানে সমর্পণ করে দিয়ে বসেছিল।

ইন্দ্রের মনে হতে লাগল, নির্জন জ্যোৎস্না ঝরা রাতগুলো শুধু মাত্র দুজন প্রেমিকের। তারা যেন প্রকৃতির এই বিহ্বল করা সুধাপানের জন্য বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি। এই রাতে হৃদয়ের গভীরে কোন কথা গোপন করে রাখা যায় না, সব কথা রূপালী আবরণ ভেদ করে প্রজাপতির মত বাইরে বেরিয়ে এসে এলোমেলো অথচ আশ্চর্য ছন্দময় নাচের খেলা দেখিয়ে উড়ে বেড়ায়।

পর পর এগিয়ে আসা হালকা ঢেউগুলো যেমন করে বেলাভূমির সোনালী বালিকে ভিজিয়ে দিয়ে যায় ঠিক তেমনি একটা সুখকর তন্দ্রাচ্ছন্নতার প্রবাহে ভিজে যাচ্ছিল ইন্দ্রের সোনালী স্বপ্নগুলো।

কে যেন ডাকছে: অনেক দূর থেকে একটা শব্দ অ্যাকিউরিয়মে রাখা

চকন দেহ ছোট ছোট কিসিং গৌরামী মাছের মত জল কেটে কেটে তিরতির করে এগিয়ে আসছে।

শব্দটা এখন অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র সজাগ হয়ে বাইরে তাকাল।

কাচের ওপর হাত রেখে কেউ তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

ইন্দ্র চোখ রগড়ে নিল দু-হাতের আঙুল ঘষে। এখন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চাঁদের আলোয় সরিতা নয়, প্রেমা দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, তার সামনে আর একখানা গাড়ী!

খুট করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ইন্দ্র। গলায় বিস্ময়, আপনি!

প্রেমা বলল, চেন একটা নিয়ে এলাম, বাঁধুন গাড়ী।

ইন্দ্রের মুখে একরাশ প্রশ্ন, এত রাতে একা এলেন! কি ব্যাপার বলুন তো? মিঃ পিল্লাই কিংবা আর কাউকে তো সঙ্গে আনতে পারতেন।

প্রেমা মুখে হালকা হাসি ফুটিয়ে বলল, দোষটা করলাম আমি আর শাস্তি পাবে অন্যে।

ইন্দ্র বলল, দিব্যি গাড়ীর ভেতর বসে বসে কেটে যেত রাতটা। আপনি এলেন, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

প্রেমা মিষ্টি আওয়াজ তুলে হেসে উঠল। বলল, দেখুন তো এত কষ্ট করে এলাম আর আপনি বলছেন আমি আসতেই আপনার খারাপ লাগছে।

ইন্দ্র চেন দিয়ে দুটো গাড়ী বাঁধতে বাঁধতে করুণ গলায় বলল, আমাকে এমন করে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু আপনার কষ্টের কথাই ভাবছি। সারা সন্ধ্যে নাচের অনুষ্ঠান হল, তারপর রাত জেগে গাড়ী চালিয়ে এলেন। কি করে আপনার পক্ষে সম্ভব হল, এতগুলো কাজ তা ভেবে উঠতে পারছি না।

প্রেমা হঠাৎ বলল, কেমন লাগল আমার নাচ, বলেন নি তো।

আবার কথাটা চাপা দিয়ে বলল, আচ্ছা গাড়ীতে বসে শুনব। আপনি ড্রাইভ করুন।

ইন্দ্র তার বাঁ দিকের লক খুলে দিল। প্রেমা ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে নিল দরজাটা।

ইন্দ্র ভাবল, প্রেমার ভেতরে সংস্কারের লেশ মাত্র নেই, যা আছে তা সহজ স্বচ্ছন্দতা। লজ্জা কিংবা সংকোচের আবরণে অনেক সময় মেয়েদের সুন্দর দেখায় ঠিক, কিন্তু সহজ আচরণের ভেতর স্বাভাবিক একটা শ্রী আছে। অবশ্য পুরুষালির উৎকট অনুকরণটাই চোখে লাগে বেশী।

কি ভাবছেন ? প্রেমার গলা বেজে উঠল।

না কিছু না—বলেই ইন্দ্র গাড়ীতে স্টার্ট দিল। প্রেমা বলল, নাচ কেমন লাগল কই বললেন না তো ?

ইন্দ্র বলল, আমার বলার কিছু অপেক্ষা আছে কি ? সারা ত্রিবান্দ্রমের এলিট সম্মেলন হয়েছিল আপনার নাচের আসরে। আর তাঁদের মন্তব্যও আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয়।

প্রেমা বলল, নিজেকে আর ঢেকে রাখবেন না মিঃ রায়। ইনভিটেশান কার্ডের নমুনা দেখেই বুঝেছিলাম, আপনি কি ধরণের সমঝদার।

ইন্দ্র বলল, ওটা আশঙ্কিত পটুত্ব। কস্মিনকালেও ছবি আঁকতে পারি না, কিন্তু ছবি দেখতে ভালবাসি।

প্রেমা বলল, প্রকৃতির কবিতা ডজন ডজন মুখস্ত করলেই কি আর প্রকৃতিকে চেনা যায়, না রঙ তুলির শ্রাদ্ধ করলেই শিল্পী হওয়া যায়।

ইন্দ্র একটা বাঁক ঘুরে আবার সোজা পথ ধরল।

দেখুন সত্যি কথা বলতে কি আপনার নাচের টেকনিক্যাল দিকটা আমি তেমন বুঝি নি কিন্তু সামগ্রিক আবেদন যে কোন হৃদয়কে নাড়া দেবেই।

প্রেমা হেসে বলল, অন্ততঃ একজন সমঝদার পাওয়া গেল, আমার নাচ সোজাসুজি যাঁর হৃদয়ে ঘা দিয়েছে।

ইন্দ্র বলল, কথাটা নির্ভেজাল সত্যি।

কিছুক্ষণের ভেতরই গাড়ী এসে পৌছল কোভালমে। মেন রাস্তা থেকে একটা লাল সুরকী বিছান পথ কয়েক একর নারকেল বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রেমাদের বাড়ীর দোরে এসে শেষ হয়েছে।

প্রেমা বলল, অচল গাড়ীটা এখানেই থাক। আপনি আর একটু কষ্ট করে সরিতার ঐ গাড়ীটা নিয়ে হোটেলে চলে যান, কাল দুপুরে যে কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে। আমিও যেতে পারি। ভোর হতেও আর বড় একটা বাকী নেই। সারা রাত আপনারই হল হয়রানি।

ইন্দ্র হেসে বলল, হয়রানি নয়, বলুন উপভোগ্য অভিজ্ঞতা।

হোটেলে ফিরে ইন্দ্র দেখল, সুগদন বসে আছে। সামনের সমুদ্রের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে। সামান্য হলেও গাড়ীর শব্দ হয়েছে, তবু নির্বিকার সুগদন। হোটেলের মালি কাম দরোয়ানের কাজ করে এই লোকটি। ব্যাকওয়াটার অব্দি বিস্তৃত পেছনের বিরাট নারকেল বাগানটির মালিক মেনন বোনেরা। সুগদন বৌ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার পেতেছে ঐ তেজা তল্লাসের ভেতর।

নারকেল বাগানের সে-ই রক্ষক সে-ই পরিচালক সে-ই দড়ি উৎপাদক, ব্যবসায়ের কর্ম পরিদর্শক।

সারাদিন হোটেলের ফাইফরমাস খেটে রাতে হোটেলের বারান্দায় শুয়ে থাকে। দারুণ নাক ডাকে। ঘুমন্ত পাহারাদার।

ইন্দ্র একটু অবাক হল বৈকি। সুগদন শেষ রাতে জেগে বসে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। চাঁদ আকাশে এখনও জেগে। সমুদ্র বালির স্তূপ নারকেল কুঞ্জ মায়াময়। এই পরিবেশে সুগদনের কবিত্ব লাভ হল নাকি। অথবা লোকটাকে নিশিতে পেয়েছে!

ইন্দ্র কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সুগদনের ধ্যান ভাঙল। ইন্দ্রকে দেখে সে যেন ভূত কিংবা পুলিশ দেখছে বলে মনে হল।

ইন্দ্র একটু গলা চড়িয়ে বলল, কি হল, জেগে বসে আছ যে?

সুগদন এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে সামলে রেখেছিল। ইন্দ্রের কথার ছোঁয়ায় একেবারে ভেঙে পড়ল।

সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, সারারাত ওদের পাহারা দিয়ে বসে আছি সাহেব।

ইন্দ্র এতক্ষণ ভাল করে ওদিকে চেয়েই দেখে নি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে সমুদ্রের তীরে নারকেল পাতার ছাউনি দেওয়া গোল ছাতার তলায় নগ্নপ্রায় দুটি মূর্তি। একজন দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত পা ছুঁড়ে চলেছে, আর অন্যজন বালির ওপর শুয়ে কখনো বা বসে সেই অভিনয় দেখছে।

প্রথম ঘোরটা কেটে যেতেই ইন্দ্র ওদের চিনতে পারল। তিন-চারদিন হল হোটেলে এসেছে এই দুটি ট্যুরিস্ট। দুজনেই পঁচিশের নীচে, দুজনেই ফটোগ্রাফার। মেয়েটি আমেরিকান আর ছেলেটি জার্মান। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে সে বিধাতাপুরুষ আর ওরা দুজনেই জানে। বিবাহিত দম্পতি নয়, বন্ধু। সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দুজনে। ফটো তুলে যাচ্ছে এনতার। একটা দেশ বা অঞ্চল থেকে ফটো নেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেলে ফিরে যাচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকার বাজারে। সেখানে অনেক দামে বিক্রি করে আসছে ছবির সিরিজ।

আবার ঢুকে পড়ছে নতুন মুল্লুকে নতুন উদ্যমে। রথ দেখা, কলা বেচা দুটোই চলছে। চোখভরে দেশ দেখছে, পাথেয় আর রসদটাও যোগাড় করে নিচ্ছে।

ইন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা মিষ্টি হেসে ওদের পরিচয় দিয়েছিল। সন্ধ্যায়

একখানা সিঙ্গল সিটেড রুম চেয়েছিল। বেশী খরচের সঙ্গতি যে নেই তা স্পষ্ট করে না বললেও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

ইন্দ্রের ব্যাপারটা বেশ ভালই লেগেছিল। পথে পরিচয়, জীবনের কতকগুলো দিন একসঙ্গে কাটান, তারপর একদিন যে যার ঘরে ফিরে যাওয়া। কোন দায় নেই, কোন দায়িত্ব বহনের ঝঞ্ঝাটও নেই। হয়ত ওরা সংসারী হবে। যে যার দেশের ছেলে মেয়েদের বিয়ে করে ঘর বাঁধবে। তারপর কোন বিষণ্ণ দিনে মনে পড়বে দুজনের কথা। সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়ানো আকুল করা স্মৃতি। ঐ স্মৃতি-গুলোই হবে তখন তাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

মোটামুটি সস্তায় একখানা ভাল ঘরই ওদের দিয়েছিল ইন্দ্র। ঘরে বসে সমুদ্র দেখা যায়। দক্ষিণ দিক থেকে একটা ছোট্ট পাহাড় যেন সপরিবারে নেমেছে সমুদ্রে স্নান করতে। উঁচু নীচু কতকগুলো শিলাখণ্ডে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। শিলাগুলো ঢেউ-এর তলায় একবার ডুবছে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। সূর্যের সোনালী রোদ গায়ে মেখে তেরামালা পাখিরা ওদের স্নানলীলা দেখছে। নুলিয়াদের বড় আকারের কটা ভাল্লম ভোর থেকে সমুদ্র চষে বেড়ায়, তারপর শ্রান্ত হয়ে দুপুরে তীরে উঠেই সেই যে বালুর বিছানায় এলিয়ে পড়ে, দিনে রাতে আর নড়নচড়ন নেই। নুলিয়ারা ঐ নৌকার ছায়ায় ফেঁসে যাওয়া জাল সারাতে বসে।

ঘর পেয়ে ওরা বলেছিল, রেস্ত থাকলে এখানেই মাসখানেক দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়।

হঠাৎ আজ রাতে ওদের এমন অভিনয়ের ইচ্ছেটা চাড়া দিয়ে উঠল কেন, তার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে ইন্দ্র যা জানল তার মর্মার্থ এই :

সুগদনের সঙ্গে ঐ দুটি ফটোগ্রাফারের কি করে যেন ভাব জমে যায়। ওরা নারকেল বাগানে ওদের কুড়িল অব্দি ধাওয়া করে। ওখানে সুগদনের সুন্দরী বউ আর ছেলে মেয়েদের ফটো তোলে। ম্যানেজার সাহেব নেই, তাই সুগদন খুশী হয়ে ওদের সাধ্যমত ভোজে আপ্যায়ন করে। ভোজ শেষে কিছু পানীয়ের ব্যবস্থাও ছিল। নারকেল গাছের রস পচিয়ে তৈরী দিশি কোল্লম অতিথিদের সেবার জন্য পরিবেশন করেছে সুগদন। ভিনদেশী সুরা একটু মাত্রাতিরিক্ত পেটে পড়তেই ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। হোটেল থেকে রাত দশটায় ওরা স্নানের পোষাক পরে বেরিয়েছে সমুদ্রে। ভাগ্যিস সুগদন সঙ্গে ছিল তাই রক্ষে। ছেলেটি নাকি সমুদ্রে এ-জীবনের জ্বালা জুড়োবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, আর মেয়েটি সুগদনের সাহায্যে কাতর অনুনয়ে তাকে ফিরিয়ে

আনার চেষ্টা করছিল বার বার। এই ঝাঁপ দেওয়ার সংকল্প আর তা থেকে প্রত্যাবর্তনের পালা পুরো তিন চার ঘণ্টা ধরে অভিনীত হয়। সেই দীর্ঘ তিন চার ঘণ্টা বেচারা সুগদনকে ওখানে দাঁড়িয়ে অতিথি সেবার মাশুল জোগাতে হচ্ছিল।

এখন নাকি ছেলেটির ইচ্ছার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সে আর আপাততঃ যাচ্ছে না জলের দিকে। মাঝে মাঝে চাঁদ আর নারকেল গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে হাত পা নেড়ে বক্তৃতা শুরু করেছে। মেয়েটি কিছুটা নিশ্চিন্ত আর ক্লান্তও বটে, এখন শুয়ে বসে ওর বক্তৃতার তারিফ করছে।

ইন্দ্র জানতে চাইল, মেয়েটি কি সুস্থ আছে?

সুগদন বলল, না সাহেব, ও আরও বেশী বেহুঁস হয়েছে।

কি করে বুঝলে?

সুগদন মাথা চুলকে বলল, বলতে পারব না সাহেব।

ইন্দ্র কষে ধমক লাগাতেই সুগদন বলল, শেষবার ছেলেটা যখন জলে ঝাঁপ দিতে যায় তখন মেয়েটা চেঁচিয়ে বলল, এবার যদি জলে নাব তাহলে আমি সুগদনকে সঙ্গে নিয়ে কলম্বো চলে যাব।

সাহেব ঐ কথা শুনেই আমি পালিয়ে এসেছি। ছেলে বউ ফেলে আমি কি করে ওর সঙ্গে যাই সাহেব। বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল সুগদন। কাতর গলায় বলল, আমাকে বাঁচান সাহেব, আমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে গেলে আর বেঁচে ফিরতে পারব না।

ইন্দ্র দেখল, কেরালার কোল্লম আজ কাউকেই ছাড়েনি, তিনটি প্রাণীকেই ঘায়েল করেছে।

সুগদনকে ধমক দিয়ে এক সময় ঘরে পাঠাল ইন্দ্র। তারপর তিনতলায় নিজের ছোট্ট ঘরটিতে উঠে গেল।

এখন আর শোবার কোন মানেই হয় না। চারটে বেজে গেছে। জানালা দিয়ে ইন্দ্র চেয়ে রইল বাইরের দিকে। তার মনে হল নীল আকাশটা যেন চন্দ্রাতপ। জেগে থাকা চাঁদটা তার গায়ে সংলগ্ন একটা আলো। তার থেকে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে রঙ্গমঞ্চের ওপর। পশ্চাদপটে দিগন্তজোড়া সমুদ্র। সাদা বালির গালিচার ওপর শুরু হয়েছে অভিনয়। একটি যুবক আর যুবতী খণ্ডকালের মধ্যে অনাদি অনন্তকালের অভিনয় করে চলেছে।

দুপুরে ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো।

ওপার থেকে কথা ভেসে এল, কে বলছেন?

ইন্দ্র বলল, আমি সান অ্যাণ্ড সীর ম্যানেজার বলছি।

গলাটা ইন্দ্রর কাছে একেবারে অচেনা মনে হল।

ওপার থেকে অপরিচিতার গলা বাজল, মিঃ রায় বলছেন?

হাঁ, আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি?

ওপার থেকে ঈষৎ আনুনাসিক গলায় এবার কথা ভেসে এল, আমি ভূত। আরব সাগরের জলে ফেলে দেবার পর আমি উঠে এসেছি।

ইন্দ্র খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, কাছে পিঠে দিদি নেই বুঝি?

সরিতা ওপ্রান্ত থেকে বলল, কয়েক মাইলের ভেতর নেই। প্রেমাকে খুব ভয়, তাই না?

ইন্দ্র বলল, গরীব মানুষ, এসেছি অভাবে পড়ে চাকরী করতে, মালিকের ভয় তো একটু থাকবেই। কিন্তু আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?

সরিতা বলল, কলেজের কাছে বন্ধুর বাড়ী থেকে।

বান্ধবী কাছে নেই?

ওপ্রান্তে সরিতাকে চাপা গলায় বলতে শোনা গেল, তুই আমার পাশে আছিস কি না জিজ্ঞেস করছে।

তারপর ইন্দ্রের কথার জবাবে বলল, মেয়েরা কখনও কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের বান্ধবীদের খোঁজ খবর দিয়ে কথা বলতে ভালবাসে না।

ইন্দ্র বলল, এটা উদারতার অভাব।

সরিতা বলল, আজ্ঞে না মশায়, পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতার ফলে মেয়েদের সাবধানতা।

ওপ্রান্তে সরিতার বান্ধবীর হাসি শোনা যাচ্ছে।

ইন্দ্র বলল, অনেকদিনের বান্ধবী মনে হচ্ছে?

কি করে বুঝলেন?

ইন্দ্র বলল, আপনার অনুদার উক্তিকেও হাসি দিয়ে অভিনন্দিত করছে।

হঠাৎ ছন্দপতন হল। ওপারে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে।

সরিতার গলার সুর পালটে গেছে। সংকোচ আর বিনয় মিশিয়ে সরিতা বলল, হ্যাঁ স্যার, আপনার নোটগুলো মীনাক্ষি আর আমি কপি করছি। কদিন

পরেই আপনাকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু স্যার 'রোমিও জুলিয়েটের' কি হবে? ও ব্যাপারে একটু সাহায্য না করলে একেবারে যে ডুবে যাব।

দারুণ হাসি পেল ইন্দ্রের। চাপা গলায় বলল, গুরুজন জাতীয় কেউ ঘরে ঢুকে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

সরিতা বলল, হ্যাঁ স্যার। কবে আপনার কাছে যাব বলুন?

একটু থেমে যেন এপারের কথা শুনে নিয়ে বলল, শনিবার? না আমার কোন অসুবিধে নেই। দুপুরে আমি কলেজ থেকে আপনার ওখানে সোজা চলে যাব। আপনারও তো ওদিন কলেজ নেই।

একটু পরেই আবার বলল, আচ্ছা রাখছি স্যার।

ফোনটা রেখে দিল সরিতা।

ইন্দ্র আপন মনে খুব একচোট হাসলে। বুদ্ধিতে ঝক্‌ঝক্‌ করছে মেয়েটা। পরিস্থিতিকে কেমন ম্যানেজ করে নিলে।

ইন্দ্রের কানে কেবল বাজতে লাগল দুষ্টু মেয়েটার মিষ্টি গলা, রোমিও জুলিয়েটের কি হবে স্যার।

সূর্য তখন আরব সাগরের জল ছুঁয়ে মস্ত বড় একটা সিন্দুরের টিপের মত স্থির হয়েছিল। ইন্দ্র ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে তাই দেখছিল। পেছন থেকে হঠাৎ প্রেমার গলা বেজে উঠল, এই যে মিঃ রায় এখানে, আমি আপনাকে হোটেল আর ব্যাকওয়াটারের দিকে খুঁজে ফিরছিলাম।

ইন্দ্র প্রেমার মুখোমুখি হল। বলল, সাধারণতঃ আমি ব্যাকওয়াটারের দিকেই বেড়াতে যাই, কিন্তু আজ হোটেলের কাউকে না জানিয়ে এদিকে চলে এসেছি।

প্রেমা বলল, গাড়ীটা নিয়ে যেতে হবে। কাল একখানা যা কাণ্ড হল, সত্যি।

ইন্দ্র হেসে বলল, বেশ মজা হল বলুন।

মজাই বটে। আমার একটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আপনার রাতের ঘুমটাই মাটি হল।

বিশ্বাস করুন অনেক বেলা অব্দি ঘুমিয়েছি।

প্রেমা বলল, চলুন একটু হাঁটা যাক। সকাল থেকে ফোনের জ্বালায় কান ঝালাপালা। একটুও ঘুমুতে পারি নি। সন্ধ্যেটা সমুদ্রের ধারে বেড়ালে মাথাটা হালকা হতে পারে।

ইন্দ্র আর প্রেমা বালির ওপর দিয়ে পায়ের পাতা ডুবিয়ে হাঁটতে লাগল।

ইন্দ্র প্রেমার কথায় খেই ধরে বলল, ছোট থাকলে দুঃখ বড় হলে বিপদ, কোন কিছুতেই শান্তি নেই। আপনি এখন নাচের জগতের লাইম লাইটে এসে গেছেন, ঝকৃকি বাড়বে বৈ কমবে না।

প্রেমা বলল, দর্শকদের অতি উৎসাহে যেমন একটা ঝামেলা আছে তেমনি উত্তেজনা নেই বললে মিথ্যে বলা হবে।

সূর্য ডুবে গেছে অথৈ সমুদ্রের বুকের ঠিক মধ্যিখানে। আরব সাগরের জল এখন সন্ধ্যার নেমে আসা ছায়ার ছোঁয়ায় ঘন আর উত্তাল।

ইন্দ্র বলল, এখানে আসা অব্দি বেশ ক'টি নাচের আসরে যাবার সুযোগ হয়েছে আমার। অধিকাংশ শিল্পীর মুদ্রায় নাচের নির্ভুল ব্যাকরণই শুধু দেখেছি, মন ছুঁতে পারে নি। আপনি কাল কিন্তু প্রতিটি দর্শকের মনের সীমানায় আপনার নাচকে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনার 'বাসকসজ্জার' ভাবটি আশ্চর্য মধুর হয়ে ফুটে উঠেছিল।

প্রেমা নিজের ভেতর থেকে কথা বলে উঠল, জানেন, দেবন বলত, তুমি ভুলে যাও তুমি প্রেমা, শুধু ভাব তুমি সেই চিরদিনের প্রেমিকা যার হৃদয় প্রেমিকের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে। সমস্ত তরুণী হৃদয়ের কামনায় তোমার বুক ভরে উঠুক, তবেই তো তোমার সারা দেহে প্রিয়তমের জন্য প্রতীক্ষার আকুল ছবিটি ফুটে উঠবে।

ইন্দ্র বলল, ভারী সুন্দর কথা তো। কাতরতার ভাবটি কোন ব্যক্তির যেন না হয়, সমস্ত নারীর ভাবনাকে বুকে নিয়ে পথ চাওয়ার ভাবটি ফোটাতে হবে। দেবন কে, মিস মেনন ?

প্রেমা বলল, তাঁকে বড় একটা কেউ চেনে না কিন্তু আমাদের কলাকেন্দ্রমে এতবড় শিল্পী আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। ও শিখত কথাকলি আর আমি ছিলাম মোহিনী আট্যমের ছাত্রী।

জানেন, সুযোগ পেলেই আমি ওর ক্লাশে গিয়ে বসতাম। শুধু ওর দিকে চেয়ে দেখতাম। গুরু পিল্লাই বলতেন, দেবনের মত শিল্পী কালেভদ্রে জন্ম নেয়। ও জন্মেছে নাচের বিদ্যা আয়ত্ত করে।

ইন্দ্র বলল, আমি ওঁর নাচ দেখি নি। আপনার মুখে ওর কথা শুনে দেখতে ইচ্ছে করছে।

প্রেমা ম্লান হেসে বলল, ওকে পাবেন কোথা, ও ঐ এক ধরনের মানুষ। সাজান মণ্ডপে সমঝদারের সামনে ও বড় একটা নাচতে চায় না। ও বলে,

কথাকলি আমার কেরালার নাচ। যাদের নাচ তাদের ঘরে ঘরে একে পৌঁছে দেব আগে, তারপর এ জীবনে সময় যদি পাই বিশ্বজয়ে বেরোব।

ইন্দ্র বলল, আমি নাচের বিশেষ ভক্ত জানবেন, তাই দেবনের মত শিল্পীর নাচ দেখতে পেলাম না বলে বড় আফশোষ থেকে গেল।

প্রেমা বলল, ও এখন ঘুরছে গাঁয়ে গাঁয়ে পথে প্রান্তরে। সাধারণ মানুষকে ও ওর নাচের সমঝদার করে তুলতে চায়।

ইন্দ্র বলল, আপনারা একই সঙ্গে কলাকেন্দ্রমের শিক্ষার্থী ছিলেন তাহলে ?

প্রেমা বলল, একই সঙ্গে না বলে একই সময়ে বলতে পারেন। কথাকলিটা ঠিক মেয়েদের নাচ নয়, যদিও ওতে মেয়েদের ভূমিকা আছে। ওখানে পুরুষেরাই মেয়েদের ভূমিকায় অংশ নেয়। আর মোহিনী আট্যম পুরোপুরি মেয়েদের নাচ।

ইন্দ্র বলল, কথাকলির নাচে মেয়েদের ভূমিকাটা তো মেয়েরাই নিতে পারেন।

প্রেমা বলল, আমারও সেই মত। আমি একদিন কলাকেন্দ্রমে দেবনকে এই কথা বলছিলাম। শুনে ও তো ক্ষেপে উঠল। বলল, নাচের বিশুদ্ধতাকে সব সময়ই তোমরা নষ্ট করতে চাও। তোমাদের মোহিনী আট্যমে ভারত নাট্যম আর কথাকলির মিশ্রণ ঘটেছে ঘটুক, কিন্তু দয়া করে আর কথাকলিকে নতুন পোষাকে সাজিও না।

ইন্দ্র বলল, একটু উদারতা থাকলে ক্ষতি কি ?

প্রেমা বলল, শিল্পের ক্ষেত্রে দেবন উদারতায় আগ্রহী নয় বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী।

হোটেলের বয়টি ছুটতে ছুটতে এল। ইন্দ্রের পাশে এসে বলল, ছোট মেমসাহেবের ফোন এসেছে।

কথাটা শুনেই ইন্দ্রের মনে হল, সে যেন চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে উদ্ধারের আর কোন আশাই নেই। সন্ধ্যার আবছায়াতেও সে বুঝতে পারল প্রেমা তার দিকে চেয়ে আছে চোখে বিস্ময় নিয়ে।

কে যেন কথা জুগিয়ে দিল ইন্দ্রের মুখে। প্রেমার দিকে চেয়ে সে বলল, আপনার খোঁজেই বাড়ী থেকে ফোন এসেছে নিশ্চয়। আপনি কি এখানে আসার কথা বলে আসেন নি ?

প্রেমার চোখের দৃষ্টি সহজ হল। সে বলল, হয়ত তাই। কোন দরকারে আমার খোঁজ করছে সরিতা।

দুজনেই হোটেলের দিকে পা বাড়াল।

হোটেলে পৌঁছে ফোনটা তুলে নিল ইন্দ্র।

হ্যালো।

ও প্রান্ত থেকে সরিতা বলল, ম্যানেজার সাহেব হোটেলে নেই, এ তো বড় অন্যায়। আমি প্রেমা মেননের কাছে প্রতিবাদ জানাব।

ইন্দ্র অপরাধীর গলায় বলল, আমি এই একটুখানি বাইরে বেরিয়েছিলাম। হ্যাঁ আপনার দিদি এখানেই এসেছেন, কথা বলুন।

প্রেমা ফোন ধরল। ইন্দ্রের তখন কিছুটা ঘাম দিয়ে জ্বর নেমেছে। প্রথম ধাক্কাটা সামলানো গেছে।

প্রেমা বলল, গাড়ীটা নিতে এসেছি।

ওপারের প্রশ্নের জবাবে আবার বলল, হ্যাঁ সাইকেলে করেই এলাম। তুই অপেক্ষা কর, সাতটার ভেতর আমি এসে পৌঁছব।

প্রেমা ফোন ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রের দিকে এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, একেবারে পাগল। একটুখানি চোখের আড়াল হলেই খুঁজে খুঁজে সারা দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলবে। জানেন মিঃ রায়, উঠতে বসতে ওর গার্জেনীর ঠেলায় গেলাম। ওর রকম-সকম দেখে সবাই ভাবে ও-ই বুঝি আমার দিদি।

ইন্দ্র এখন প্রাণ খুলে প্রেমার হাসিতে যোগ দিল।

প্রেমা বলল, চলুন, আপনার রুমে বসে একটু কফি খাওয়া যাক।

একটু থেমে আবার বলল, আপনি তো নিজের থেকে বললেন না, তাই চেয়ে নিতে হল।

ইন্দ্র বলল, এ যেন আপনি নিজের ঘরে পরবাসী হয়ে থাকার কথা বলছেন। আমি আপনাকে আতিথ্য দেবার কে! আপনার হোটেলে কাজ করছি বই তো নয়।

ওপরে উঠতে উঠতে প্রেমা বলল, আমি হোটেলের প্রোপ্রাইট্রেস ঠিক, কিন্তু আপনি এ হোটেলের কর্মপরিচালক। সুতরাং হোটেলের ভেতর আপনার কর্তৃত্ব আমার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

ওরা এসে ঢুকল ইন্দ্রর ঘরে।

সুন্দর সাজানো ঘর। ব্যাচিলারের ডেরা বলে মনেই হয় না। প্রায় মাস দশেক ইন্দ্র চাকরীতে বহাল হয়েছে, কিন্তু প্রেমা ইন্দ্রের রুমে ঢোকে নি কোনদিন। হোটেলে এসে চলে গেছে কাজ সেরে। অফিস রুমে বসেছে, দরকারী কথা বলেছে; ওপরে ওঠার কথাই ওঠে নি।

প্রেমাকে একখানা চেয়ারে বসতে বলে নীচে নেমে গেল ইন্দ্র। কফি আর 'কিছু জলখাবারের অর্ডার দিতে গেল সে। হোটেলের একটা বয়কে ওপরে ডেকে অর্ডার দিতে পারত, কিন্তু তাতে দুটো অসুবিধে দেখা দিত। প্রেমা যেহেতু মালিক, তার সামনে অর্ডার চালানো শোভন নয়।

আর কিছু স্ন্যাক্স ইত্যাদির অর্ডার দিতে গেলে প্রেমা হয়ত বারণ করেই বসবে। তাই ইন্দ্র নিজেই অর্ডার দিতে গেল। আজ প্রেমা তার রুমে এসেছে সান্ধ্য কফির আসরে। ধরা যেতে পারে তার আতিথ্য নিয়েছে।

প্রেমা ঘরখানার দিকে তাকিয়ে দেখছে। লম্বা সাদা একখানা বুক শেলফ ইংরাজী, বাংলা বইতে ঠাসা। বইগুলো সাজানোর ভঙ্গীটা অদ্ভুত। মনে হবে কোন বিশিষ্ট বুক শপের শো-কেসে বই সাজানো রয়েছে। শেলফ-এব ওপরে মার্বেল পাথরের একসার হাতি চলেছে। পর পর বড় থেকে ছোট অনেক ছোট হয়ে গেছে হাতিগুলো। এগুলো যে কেরালার জিনিস নয় তা ভাল করেই জানে প্রেমা। ঘরের কোণে পেতলের একটা ঝকঝকে মাজা টব সাদা লম্বা গ্রীলের কাজ করা কাঁচের টপের ওপর বসানো। তার পাশে একটা লম্বা সাদা রড সিলিং ছুয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টবের থেকে মাণিপ্ল্যাণ্টের একটা লতা প্রায় আদ্দেক উঠে গেছে ঐ রডখানাকে পাক দিতে দিতে। পাতাগুলো সবুজ হলুদে মেশা। বিছানার ওপর যে বেড কভার পাতা তার রঙও হলদে। দুই প্রান্তের বর্ডারে কালো লাল আর সবুজ সুতো দিয়ে ডিজাইন তোলা। সব জায়গাতেই ছিমছাম একটা রুচির পরিচয়।

ইন্দ্র ঘরে ঢুকে বলল, আপনাকে একা বসিয়ে রেখে গেলাম, অপরাধ নেবেন না।

প্রেমা বলল, আপনার ঘরে বসে থাকলে কারো একা বলে মনে হয় না। একটা কিউরিও শপে বসে আছি বলে মনে হবে।

ইন্দ্র বলল, সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখতে জানলে হোটেল সাজাব কি করে। এটা তো আমাদের কাজেরই অঙ্গ।

খাটের পাশে টিপয়ের ওপর রাখা ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল সাজানো। সাজাবার ভঙ্গীটা মুহূর্তে চোখ টেনে নেয়।

প্রেমা বলল, আপনার ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেণ্ট কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর।

ইন্দ্র বলল, ও কথা বলবেন না। দক্ষিণীদের কাছে ভারতের আর সবাইকে ফুলের ব্যবহার শিখতে হবে। আপনাদের সারা দেহ ভরে ফুলেরই উৎসব।

প্রেমা বলল, আপনি কবি তাই বলছেন অমন করে। তবে ফুল আমরা

ভালবাসি। আমাদের সব উৎসবেই ফুলের ঘটা। কিন্তু আপনার ফুলদানি সাজানোর কায়দাটাই আলাদা।

ইন্দ্র বলল, ও বিদ্যেটা বিদেশ থেকে আমদানি করা মিস মেনন। ওটা ইকাবানা। জাপানী ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেণ্টের কায়দাতেই সাজানো।

প্রেমা মুগ্ধ গলায় বলল, আমার খুব ভাল লেগেছে।

ইন্দ্র হেসে বলল, সমঝদার তো পাই না, ভাগ্যিস আপনি দয়া করে আজ এলেন।

প্রেমা বলল, সত্যি আমি আপনার রুমে কখনো আসি নি। বাবা বেঁচে থাকতে সবই দেখতেন তিনি, আমি আমার পড়া আর নাচ নিয়েই থাকতাম। ওঁর অবর্তমানে একজন এ দেশীয় ম্যানেজারের ওপর ভার দিয়েছিলাম। তিনি কিছুকাল পরে আলেপ্পিতে নিজের হোটেল করে চলে গেলেন, তারপর এলেন আপনি।

ইন্দ্র হেসে বলল, কথা দিচ্ছি আমি অন্তত: হোটেল করে কোথাও উঠে যাব না।

প্রেমাও ইন্দ্রের হাসিতে যোগ দিল।

কিছুক্ষণের ভেতরই আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল প্রেমা। বলল, কাউকে কি চিরদিনের করে ধরে রাখা যায় মিঃ রায়।

কথাটা শুনে চমকে উঠল ইন্দ্র। একটি পূর্ণবিকশিত তরুণী বসে আছে তার সামনে। কৃতি নর্তকী প্রেমা মেননের কথায় কি অন্য কোন সুর বাজছে!

ইন্দ্র বলল, আমার দিক থেকে অন্তত: চলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আপনাদের যদি কোনদিন প্রয়োজন ফুরোয়, তাহলে সে আলাদা কথা।

আপনি কথাটা অন্যভাবে নেবেন না মিঃ রায়। আজ ঘুরে ফিরে কেবল দেবনের কথাই মনে পড়ছে। ওকে একদিন মনের ভেতর ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওকে চিরদিনের করে তো ধরে রাখা গেল না। তাই বলছিলাম আমাদের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়ে ওঠে না।

ইন্দ্র বুঝতে পারল, আজ সে প্রেমার উপলক্ষ্য হলেও আসল লক্ষ্য দেবন। প্রেমার জীবনে দেবন হয়ত কোনদিন এসে দাঁড়িয়েছিল, তার প্রতিভার পরিচয়লিপি উৎকীর্ণ করে গিয়েছিল। তাই প্রেমা মাঝে মাঝে অতীত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কফি আর কিছু খাবার নিয়ে বয় ঢুকল ঘরের ভেতর। খাবার সাজিয়ে রেখে চলে গেল। প্রেমা অন্যমনস্কভাবে কাপে কফি ঢালতে লাগল। ইন্দ্র

প্রেমাকে লক্ষ্য করল। কেরালার অধিকাংশ মেয়ে যেভাবে চুলের রাশ পিঠের ওপর ফেলে শুধু প্রান্তে একটুখানি বেঁধে রাখে প্রেমা তেমনি করেই চুল বেঁধেছে। ঘাড় কাৎ করে কফি ঢালার সময় সে এমন দর্শনীয় ভঙ্গীতে মুখখানাকে ফুটিয়ে তুলছে যেখান থেকে সহজে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না।

প্রথম কফির কাপ প্রেমা তুলে দিল ইন্দ্রের হাতে। বলল, কফিতে দু' চামচ চিনি দিলাম আপনাকে না জিজ্ঞেস করেই।

ইন্দ্র বলল, আপনার আন্দাজ বোঝা গেল অব্যর্থ। আমি দু' চামচ চিনিই নিয়ে থাকি।

নিজের কাপ ঠোঁটে ঠেকিয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করল প্রেমা। এক সময় বলল, আচ্ছা ঘণ্টার টুং টাং একটা আওয়াজ কোত্থেকে আসছে বলুন তো? খুব মৃদু অথচ ভারী মিষ্টি একটা আওয়াজ? শুনতে পাচ্ছেন না?

ইন্দ্র মুখে হাসির রেখা টেনে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকাল। প্রেমার চোখ পড়েছে এবার। সে গলায় বিস্ময়ের সুর তুলে বলল, আমি এতক্ষণ মাথা ঘামিয়ে মরছি শব্দটার উৎস নিয়ে কিন্তু এখন দেখছি আওয়াজ আপনার ঘর থেকেই উঠছে।

একটা পেতলের চেন সিলিং থেকে ঝোলান। তার থেকে ঝুলছে ছোট বড় মাঝারি প্রায় ডজনখানেক ঘণ্টা। সামান্য হাওয়ায় দুলে দুলে মৃদু মিষ্টি একটা আওয়াজ ছড়াচ্ছে।

প্রেমা চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আপনি একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদার মিঃ রায়, কিন্তু শিল্পী নন।

ইন্দ্র কথাটা এভাবে শুনবে আশা করে নি, তাই চমকে উঠল। উত্তরে শুধু বলল, আপনার অনুমান নির্ভুল। নিজে শিল্পী না হলেও শিল্পবস্তুর ওপর আমার একটা মোহ আছে। কিন্তু আপনার এই নির্ভুল অনুমানের কারণটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

প্রেমা বলল, কারণ খুব সোজা। আমি নাচ কম্পোজ করি, সারাদিন ওরই ভাবনায় আমার কেটে যায়, কিন্তু নাচের অলংকার পোষাক পরিচ্ছদ ফুল পাতার খবরই আমি রাখি না। আমার সব কিছুই এলোমেলো হয়ে থাকে। সরিতা না থাকলে আমি অন্ধ। ও-ই আমাকে সাজিয়ে স্টেজে পাঠায়। আমার যদি সামান্য কিছু কৃতিত্ব থাকে তাহলে তার আদ্ধেকের বেশী ওরই প্রাপ্য।

ইন্দ্র মনে মনে খুশী হয়ে বলল, সেদিন স্টেজে কিন্তু আপনাকে অসামান্য

মনে হয়েছিল। আপনার সাজে আড়ম্বর ছিল না কিন্তু বেশ-বাস অলংকরণে এমন নিখুঁত একটা হারমনি ছিল যা চোখকে সারাক্ষণ বেঁধে রেখেছিল।

প্রেমা তদ্গত হয়েছে মনে হল। সে বলল, মোহিনী আট্যমের পোষাকে, ফুলের কাজে শুধু সাদারই মেলা। আমার মনে হয় যিনি প্রথম নাচের পোষাক পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি ছিলেন যথার্থ একজন ভাবুক। পোষাকের চমকে শিল্পী দর্শকদের ভোলাবে এটা তিনি চান নি। সাদা পোষাকে শিল্পীর সারা দেহের প্রতিটি রেখা শ্বেত পাথরের তৈরী মূর্তির মত ফুটে উঠবে, সেখানেই তো সবকিছু চার্ম। তার ওপর যখন সেই শ্বেত ভাস্কর্য নাচের লীলায় মেতে ওঠে তখনই সে হয় মোহিনী।

ইন্দ্র বলল, আপনার ব্যাখ্যার তারিফ না করে পারছি না। অ্যাপোলো অথবা ডেভিডের মূর্তি কিম্বা ভেনাসের ছবি হঠাৎ যদি প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে তাহলে সে বিস্ময়, সে রোমাঞ্চ ধরে রাখা যায় না। তাদের নগ্নতা তখন চোখের পীড়া না হয়ে প্রাণের উৎসব হয়ে ওঠে।

প্রেমা হঠাৎ অন্যমনস্ক হল। আশ্চর্য সুন্দর মুদ্রায় গালে আঙুল ঠেকিয়ে অন্য মনে চেয়ে রইল।

এক সময় বলল, কথাকলি কিন্তু তুলনাহীন। যদিও শিল্পী সারা পোষাকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, তবু তার অভিব্যক্তি অসাধারণ। দেবন বলে, দেহ দেখিয়ে তোমরা অদ্ধেক জয় কর, বাকীটুকু মুদ্রায়। কিন্তু আমরা আড়ালে থেকে আমাদের সম্পদকে বিলিয়ে দিই।

ইন্দ্র বলল, কথাটার আংশিক সত্যতা হয়ত আছে, কিন্তু দেবনের উক্তিটা শোনাচ্ছে অহংকারের মত।

প্রেমার গলার স্বরে উত্তেজনা, আপনি ঠিকই বলেছেন দেবন অহংকারী, কিন্তু অহংকার দেবনেরই শোভা পায়। সে যাদুকর, তার প্রতিটি মুদ্রায় চুম্বকের আকর্ষণ।

ইন্দ্র হেসে বলল, কিছু মনে করবেন না মিস মেনন, আপনি মনে হয় দেবনের সবচেয়ে বড় গুণগ্রাহী।

প্রেমা কোন কথা বলল না। সে ইন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ইন্দ্র বুঝল প্রেমার চোখ রয়েছে তার দিকে কিন্তু আসল দৃষ্টিটা হারিয়ে গেছে নিজের মধ্যে।

এক সময় প্রেমা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ব্যস্ত হয়ে বলল, মিঃ রায় আপনার সান্ধ্য কফির জন্য ধন্যবাদ। সরিতা আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

দরজা পেরিয়ে করিডোর দিয়ে প্রেমা দ্রুত সিঁড়ির দিকে চলল। এক সময় পেছন ফিরে ইন্দ্রকে বলল, আপনার শিল্প রুচি আর আলোচনার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত লয়ে নেমে গেল প্রেমা। ইন্দ্র তার পেছন পেছন নীচে নামল। প্রেমা কিন্তু আর কোনদিকে না তাকিয়ে গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে বলল, এই আপনার চাবি।

প্রেমা মিষ্টি একটা হাসি হেসে চাবিটা ইন্দ্রের হাত থেকে নিয়ে গাড়ী খুলে ঢুকে বসল।

ভোরের রোদের মত লাবণ্যে মাখা হাতখানা গাড়ীর বাইরে বের করে নাড়ল, তারপর গাড়ী চালিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হোটেলে উঠে এসেই ইন্দ্র ফোনের লাইনটা নিজের রুমে নিয়ে নিল তারপর তিনতলায় উঠে বিছানার উপর বসে ডায়েল করল।

ও প্রান্তে ফোন ধরল সরিতা, হ্যালো।

ইন্দ্র বলল, কে বলছেন ?

ওপার থেকে উত্তর এল, কাকে চাই আপনার ?

সরিতাকে।

আপনি কে বলছেন ?

ইন্দ্র সরিতার গলা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, আমি ছাড়া আপনার আর কটি পুরুষ বন্ধু আছে মিস মেনন ?

অমনি সরিতা ফোঁস করে উঠল, আপনার মত আমার বন্ধুর সংখ্যা অত বেশী নয় মানি তা বলে একটিমাত্র মানুষের কথার জন্যে কান পেতে আছি ভাবলেন কি করে ?

ইন্দ্র বলল, তর্ক থাক, কি বিপদেই না ফেলেছিলেন আজ। দিদির সঙ্গে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, হোটেলের বেয়ারা গিয়ে বলল, ছোট মেমসাব আপনাকে ফোনে ডাকছেন।

তাই বুঝি ?

ইন্দ্র বলল, এমন বিপদে কস্মিনকালেও পড়িনি। প্রেমার মুখ তো বিস্ময় চিহ্ন এঁকে আমার দিকে চেয়ে আছে। যা হোক অদৃশ্য দেবতাই শেষটায় হাল ধরে রক্ষা করলেন।

সরিতা বলল, প্রেমা এখন কোথায় ?

ইন্দ্র দুষ্টুমি করে বলল, আমার ঘরে বসে আছেন।

সরিতার গলায় বিস্ময়, সে কি! কি করছে?

তাঁর বোনের জন্য ঘটকালী করছেন।

সরিতা বলে উঠল, নিজের জন্যে নয় তো?

মেয়েরা দারুণ অবিশ্বাসী। পুরুষদের চেয়েও মেয়েরা মেয়েদের সন্দেহ করে বেশী।

সরিতা বলল, আর সেই সুযোগে ভালমানুষ ছেলেগুলো মেয়েদের ঠকিয়ে আনন্দ পায়।

ইন্দ্র বলল, আপনার এ অপবাদ থেকে একজন পুরুষ এখনও নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে।

সরিতা অমনি বলল, তাহলে জিতেন্দ্রিয় পুরুষটির মুখখানা তো আর একবার ভাল করে দেখতে হয়।

ইন্দ্র অমনি বলল, বন্ধুর বাড়ী থেকে যে ফোনে বললেন শনিবার পড়তে আসছেন প্রফেসারের বাড়ী, তাহলে আসছেন তো?

আপনি কি আমার প্রফেসার? তিনি আমার অনেক শ্রদ্ধেয়।

ইন্দ্র বলল, আশা করি আমি এখনও কারো চোখে দারুণ রকম একটা অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠিনি।

সরিতা বলল, শনিবার তৈরী থাকবেন।

আদেশ মানাই আমার কাজ।

সরিতা ফোন রেখে দেবার আগে বলল, মনে থাকে যেন।

ইন্দ্র ফোনটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

শনিবার ভোর হল। প্রথম হেমন্তের হাওয়ার মত শিরশিরে একটা অনুভূতি ছুঁয়ে গেল ইন্দ্রের সারা দেহমন। সে বিছানায় শুয়ে জানালার ফাঁকে তাকিয়ে দেখল কাট্টুমারমে চেপে হোটেলের সেই ভুবন ভ্রাম্যমান ফটোগ্রাফার যুগল সমুদ্র চষতে বেরিয়েছে। নুলিয়া পাল সামলাচ্ছে, আর ওরা দুটিতে বৈঠা পিটছে জলে।

ইন্দ্রের মনে হল, কত সুখী ওরা। হাওয়ার সমুদ্রে ডানা ভাসিয়ে পাখির মত সারা দুনিয়ায় উড়ে চলেছে।

ইন্দ্র বিছানার ওপর উঠে বসতেই পেছনের জানালায় চোখ পড়ল। নারকেল গাছের মাথা ছুঁয়ে সকালের একফালি সোনালী আলো লম্বা উত্তরীয়ের

মত মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সুগদনের বছর ষোল বয়েসের মেয়ে কেনাগাম্মা সেই উত্তরীয়ের খানিকটা বুকে জড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখছে। কি যেন একটা পাখি শিস্ দিয়ে ওর চোখের তন্ময় চাউনিটা কেড়ে নিল।

আজ এই মুহূর্তে দারুণ একরকমের ভাল লাগায় পেয়ে বসল ইন্দ্রকে। তার নিজেকে মনে হল কবি হাফিজ—যিনি বোখারা সমরখন্দের মত দুটি নগরীকেও একটি তুর্কী মেয়ের কালো তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে রাজী ছিলেন।

বেলটা অনেকক্ষণ ধরে বাজাল ইন্দ্র। হোটেলের বেয়ারাটির পড়ি কি মরি করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসার শব্দ শুনতে পেল সে। ঘরে এলে তাকে অর্ডার দিল কফির।

নাচ থেকে কানেকশান নিয়ে ইন্দ্র ফোন তুলল। প্রেমার বাড়ীতে ডায়েল করতে গিয়ে তার মনে হল, যদি সরিতা না ধরে প্রেমা ফোন ধরে তাহলে কি কথা বানিয়ে বলবে সে। আবার ফোনটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে সে ভাবতে বসল।

সেকেণ্ড থটে তার মনে হল, সে ফোন করবে না। প্রতীক্ষা করবে প্রতিটি মুহূর্ত সরিতার জন্যে। এক সময় রাগ হল সরিতার ওপর। তিন তিনটে দিন পার করে শনিবার এল, সরিতা কি এর ভেতর তাকে একবারও ফোন করার সুযোগ পেল না। ইন্দ্র ভাবল, এত উতলা হবার কি আছে। সরিতা তার খবর না নিয়ে যদি তিন দিন কাটিয়ে দিতে পারে তবে সে-ই বা পারবে না কেন।

আশ্চর্য, ইন্দ্রের এলোমেলো ভাবনার ভেতরেই ফোন বেজে উঠল। সরিতার ফোন।

হ্যালো, বলতেই ওপ্রান্ত থেকে সরিতা বলল, মশায়ের আশাকরি সুনিদ্রা হয়েছে?

ইন্দ্র বলল, মালিক নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলে তবেই কর্মচারীদের সুনিদ্রা হয়।

সরিতা বলল, আপনি দেখছি কর্মচারী হিসেবে একদম কাঁচা। মালিক পক্ষ যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় তখনই তো কর্মচারীদের জেগে থাকার পালা। ঐ সুযোগে কিছু হাতিয়ে নেওয়া যায়।

ইন্দ্র বলল, কাঁচা থেকেই যদি এমন পাওনা জোটে তাহলে পাকা হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই আমার।

সরিতা বলল, জানি না আপনি কি পেয়েছেন তবে আমি একজন বন্ধু পেয়েছি।

ইন্দ্র বলল, মালিক বোধ হয় কাছে পিঠে নেই।

সরিতা বলল, মালিক এখন নতুন উত্তেজনায় মেতেছে। সরকার থেকে এসেছে আমন্ত্রণ। বিদেশ থেকে আসছেন কোন এক বিশিষ্ট সরকারী অতিথি, তাকে নাচ দেখাতে হবে। তার প্রস্তুতি চলেছে পুরোদমে।

ইন্দ্র বলল, ঘরেই তাহলে অনুশীলন চলছে বলুন।

সরিতা বলল, আজই সরকারী গাড়ীতে রওনা হয়ে গেছে। কদিন খাতিরে থাকবে সরকারী অতিথিশালায়। ওখানে কথাকলি মোহিনী আট্টম, আরও অনেক লোকনৃত্যের দলও জমায়েৎ হবে। রিহার্সেল চলবে পুরোদমে। এ দু'তিনটে দিন আমারও হিপ হিপ হুররে।

ইন্দ্র বলল, আহা দিদির ওপর কি ভক্তি, কি টান।

সরিতা বলল, আমার টান না থাক কিন্তু আর কারো টান থাকলেই মুশকিল।

ইন্দ্র কথা পাল্টাল, আসছেন কখন ?

সরিতা ওপার থেকে বলল, যাব কিনা ভেবে দেখছি।

তিন দিন ধরে ভেবে ভেবেও স্থির করতে পারলেন না ?

সরিতা বলল, কলেজে গানের কম্পিটিশান আছে, তাই এ ক'দিন গলা নিয়ে পড়েছি।

আপনি যে গান জানেন তা তো জানতাম না।

সরিতা বলল, জানবার মত গান নয় তাই জানতে পারেননি। নইলে রেডিও খুললে অথবা রেকর্ড চালালে জানতে পারতেন।

একটু থেমে আবার বলল, তিনটেয় তৈরী থাকবেন। তিন দিনের মত হোটেল থেকে ছুটি করে নিতে হবে।

ইন্দ্র বলল, তিন দিন !

সরিতা বলল, থাক তাহলে আপনি আপনার হোটেল নিয়েই থাকুন।

রাগ করছেন কেন হোটেলটা তো আপনাদেরই। ভালভাবে তার দেখাশোনা করলে লাভ হবে মালিকের।

সরিতা বলল, এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন মশাই। আহা দুনিয়ার সব কটা হোটেল যদি আপনার মত একজন করে ম্যানেজার পেত তাহলে তাদের পয়সা রাখার জায়গা থাকত না।

ইন্দ্র বলল, কর্তার ইচ্ছেতে কর্ম। আমি এখন থেকেই তৈরী।

সরিতা বলল, কাজের মানুষেরা কাজের ভেতর থেকেই ছুটি বের

করে নিতে জানে, যারা কাজ করতে জানে না তারা ছুটি ম্যানেজ করতেও জানে না।

ইন্দ্র বলল, জন্মে জন্মে যেন মেনন বোনদের মত মালিক পাই।

সরিতা বলল, তা বলে ভাববেন না আপনার মত কাজ পাগল ম্যানেজার আমি জন্মে জন্মে চাইব।

ইন্দ্র বলল, আমি ঠিক তিনটেতে তৈরী থাকব।

আমি কিন্তু একটি মিনিটও দাঁড়াব না।

ইন্দ্র হেসে বলল, দাঁড়াবেন কেন, হোটেলে বসার ভাল ব্যবস্থা আছে।

সরিতা বলল, ফোন রাখছি, কথাটা মনে থাকে যেন। বসাটসার ভেতর আমি নেই।

ইন্দ্র বলল, তথাস্তু।

ফোন ছেড়ে দিল সরিতা।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটে সুগদনের মেয়ে কেনাগাম্মা এসে দরজার বাইরে দাঁড়াল।

ইন্দ্র চোখ তুলে তাকাতেই কেনাগাম্মা বলল, ছোট মেমসাহেব আপনাকে ডাকছেন।

ইন্দ্র তৈরী হয়েই ছিল, বেরিয়ে পড়ল কেনাগাম্মাকে সঙ্গে নিয়ে। নারকেল বাগান পেরিয়ে রাস্তার কাছাকাছি এসে কেনাগাম্মা থেমে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল ইন্দ্র।

গাড়ীর স্টিয়ারিংএ গাল ঠেকিয়ে ইন্দ্রের দিকে চেয়েছিল সরিতা। ইন্দ্র কাছাকাছি যেতেই সোজা হয়ে বসল।

ইন্দ্র কাছে গিয়ে বলল, আপনি দারুণ পাংচুয়েল।

অপরাহ্নের রোদে সরিতার মুখে একরাশ জুঁই ফুল ফুটে উঠল।

সরিতা কিন্তু কোন কথা বলল না। ইন্দ্র বাঁ-দিকের দরজা খুলে ঢুকে বসল সরিতার পাশে। সরিতা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে পূর্ব উত্তর মুখের একটা পথ ধরল।

দুজনেই নীরব। সরিতা পথের দিকে সিধে চোখ রেখে গাড়ী চালাচ্ছে, আর ইন্দ্র আড়চোখে দেখছে সরিতাকে।

একেবারে টিপিক্যাল মালয়ালী তরুণী। মসৃণ মাজা রং। ঘন চুলের রাশ,

শেষ অংশটুকুতে সুন্দর একটুখানি সাদা ফুলের কাজ। সরিতা মুণ্ডি পরেছে। সাদা কোচান লুঙ্গী। হাল্কা নীল রংয়ের জম্বরে বুক ঢাকা। তার ওপর দিকে ব্রোচে আঁটা সোনালী পাড় একখানা সিল্কের সাদা নেরিয়দ প্রপাতের মত বুকের ওপর ঢেউ তুলে কোমর অব্দি নেমে এসে পাক খেয়ে দেহের গভীরে হারিয়ে গেছে।

ভারী মিষ্টি একটা গন্ধ ইন্দ্রের নাকে এসে লাগছে। ওটা সরিতার বিমুনীতে বাঁধা ফুলের গন্ধ কি উর্ধ্ববাস জম্বরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ঘামের সঙ্গে মিশ্রিত কোন সৌগন্ধ তা ইন্দ্র অনুমান করতে পারল না।

সেই মুহূর্তে ইন্দ্রের কেন জানি না মনে হল, সরিতা দ্রুত ধাবমান এক কস্তুরী মৃগ। আপন যৌবনের সুবাসে আপনি বিভোর।

ইন্দ্র বলল, আমরা এখন কোথায় চলেছি?

একটা গাড়ীকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গিয়ে সরিতা বলল, জানি না।

সে কি, নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই যাবার?

সরিতা গাড়ীর স্পীড কমিয়ে নিয়ে বলল, ইচ্ছে হলে এখনও আপনি ফিরে যেতে পারেন।

তাই বুঝি আমি বলেছি!

সরিতার গাড়ীর পাশ দিয়ে পেছনের গাড়ীটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

সরিতা আবার স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে। সামনের গাড়ীটার সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আনতে আনতে বলল, হাতে স্টিয়ারিং যেখানে খুশী যাব।

ইন্দ্র আর কোন কথা বলল না। সে দেখল সরিতা দুটো ঠোঁট এক সঙ্গে চেপে ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে ঝুঁকে পড়ে গাড়ী চালাচ্ছে।

আবার সরিতার গাড়ী প্রতিযোগিতায় জিতে গেল। এখন আরও স্পীডে বেশ কিছু দূর চলে এসে সরিতা অনেকটা স্বাভাবিক হল।

ইন্দ্র বলল, আপনার ভেতর একটা উত্তেজনা সব সময় কাজ করছে।

কি রকম?

এই যেমন লরীটাকে ওভারটেক করা; হুট করে সামান্য পরিচিত একটি যুবকের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়া।

কি বললেন? আর একবার বলুন।

ইন্দ্র বলল, এইটুকু পরিচয়ে কাউকে কি সত্যিকারে চেনা যায়?

সরিতা বলল, চেনা গেলে ওতেই যায়, নইলে সারা জীবন চোখে চোখ পেতে বসে থাকলেও চেনা যায় না।

গাড়ী চলছে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে। মাখন রংয়ের মাম্পুতে আমের গাছ ভরে আছে। যেন কোন দক্ষ কারিগর ছোট ছোট মুক্তোর দানায় মুকুট তৈরী করে সাজিয়ে রেখেছে গাছের শাখায় শাখায়। পড়ন্ত বেলায় মেয়েরা জল নিতে এসেছে। কিনারের চারপাশে বাধান বেদীতে কেউ বা ছড়িয়ে বসেছে, কেউ বা কুডমে ইতিমধ্যেই জল ভরে মাথায় তুলেছে। চলে যাবার আগে আলাপিনীদের সঙ্গে হয়ত দু'চারটে রসিকতার কথা বলছে। চেম্বু কুডম্, পিত্তলকুডম্, আর মান কুডমের ছড়াছড়ি দেখে মনে হচ্ছে তামা পেতল আর মাটির কলসীর যেন হাট বসেছে।

গাড়ীটা একটু থামাবেন, বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে—শুকনো গলায় বলে উঠল ইন্দ্র।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে গাড়ী দাঁড় করাল সরিতা।

গাড়ী থেকে নেমে বলল, চলুন কিনারের ধারে। আজলা ভরে খেতে হবে কিন্তু।

ইন্দ্র আর সরিতা এগিয়ে গেল কুয়োর দিকে। আট দশটি মেয়ে তখন নির্বাক হয়ে ওদের দেখছে। যে মেয়েটি কিনার থেকে জল টেনে তুলছিল তার হাতের দড়ি হাতেই ধরা রইল। কুয়োর মাঝপথে ভরা বালতি দোল খেতে লাগল।

ইন্দ্র তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমার হাতে একটু জল ঢেলে দেবেন, তেষ্টা পেয়েছে।

সব ক'টি চোখ একঝাঁক ভোমরার মত ইন্দ্রের দিকে ধেয়ে গেল।

যে মেয়েটির বালতি কুয়োর ভেতর দুলতে দুলতে থেমে গিয়েছিল সেই তরুণী মেয়েটি সিঁড়ির ওপর বাঁ পাখানা রেখে দু' হাতে দড়ি ধরে দ্রুতলয়ে টানতে টানতে বালতিটাকে তুলে আনল ওপরে।

নিজের পিত্তলকুডমে জলটুকু ভরে নিয়ে সেই কলসী ওপরে তুলে অনেক যত্ন করে ইন্দ্রের অঞ্জলি করা হাতের ভেতর ঢালতে লাগল।

ইন্দ্র স্যুটখানা বাঁচিয়ে ঠোঁট দুটো সরু করে জল খাচ্ছিল। কিছু পরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, তৃষ্ণা তার মিটেছে। অমনি সরু জলধারাটা ইন্দ্রের হাত থেকে ম্যাজিকস্টিকের মত অদৃশ্য হয়ে গেল পিত্তল কুডমের ভেতর।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সরিতা দেখছিল। ইন্দ্র তার কাছে ফিরে এল। দুজনে মিষ্টি করে হাসল মেয়েদের দিকে চেয়ে। ওরা কেউ কেউ হাসি দিয়ে প্রত্যুত্তর দিল ওদের।

একটি তরুণী মেয়ে সরস গলায় বলল, কোথায় চলেছেন ?

সরিতা যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, থেমে দাঁড়িয়ে মুখখানাকে কাৎ করে ফেরাল। চোখে মুখে খুশীর ঢেউ তুলে বলল, যে দেশের আকাশে চাঁদ ডোবে না আর ফুলের থেকে মধু গড়িয়ে পড়ে তো পড়েই।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। অমনি বলে উঠল, হানিমুনে যাচ্ছেন ?

সরিতা পেছনে হাত নাড়তে নাড়তে গাড়ীর দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল। আর মেয়েরা কলহাস্যে যেন তাদের ভরা কলসীর জল উজাড় করতে লাগল কূয়োর ভেতর।

ইন্দ্র কথাটা শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু সে আগেই পা চালিয়ে চলে এসেছিল গাড়ীর কাছে। সরিতা এলে সে তার জায়গায় গিয়ে বসল। সরিতা গাড়ীতে স্টার্ট দিলে ইন্দ্র একবার মুখ বের করে হাত নাড়ল। অমনি একরাশ পাতা যেন চঞ্চল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওদের অভিনন্দন জানাতে লাগল। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল ততক্ষণ ওরা অক্লান্ত উৎসাহে হাত নেড়ে চলল।

এক সময় গাড়ী চালাতে চালাতে সরিতা বলল, আপনি তো দেখছি দারুণ গুণী লোক মশাই।

কি রকম ?

ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে পারেন।

ইন্দ্র মাথা চুলকে বলল, আর একটু সহজ করে বলুন।

এই যেমন ঠিক জায়গাটি বুঝে তেষ্টা পেয়ে গেল।

ইন্দ্র হেসে উঠে বলল, আমার জলতেষ্টার ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না।

সরিতা অমনি বলল, আমার কথাটা কি অবিশ্বাসের মত শোনাচ্ছে ?

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যেন আপনারও তেষ্টা পায়, আর সে সময় যেন একরাশ ছেলে রাস্তার ধারে কোকাকোলা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সরিতা বলল, তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও আমি খাব না।

এ আপনার জেদের কথা।

সরিতা বলল, তা বলতে পারেন। একধরণের একগুয়েমি আছে আমার চরিত্রে।

গাড়ী এসে থামল একটা বাজারের কাছে। বাজারের মাঝবরাবর ক্যানেল চলে গেছে। ক্যানেলে অনেক নৌকো জড়ো হয়েছে। নারকেলের দড়ি বোঝাই কোনটাতে, কোনটায় বা আস্ত নারকেল, তেলের ড্রাম মশলাপাতির বস্তা নামান ওঠান চলছে।

ইন্দ্র বলল; গঞ্জের মাঝখানে গাড়ী থামালেন কেন?

সরিতা হেসে বলল, আপনি নারকেল কুঞ্জের মাঝে যদি গাড়ী থামিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে জল চেয়ে খেতে পারেন তাহলে আমিও গঞ্জের মাঝখানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটু বীরত্ব দেখাই না কেন।

সরিতা গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন কোকাকোলা খাওয়া যাক।

ইন্দ্র চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, কই কোন মহিলা বিক্রেতাকে তো চোখে পড়ছে না।

সরিতা বলল, আপনি এত সিরিয়াস কেন? কখন একটা কথা বলেছি আর তাই মনে করে রেখে দিয়েছেন। বলেছি না, নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়েছি সুতরাং আমাদের ভাবনারও কোন নিয়ম কানুন থাকবে না।

ওরা দুজনে সামনের দোকানে গিয়ে দুটো কোকাকোলা নিয়ে খেতে লাগল।

সরিতা স্ট্রতে ঠোঁট ছুঁইয়ে একটু একটু করে টানছিল আর চোখের তারা ভুরুর দিকে তুলে দেখছিল ইন্দ্রকে।

হঠাৎ খেয়াল চাপল মাথায়। অমনি বলে উঠল, একটু কাজু খেলে হয় না? প্লিজ ঐ দোকান থেকে যদি এক প্যাকেট···।

কথা শেষ হবার আগেই ইন্দ্র বলল, ও সিয়োর।

বলেই তাকাল দোকানটার দিকে। ওর আধ খাওয়া বোতলটা ডান হাতে ধরে নিল সরিতা।

বলল, আমার জিম্মায় রেখে যান, ফিরে এসে অক্ষতই পাবেন।

ইন্দ্র চলল কাজু কিনতে আর সেই মুহূর্তে সরিতার বুকের অনেক গভীর থেকে একটা ইচ্ছা শীতের সকালের শিরশিরে হাওয়ার মত প্রতিটি রোমকূপ কাঁপিয়ে উঠে এল।

ইন্দ্রের কোকাকোলার স্ট্রতে ঠোঁট ছুঁইয়ে খানিকটা টেনে নিল গলায়।

মুহূর্তে সমস্ত শরীরটা অদ্ভুত এক উত্তেজনায় বিবশ হয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই একটা অপরাধ বোধ জাগল মনে। খেয়ালের খেলায় এমন একটা অন্যায় সে করে বসল কি করে! সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের দুঃখ তার এতদিনের মার্জিত মনটাকে পীড়িত করতে লাগল।

ইন্দ্র ফিরে এসে বলল, নিন আপনার কাজুর প্যাকেট। দিন আমার কোকাকোলার বোতল।

সরিতা ইতস্তত করতে লাগল বোতল দুটো নিয়ে। বলল, সরি মিঃ রায় দুটো মিশে গেছে।

ইন্দ্র অর্থপূর্ণ চোখে সরিতার কাতর মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে নিয়ে বলল, ও কিচ্ছু হবে না, দিন চোখ বন্ধ করে যে কোন একটা হাত বাড়িয়ে। ওটাই ঠিক আমার বোতল হয়ে যাবে।

সরিতা বলল, ভুল যখন আমি করেছি প্রায়শ্চিত্ত আমার। আমিই দুটো শেষ করব। আপনি বরং দোকান থেকে আর একটা নিয়ে নিন।

ইন্দ্র বলল, ভুল করেছেন ঠিক কিন্তু ভুলটা দারুণ রকম মিষ্টি, আর আপনার যখন দুটো খেতে আপত্তি নেই তখন আমারও যে কোন একটা খেতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

সরিতা সংকোচ করছে দেখে ইন্দ্র একটা দশ পয়সা বের করে বলল, হেড না টেল?

সরিতা থমকে থেমে আছে দেখে ইন্দ্র বলল, বলুন বলুন বাঁ-হাতেরটা টেল আর ডান হাতেরটা হেড।

সরিতা সহজ হল, হেড।

পড়ল হেড।

ইন্দ্র বলল, দেখলেন তো আপনার ইচ্ছার সঙ্গে ভাগ্যটাও কেমন মিলে গেল। ডান হাতেবটা আপনার না হয়েই যায় না। দিন আপনার বাঁ হাতের পানীয়টা আমাকে দিন।

হাসতে হাসতে সরিতা নিজের কোকাকোলাটা ইন্দ্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এখন থেকে কিন্তু এমনি লটারী করে আমাদের খুঁটিনাটি সব ডিসপিউটের সমাধান হবে।

ইন্দ্র বলল, আমি একশো একবার রাজি।

যে খেলাটা একটা গোপন উত্তেজনার ভেতর দিয়ে শুরু হয়েছিল সেটার এমন একটা মজার পরিণতিতে সরিতার মনটা খুশীতে ভরে উঠল;

ওরা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে হেসে কোকাকোলা খেতে লাগল। পানীয়টুকু এখন আর শুধু নিরীহ পানীয়ই রইল না, দারুণ একটা উত্তেজক ক্রিয়া শুরু করে দিল দেহের ভেতর গিয়ে।

গাড়ী ছুটে চলেছে। সরিতার মুখে কথা নেই। ইন্দ্র ভাবছে সরিতার কথা, প্রেমা আর সরিতার ভেতর স্বভাবে আর আদলে কত ফারাক। প্রেমার রঙে কাচা হলুদের জৌলুস আর সরিতার রঙে শ্যামল ছায়া মাখান। প্রেমার

ফিগার নাচের জন্য পরিকল্পিত আর সরিতা সরল সবুজ একটা বৃক্ষের মত। নিপুণ ছন্দের লীলায় প্রেমা সাগরের মত উত্তাল আর সরিতা হাওয়ার বুকে দোল খাওয়া লতার মত ধরা অধরার খেলায় মাতোয়ারা। প্রেমা শিল্পী তার চলায় বলায় ভাবনায়। সরিতা খেয়ালী, তার স্বভাবের রোদ-বৃষ্টির লীলায়। একজন ঘূর্ণির মত তার আবর্তন বিন্দুর দিকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করে গুণমুগ্ধদের, অন্যজন ঝিরঝিরে এক পশলা বৃষ্টির মত পথচারীকে ভিজিয়ে দিয়েই খুশী।

এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে হৈ চৈ করতে করতে বেরিয়ে এলো একটা পাঠশালা থেকে। ছুটির খুশীতে তারা দিকহারা। পথের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া এক মুঠো সাদা মার্বেলের মত ছড়িয়ে পড়েছে ইতস্তত।

হর্ণ বাজিয়ে চলেছে সরিতা, আর ওরাও হর্ণের অনুকরণ করে চলেছে মুখে মুখে।

একটু একটু করে গাড়ী এগোচ্ছে আর ছেলেগুলো ড্রাম বাজাচ্ছে গাড়ীর গায়ে।

হুট করে সরিতা গাড়ীর বক্সটা খুলে বের করল একটা ছোট বল। লাল রঙের বলটা ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালে। তারপর ছুড়ে দিলে পথের ধারে নারকেল বাগানটা লক্ষ্য করে। আর যায় কোথা, বলটা ছুটে চলল লাফাতে লাফাতে আর তার পেছনে ছেলের পাল ছুটল সমান পাল্লা দিয়ে। পথ একদম পরিষ্কার। অমনি হুস করে বেরিয়ে গেল সরিতার গাড়ী।

ভাবনার ভেতর ডুবে আছে সরিতা। চিন্তার সুতোটা হঠাৎ কেটে গিয়েছিল, তাকে আবার জোড়া দিয়ে নিয়েছে সে।

ইন্দ্র বলল, কি ভাবছেন?

সরিতা একটুখানি চমকে উঠে বলল, ব্যক্তিগত ভাবনার কথা প্রকাশ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

অমনি ইন্দ্র পকেট থেকে পয়সা বের করতে যাচ্ছে দেখে সরিতা গাড়ী থামিয়ে দুটো হাত জোড় করে বলল, দোহাই আপনার, মনের কথা টেনে বার করতে আর টস করবেন না।

ইন্দ্র বলল, আমরা টসের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি হারলে, আপনাকে আর মনের কথা বলতে হবে না। বেকসুর খালাস।

সরিতা বলল, কিন্তু আপনি যদি জেতেন, তাহলে তো গেছি। মরে গেলেও বলতে পারব না।

ইন্দ্র বলল, বেশ, তাহলে ভেঙে যাক্ আমাদের প্রতিশ্রুতি।

সরিতা গাড়ী থামিয়ে ফেলেছে। শেষ সূর্যের আলোটুকুর মত করুণ করুণ মুখ করে বলল, আচ্ছা করুন তাহলে লটারী।

পয়সাটা ইন্দ্রের আঙুলের টুসকীতে সার্কাসের ঝকমকে কিশোরী মেয়ের মত ভল্ট খেতে খেতে ওপরে উঠে গিয়ে আবার নেমে এল ওর হাতের পাতায়।

মুহূর্তে অন্য হাতে পয়সাটা চেপে ধরে ইন্দ্র বলল, হেড না টেল।

ভীতু ভীতু গলায় সরিতা বলল, টেল।

ইন্দ্র হাত সামনে এনে বলল, হেরেছেন। সব বারে কি আর জেতা যায়।

গাড়ীটা স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে চালাতে লাগল সরিতা। ইন্দ্র তাকে কোন প্রশ্নই আর করল না।

বেশ কিছু পথ গাড়ীটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে এক সময় সরিতা বলল, কই জিজ্ঞেস করলেন নাতো কি ভাবছিলাম আমি? জিতেছেন যখন, তখন বলতে আমি বাধ্য।

ইন্দ্র বলল, আমার জানা হয়ে গেছে।

সরিতা অবাক হয়ে বলল, আপনার জানা হয়ে গেছে কি রকম?

ইন্দ্র বলল, আপনার ভাবনাগুলো যে পথের ইট পাটকেল কিংবা হোটেলের সুগদনকে নিয়ে নয় তা হলপ করে বলতে পারি।

সরিতা স্পষ্ট করে বলল, আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।

আমি জানি।

সরিতার গাড়ীর স্পীড কমল। চোখ দুটো একবার ইন্দ্রের মুখের ওপর ফেলে বলল, এত অহংকার।

ইন্দ্র বলল, একটি যুবকের কাছে বসে যদি একটি মেয়ে বলে, আমি আমার পোষা বেড়ালটাব কথা ভাবছিলাম, তাহলে ছেলেটির সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়াই উচিত নয় কি। হয় ইন্দ্র রায়ের কথা আপনি ভাবছিলেন, নয় ইন্দ্র রায় আপনার পাশে এই মুহূর্ত থেকে তার বসার অধিকার হারাল।

সরিতা বলল, বাবা আপনার বিশ্লেষণকে বলিহারি। হার মানলাম আপনার কাছে।

ইন্দ্র বলল, উঁহু শুধু শুধু হার মানলেই পার পাওয়া যাবে না, বলতে হবে কি ভাবছিলেন?

সরিতা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে ইন্দ্রের দিকে এক ঝলক চেয়ে নিয়ে বলল, ভাবছিলাম, আপনি একটা বিচ্ছিরি ছেলে।

বলেই সিকসটি মাইল স্পীডে গাড়ীর কাঁটা তুলে সিধে রাস্তায় ঝড়ো হাওয়ার মত উড়ে চলল।

ওরা পাশাপাশি বসেছিল থঙ্গচেরি লাইট হাউসের কাছে। একশো চুয়াল্লিশ ফিট উঁচু লাইট হাউসের মাথায় পাঁচ হাজার ওয়াটের বাল্ব থেকে আলো ছুটে চলেছে। আরব সাগরের বুকের জলযানগুলো আঠারো মাইল দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে ঐ একচক্ষু পলিফেমাসকে। অবশ্য ওডেসীর দৈত্যাকৃতি পলিফেমাস ছিল ক্রুর সংহারক, আর থঙ্গচেরির বাতিঘর ইউলিসিসদের অভয়দাতা।

সমুদ্রের ঢেউ সন্ধ্যার অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছিল।

সরিতা বলল, আপনি গাড়ী খারাপ হয়ে যাবার দিন রাতে যে ভুতের গল্পটা বলেছিলেন, তার শেষটুকু আর বলেননি।

ইন্দ্র বলল, কি রকম! আমার গল্পের তো ঐখানেই শেষ।

সরিতা বলল, আপনি তো দেখছি ভীষণ নিষ্ঠুর। দুটি ছেলেমেয়েকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন।

ইন্দ্র হেসে বলল, ওরা এখনও আরব সাগরের জলে সাঁতার কাটছে, কূলে উঠতে পারেনি।

সরিতা সন্দেহের চোখে তাকাল ইন্দ্রের দিকে। ইন্দ্রের মুখে দুষ্টুমির হাসি।

সরিতা ইন্দ্রের থাইয়ের ওপর একটা চাপড় মেরে বলল, আপনি ভীষণ বানিয়ে গল্প বলতে পারেন, আপনাকে একটুও বিশ্বাস নেই।

ইন্দ্র বলল, আস্থা রাখতে হয়, তাতে কর্মীদের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় বেশী। মালিকপক্ষ সন্দেহবাতিক হলেই মুশকিল।

সরিতা বলল, গল্পের শেষটা না বললেও আমার জানা।

ইন্দ্রের গলায় কৌতূহল, কিরকম বলুন তো? আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখি।

আমি যদ্দুর জানি ওরা ঢেউয়ের ওপর ভাসতে ভাসতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দুজনের কারোরই আর ক্ষমতা ছিল না সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার।

হঠাৎ ওরা দেখতে পেল একটা জেলে নৌকা ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা প্রাণপণে নিজেদের ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করল জলের ওপর।

সরিতা একটু থেমে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, মিলেছে আপনার গল্পের সঙ্গে ?

ইন্দ্র হেসে বলল, মিল আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

সরিতা বলল, এবার তাহলে আপনি বলুন, আমি মিলিয়ে দেখি।

ইন্দ্র বলল, পালতোলা জেলে নৌকোটা এগিয়ে এল। তারা ওদের নৌকোয় তুলতে গিয়ে দেখল, একজনের বেশী হলে নৌকোটা ডুবে যাবে নির্ঘাৎ। তাই জেলেরা চেঁচিয়ে বলল, তোমাদের ভেতর শুধু একজনই আসতে পার। বল কে আসতে চাও ?

ইন্দ্র সরিতার দিকে ফিরে বলল, বলুন তো এবার, দুজনের ভেতর কে নৌকোয় উঠেছিল ?

সরিতা বলল, আমি যদ্দূর জানি মেয়েটি ছেলেটিকে অনেক করে বোঝাল। বেঁচে থেকে তার কোন লাভ নেই। কারণ সমাজের সীমানা পেরিয়ে একবার চলে এলে মেয়েদের সমাজ কোনদিনই আর ফিরিয়ে নেবে না। কিন্তু সেদিক থেকে ছেলেদের কোন অসুবিধা নেই। তাদের সানন্দে সমাজ ঘরে তুলে নেবে, তারা সুখী সংসার রচনা করতে পারবে। তাই মিথ্যে ভাবালুতার ভেতর দুজনে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে না গিয়ে একজনেরও অন্তত বাঁচতে হবে। আর তাছাড়া ছেলেটি বেঁচে থেকে চিরদিনই তাকে মনে করে রাখুক, এ ইচ্ছাটুকু জানাল মেয়েটি। তখন মেয়েটির অনুরোধে ক্লান্ত ছেলেটিকে ঢেউএর ওপর থেকে তুলে নিল জেলেরা। এখানেই আমার জানা গল্পের শেষ।

ইন্দ্র বলল, না আমার গল্পের শেষ এখানে নয়।

সরিতা বলল, কি রকম ?

ইন্দ্র বলল, আমার জানা গল্পের শেষ হয়েছে একটা ঝড়ের ভেতর।

সরিতা বলল, ঝড়!

ইন্দ্র বলল, সারা আরব সাগর জুড়ে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। মনে হল ঘূর্ণিপাকে সপ্ত সাগরই ঘুরছে। নৌকোটা কলার মোচার মত চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে ক্রমাগত ঘূর্ণির কেন্দ্রের দিকে নেমে চলল।

এদিকে মেয়েটি কিন্তু ঘূর্ণির বাইরে থেকে গেল, আর একটা প্রচণ্ড হাওয়া তীরমুখী স্রোতের ওপর দিয়ে ওকে ঠেলতে ঠেলতে এনে ফেলল একেবারে কেরালার কূলে। থঙ্গচেরি লাইট হাউসের পাশে সমুদ্রের বেলাভূমিতে ও যেন বালির বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল।

সরিতা উৎসুক গলায় বলল, আর ছেলেটির কি হল ?

ইন্দ্র বলল, সে স্বার্থপর ছেলেটা মেয়েটিকে একা জলে ফেলে নৌকোতে উঠে

এসেছিল, তাই শাস্তিটাও তাকে পেতে হল চরম। তার নৌকো ঘূর্ণির পাকে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

একটু থেমে ধীর গলায় ইন্দ্র বলল, এখন কেউ যদি সেই জলের তলায় গিয়ে নামে তাহলে দেখতে পাবে ছেলেটি ভাঙা নৌকোখানার ওপরে দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে শুয়ে আছে। সমুদ্র শৈবালের দল মরদেহের পুষ্পসজ্জার মত জেগে রয়েছে তার চারিদিকে। আর একটি রূপোলী মাছ হাল্কা তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে ছেলেটির ভাসমান চুল ছুঁয়ে তার ঘুমন্ত মুখখানাতে চুমু দিয়ে যাচ্ছে।

সরিতা বলল, আপনি কিচ্ছু জানেন না। সে মেয়েটি কূলে আছড়ে পড়া-মাত্রেই তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে একটি রূপোলী মাছ হয়ে খুঁজতে গিয়েছিল সেই ছেলেটিকে সমুদ্রের তলায়।

ইন্দ্র বলল, তাহলে বলতে হয় মেয়েটি সত্যই ছেলেটিকে ভালবেসেছিল।

সরিতা জোরের সঙ্গে বলল, বেসেছিলই তো।

সময়ের হিসেব ছিল না ওদের। সমুদ্র সারাক্ষণ শব্দ করছিল। বাতিঘরের ছড়িয়ে পড়া অতি উজ্জ্বল হলুদ আলোটাকে অলৌকিক একটা কিছু বলে মনে হচ্ছিল। আরব্য রজনীর কোন কাহিনী শোনাবার জন্যে শাহরাজাদী যেন প্রস্তুত হচ্ছিল। বাদশা শাহরিয়ার গল্পের যাদুকরী শাহরাজাদীর দিকে চেয়েছিল গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে।

সরিতা বলল, আমি একেবারে বানিয়ে কিছু বলতে পারিনে আপনার মত।

ইন্দ্র বলল, আমি বুঝি খুব বানিয়ে কথা বলি?

বলেনই তো।

আর বলব না।

অমনি রাগ হয়ে গেল মশাই এর। প্রশংসা করলেও বিপদ! গল্প যিনি বলতে পারেন তাঁকে তো সকলেই তোয়াজ করে জানি।

ইন্দ্র বলল, আমার গল্প শুনতে সত্যি আপনার ভাল লাগে?

প্রশংসা কবার শুনতে চান?

ইন্দ্র বলল, বিশেষ বিশেষ মুখে বারবার।

সরিতা বলল, আপনি তো দারুণ লোভী দেখছি। বিশেষ একটি মুখের প্রশংসাতে সন্তুষ্ট নন। বিশেষ বিশেষ মুখের প্রশংসা চাই।

ইন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দেখে সরিতা বলল, কি হল চুপচাপ যে?

ইন্দ্র চোখ তুলে বলল, বোবার শত্রু নেই তাই মৌনী অভ্যেস করছিলাম।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঝটপট উঠে দাঁড়াল সরিতা। ইন্দ্রের হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে বলল, ওঠ ওঠ, অনেক রাত হয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ হাতটা ছেড়ে দিয়ে তুহাতে নিজের তুটো গাল চেপে ধরে বলল, ইস ভারী একটা অন্যায় হয়ে গেল।

কি হল ?

আপনাকে 'ওঠ ওঠ' বলে ফেললাম।

ইন্দ্র বলল, বেশ করেছেন, আরও একশোবার বলবেন।

সরিতা বলল, বিশ্বাস করুন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মন থেকে বেরোয়নি তাহলে ?

সরিতা চুপ করে রইল।

ইন্দ্র আবার বলল, আপনি কি কথাটা বলে ফেলে নিজেকে খুব অপরাধী ভাবছেন ?

সরিতা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আমি কি বলতে চাই, কি করতে চাই তা নিজেও অনেক সময় বুঝতে পারি না। আমার এইসব টুকরো টুকরো ভুলভ্রান্তি হয়ত আরও কত ঘটবে তাই আগে থেকে মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

ইন্দ্র বলল, তুমি এমন সিরিয়াস হয়ে উঠলে কেন সরিতা ? এই তো আমি তোমার ভাষাতেই কথা বলছি।

সরিতা এখন নিজের স্বভাব ফিরে পেয়েছে। সে কলকল করে বলে উঠল, আমরা 'তুমি' বলব কি 'আপনি' বলব সেটা টস্ করে ফয়সালা করে নিলে হয় না।

ইন্দ্র বলল, পছন্দটা তোমার কোনটাতে বল তো সত্যি করে ?

সরিতা সে কথার উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে বলল, থাক টস্ যদি আবার আপনি টাপনি উঠে যায় তাহলে তো গেছি।

ইন্দ্র বলল, টসের কথা যখন উঠেছে তখন টস্ হবেই। তাতে কপালে যা ওঠে উঠুক।

সরিতা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ও মনে হল রেজাল্টের কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেছে।

ইন্দ্র পয়সাটা বের করে বলল, হেড উই গেইন টেল উই লুজ, কি বল ?

বলেই ও পয়সাটা ওপরে ছুঁড়ল। বালিতে পড়তে না পড়তেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সরিতা।

হাত দিয়ে পয়সাটা চেপে রেখে ইন্দ্রের দিকে মুখ তুলে করুণ গলায় বলল, ভীষণ ভয় করছে, যদি টেল পড়ে যায়।

ইন্দ্র হেসে ওর হাতের ওপর হাত রেখে বলল, এসো তাহলে দুজনে মিলে একটু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা যাক।

সরিতা তবুও করুণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ওর দিকে চেয়ে বলল, বিশ্বাস কর, একটুও সাহস পাচ্ছি না।

ইন্দ্র বলল, যা থাকে ভাগ্যে, তাবলে কথার খেলাপ তো আমরা করতে পারব না।

সরিতার হাত শিথিল হয়ে ধীরে ধীরে সরে গেল। ও বলল, আমি দেখব না, আপনি দেখুন।

ইন্দ্র দেখে নিয়ে পকেটে পয়সাটা ফেলল।

সরিতা ইন্দ্রকে নির্বাক দেখে চমকে উঠে বলল, কি হল ?

ইন্দ্র নিরাসক্ত গলায় বলল, আমাদের সম্মানীয় সম্বোধনে ফিরে যেতে হবে।

সরিতা গালের পাশ দিয়ে চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে মুখখানা বিপুল বেগে নাড়তে নাড়তে বলল, সব দোষ আমার। এটা ঘটল আমারই দোষে।

ইন্দ্র বলল, অত ভাবনার কি আছে, আপনিটা আমাদের বাইরের পোষাক হয়েই থাক না।

সরিতা কিছুক্ষণ পরেই শান্ত হয়ে গেল। ওর ভেতর মেঘ রোদ্দুরের খেলাটা খুব দ্রুত চলতে থাকে। তাই কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

ও বলল, ভালই হল। কখন আবার প্রেমার কাছে আপনাকে তুমি বলে ডেকে বসতাম।

ইন্দ্র অমনি বলল, দেখলেন তো ভগবান যা করেন মঙ্গলেরই জন্যে।

ইন্দ্র গাড়ী চালাবার কথা পাড়তেই সরিতা বলল, আপত্তি কিছু নেই, তবে রাতে অচেনা পথে ড্রাইভ করতে গেলেই অসুবিধেয় পড়তে হবে। তার চেয়ে আমি যেমন হাল ধরেছিলাম তেমনি ধরে থাকি আজ রাত্তিরটা। ফেরার পথে আপনিই না নয় কাণ্ডারী হবেন।

ইন্দ্র বলল, তথাস্তু। কিন্তু সারারাত ধরেই কি গাড়ী চালাবেন নাকি ?

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সরিতা বলল, ক্ষতি কি। আপনার বুঝি খুব ঘুম পেয়ে যাবে ?

ইন্দ্র বলল, আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু পথে চালাতে গিয়ে আপনারই স্টেইন হবে বেশী। ঘুম পেলে আপনারই পাবে, আমি তো আরামে পাশে বসে অন্ধকারের রূপ দেখতে দেখতে চলব।

সরিতা বাঁকের মুখে গাড়ীখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, চুপচাপ বসে থেকে ঝিরঝিরে হাওয়ায় গা জুড়োবেন, তারপর রাতের আকাশে তারা দেখবেন, এরপর স্বপ্নের পরীরা আপনাকে ছেড়ে দেবে ভাবছেন ?

ইন্দ্র বলল, তাহলে গাড়ী চালাতে চালাতে আর একটি কাজ করতে হবে আপনাকে।

কি কাজ ?

গান। গান গেয়ে পাশের মানুষটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

সরিতা বলল, আপনার বাদশাব নাতি হয়ে জন্মান উচিত ছিল। পাশে সারাক্ষণ থাকত ইয়ার দোস্তের দল। সরাব খেয়ে ঝিমুনি এলেই ঝমঝম বেজে উঠত ঝুমুর। হারেমের নর্তকীরা নাচ দেখিয়ে কেড়ে নিত চোখের ঘুম। আঁখির ইসারায় ঝড় তুলত বুকে।

হঠাৎ একটুখানি থেমে একেবারে ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে চলে গেল সরিতা, আচ্ছা কেমন লাগল সেদিন প্রেমাব নাচ ?

বুকে ঝড় তোলার মত।

সরিতা অমনি বলল, তার মানে আপনি বলতে চান প্রেমা হারেমেব নটী।

ইন্দ্র বলল, আমি কি দশানন যে ঘাড়ের ওপর বসানো দশ-দশটা মাথাব নটা খসালেও একটা অন্তত আস্ত থাকবে।

সরিতা এবার টেনে টেনে বলতে লাগল, বলুন না সত্যি করে, সেদিন কেমন লাগল প্রেমাকে ?

ইন্দ্র বলল, প্রেমাকে না তার নাচকে ?

সরিতা গম্ভীর হয়ে গেল। গাড়ী চালাতে চালাতে আর কথা বলল না।

ইন্দ্র সরিতার দিকে চেয়ে চেয়ে দারুণ মজা পাচ্ছিল।

সে আবার রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল, সত্যি সরিতা, সেদিন প্রেমার নাচ দেখে সারা পদ্মনাভপুরম্ প্যালেসের এমন দর্শক ছিল না, যে না প্রেমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

সরিতা চেঁচিয়ে উঠল, তুমিও!

পরক্ষণেই বলল, সরি, একসট্রিমলি সরি, আপনিও ?

ইন্দ্র বলল, ক্ষেপেছেন, মালিকের সঙ্গে প্রেম! তাহলে প্রেম আর চাকরী দুটোই খোয়াতে হবে।

সরিতা সামনের আলো ঝলমল পথের দিকে চেয়ে গাড়ী চালাতে চালাতে বলল, আপনি তো চাকরীর ভারী পরোয়া করেন।

ইন্দ্র করুণ গলা করে বলল, বিশ্বাস করুন, চাকরী হারালে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। ঐ দুর্বল জায়গাটায় দয়া করে আঘাত করবেন না।

কিছু পথ ড্রাইভ করে এসে সরিতা গাড়ী থামাল এক আলো ঝলমল বাড়ীর সামনে।

ইন্দ্র বলল, এ কোথায় এলাম?

সরিতা বলল, এ. বি. সি. তে।

ইন্দ্র অবাক হয়ে বলল, হেঁয়ালিটা তো বুঝতে পারছি না।

সরিতা বলল, জলের মত তরল। অষ্টমুদী বোট ক্লাব। সংক্ষেপে সবাই একে এ. বি. সি. বলে থাকে।

ওরা নামল গাড়ী থেকে। ভেতরে গিয়ে সরিতা একটা স্পেশাল ব্যবস্থা করে নিল। বোট ক্লাব থেকে ভাড়া করল একখানা বোট। সন্ধ্যায় কিছু সময় ওরা ঘুরে বেড়াবে অষ্টমুদী লেকের জলে।

ক্লাব সেক্রেটারী বললেন, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠে গেছে। তবে এখনও নারকেল গাছের জটলার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। তারপর চাঁদের আলোয় বোটে বেড়াতে ভালই লাগবে।

সেক্রেটারীর পরামর্শমত ওরা এই সামান্য সময়টুকু ক্লাবের ভেতর টেবল টেনিস বোর্ডেই কাটিয়ে দিতে মনস্থ করল।

ইন্দ্র বলল, কবে কলেজের বোর্ডে খেলেছি, তারপর এই ব্যাট ধরছি। আপনার হাতে হার আমার নিশ্চিত।

সরিতা বলল, আপনার মত বিনয় আমি করব না। রোজ কলেজের বোর্ডে একবার করে আমি আর মীনাক্ষী প্রাকটিস করি। তবে প্রতিপক্ষের হাতের মার না দেখলে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে কিছু আঁচ করা যাবে না।

খেলা শুরু হয়ে গেল। সরিতা সার্ভিস পেল। তিন তিনটে সার্ভিসে ইন্দ্র প্রায় ব্যাট ছোঁয়াতেই পারল না। দারুণ স্পিন সরিতার সার্ভিসে। চতুর্থ সার্ভিসের পর থেকেই খেলার মোড় ফিরল। স্ম্যাশ আর স্পেসিং-এর কৌশলে ইন্দ্র পয়েন্ট ছিনিয়ে নিতে লাগল।

জমে উঠল খেলা। ইন্দ্র ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। সরিতার

হাতে স্পিন আছে, স্ম্যাশও আছে। সবচেয়ে দরকারী যা আছে তা হল ওর বিদ্যুৎ গতিতে সঞ্চরণের ক্ষমতা।

অনেকগুলো দর্শনীয় র‍্যালি করল ওরা। কয়েকজন ক্লাব মেম্বার ওদের খেলা দেখতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়ল সরিতার দিকে। ও পয়েন্ট পেলে উল্লাসে ফেটে পড়তে লাগল তারা, আবার পয়েন্ট হারালে ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে জিভ দিয়ে হাওয়া বের করে একটা দুঃখের শব্দ তুলতে লাগল। কিন্তু গেম দুই আর এ কে ছিনিয়ে নিল ইন্দ্র।

সরিতা খেলার শেষে প্রতিপক্ষের হ্যাণ্ডশেক করতে এসে ইন্দ্রর দিকে চেয়ে কেমন এক ধরণের উত্তেজনা বোধ করতে লাগল। ইন্দ্রকে তার এই মুহূর্তে কেন জানি না অনেক বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে হল।

ইন্দ্র উজ্জ্বল আলোয় দেখল, সরিতার সারা মুখ ঘামের জলে নেয়ে আশ্চর্য মসৃণ আর লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে। মুখে পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই, বরং একটা পরিতৃপ্ত সারা চোখেমুখে খেলা করছে।

ক্লাব সেক্রেটারী মনে করিয়ে দিলেন চাঁদ এখন নারকেল গাছের মাথা ছাড়িয়ে বেশ খানিক ওপরে উঠে গেছে।

ইন্দ্র আর সরিতা জেটি থেকে একটা বোটে উঠে বসল। চালক বোট চালিয়ে নিয়ে চলল অষ্টমুদী লেকের তীর ঘেঁষে। চাঁদের আলো জলের বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলোর গায়ে রুপোলী পালিশ লাগাচ্ছিল। নৌকোর তলায় জলের ধাক্কায় একটা সুখকর শব্দ উঠছিল। গান গাইছিল সরিতা। ইন্দ্র ওর উচ্চগ্রামী গলার কাজ দেখে মনে মনে তারিফ করছিল। সম্ভবতঃ লোক-সঙ্গীত, হয়ত বা কোন সিনেমার গান। যা হোক, এই পরিবেশে গানের সুরে একটা যাদুর খেলা চলছিল।

গান থামলে ইন্দ্র বলল, হোটেলের কোন ঘরে বসে গানটা গাইলে আপনি দারুণ প্রশংসা পেতেন।

সরিতা অবাক হয়ে বলল, তার মানে এই পরিবেশে গানটা আপনার ভাল লাগেনি।

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল. ঠিক তার উল্টো। বরং এই পরিবেশে এত ভাল লেগেছে যে প্রশংসার ভাষা এখানে অচল। শুধু কান পেতে শোনা আর হৃদয় ভরে অনুভব করা।

সরিতা বলল, সুরটা কার দেওয়া বলুন তো ?

ইন্দ্র বলল, মালয়ালম কোন লোকসংগীত বলে মনে হয়। আমি তো মালয়ালী সুরকারদের চিনি না।

সরিতা বলল, এইখানেই জিতে গেলেন সুরকার। আসলে এ গানের সুর যিনি দিয়েছেন তিনি কেরালার লোকই নন।

ইন্দ্র বলল, কি রকম?

সরিতা বলল, অনুমান করুন।

তাহলে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে হবে, বলল ইন্দ্র।

সরিতা বলল, অনুমান করুন। আপনার দেশের মানুষ।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রের, সলিল চৌধুরী?

সরিতা বলল, তবু শেষরক্ষাটা করলেন। সলিল চৌধুরীর সুর কেরালার মানুষদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ইন্দ্র বলল, ওঁর সুর কানের ভেতর দিয়ে একেবারে বুকে এসে বাজে। জল, মাটি, আকাশ আর আলোর সঙ্গে ওঁর সুরের আশ্চর্য মিতালী।

আর দুখানা গান গাইল সরিতা। দক্ষিণী সুরের অদ্ভুত গলার কাজ। মনে হচ্ছিল লেকের জলে বৃষ্টির ছোট বড় ফোঁটা দ্রুত জলতরংগ বাজিয়ে চলেছে।

জ্যোৎস্নার ঝরে পড়া রূপালী পরাগে লেকের জল রহস্যময়। নারকেলের পাতায় আলো পড়ে ঝকঝকে তলোয়ারের মত মনে হচ্ছিল। যেখানে বন নিবিড় সেখানে অন্ধকার জমে আছে।

হঠাৎ ইন্দ্রের চোখে পড়ল অন্ধকার বনের ঘন পল্লবের ভেতর থেকে আলোর ফুলকি উড়িয়ে বেরিয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে পুতুরী। এমন সহস্র সহস্র জোনাকীর নাচ এর আগে কখনও দেখেনি ইন্দ্র। জ্যোৎস্নার আলোয় বেরিয়ে এসেই ওরা কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

আটটি বাঁক নিয়েছে তাই নাম তার অষ্টমুদী। কুইলন জেলার বিখ্যাত কায়েল এটি। নদীরা জন্ম নিচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়। ভুজঙ্গ ভঙ্গিমায় নেমে আসছে পাহাড়ী পথে সমভূমির ওপর। পশ্চিমঘাট থেকে আরব সাগরের দূরত্ব বা কতটুকু। তারই ভেতর নদীরা সৃষ্টি করেছে স্বাভাবিক জলাধার। নীলে রূপায় মেশান জল ঝলমল করছে। নদী, ক্যানেল, লেগুন, ব্যাকওয়াটারে দেশটা যেন রূপালী জালে ঢাকা। ত্রিবান্দ্রম থেকে তিরুর অব্দি প্রায় সারা দুশো মাইল পথ এই ব্যাকওয়াটারে যাওয়া যায়। সবুজ ক্ষেত, ছায়াঘন নারিকেল বীথি, লাল টালির ছাওয়া কোন উঁচু ঘর, হঠাৎ জেগে ওঠা গীর্জার মাথা দেখতে দেখতে সূর্য আর চন্দ্রের উদয় অস্তকাল যে কোথা দিয়ে কেটে যায়

তার ঠিক নেই। ব্যাকওয়াটার আর নীল আরব সাগরের মাঝে ছোট পরিসরের যে জমিটুকু বরাবর উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে তার বুকে জেগে আছে অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ। চোখ জুড়িয়ে যাবে, যদি কেউ এই সবুজ সমারোহের ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন একটি চুরুলন ভাল্লমে চেপে ব্যাকওয়াটারের জল কেটে কেটে বেড়িয়ে বেড়ায়। এখানকার জ্যোৎস্নায় আরব্য রজনীর রহস্য-পরাগ ওড়ে! এখানকার বাতাসে দারুচিনি বনের গন্ধ ভেসে আসে। এখানকার তেরামালা পাখির উড়ে চলায় সারা আরব সাগরের উচ্ছ্বাস।

কথাগুলো বলছিল সরিতা। ইন্দ্র শুনছিল ভাল্লমে বসে। অষ্টমুদী লেকের জল, তীরের আলো আঁধারি বনভূমি, পুতরীদের উড়ে চলা, রূপালী জলপ্রবাহের মত জ্যোৎস্নার ঝরে পড়া, ভাল্লমের তলায় নিরন্তর ছলছলানি গান, তরুণ-তরুণীর মুখোমুখি বসে থাকা, সব মিলিয়ে এই মুহূর্তগুলোকে অনন্ত কোন কাল প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ধারা বলে মনে হয়। খণ্ডকালের পাত্র উপচে যেন গড়িয়ে পড়ছে নিত্যকালের সুধা।

ইন্দ্র বলল, আমরা কোন একদিন বেরিয়ে পড়ব একখানা ভালাপ্পরায় চেপে এই আশ্চর্য দেশটাকে আবিষ্কার করতে। রোদ্দুরে পুড়ব, জ্যোৎস্নায় ভিজব, কায়েলের জলে পানকৌড়ির মত ডুব দিয়ে উঠব। নিভৃত নারিকেল বনের আলোছায়ার তলায় পা ছড়িয়ে বসে অনেক অনেক পুরোনো বিস্মৃত দিনের গল্প বলে যাব।

সরিতা বলল, আপনার এ চাকরী নেওয়া ঠিক হয়নি, আপনি দারুণ রকম রোম্যান্টিক। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেই আপনাকে মানাত ভাল।

ইন্দ্র হাত পেতে বলল, রসদ দিন ম্যাডাম, আমি এখনি চাকরী ছেড়ে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি।

সরিতা হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। দুটো হাত পেছনের চুলের ভেতর চালিয়ে গলায় বাঁধা স্বর্ণসূত্রটা খুলে ফেলল। তারপর বুকের অম্বরের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল লকেট সমেত হারটা। চাঁদের আলোতেও দামী হীরেগুলো ঝলমল করছিল।

বলল, আপনার হাতখানা দিন তো দেখি।

ইন্দ্র বলল, কেন?

সরিতা বলল, এত প্রশ্ন করছেন কেন, দিন না। ভয় নেই, চিরদিন ধরে রাখব না।

ইন্দ্র বলল, আমি তাই বলেছি বুঝি।

ইন্দ্র হাতখানা সরিতার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সরিতা ইন্দ্রের মণিবন্ধে তার হারখানা জড়িয়ে বেঁধে দিতে দিতে বলল, আমি যে দিতে পারি, এই সামান্য হারটুকুতেই তার সূচনা হোক।

ইন্দ্র হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হারটা হাত থেকে খুলে ফেলে বলল, কি পাগলামো করছেন। এই দামী হার নিয়ে আমি করব কি?

সরিতা বলল, নিশ্চয়ই পরার জন্যে দিইনি। বিক্রি করে যে টাকা পাবেন তাতে কাছে পিঠে কোন জায়গায় যাবার টিকিটের দামটা হয়ত মিলে যেতে পারে।

ইন্দ্র বলল, পায়ে চষে বেড়াব, চাই কি রবিনসন ক্রুশোর মত কাঠ জুড়ে ভেলা বানিয়ে ভাসব তবু আপনার ঐ সুন্দর গলা থেকে হারখানাকে ছিনিয়ে নেব না।

সরিতা হাত বাড়িয়ে বলল, দিন, ফিরিয়ে দিন আমার হার। ভুল করেই আপনাকে দিয়েছিলাম।

ইন্দ্র বলল, আপনি নিশ্চয় ফিরিয়ে নেবার জন্যে দেননি। একেবারে দান করেই দিয়েছেন।

সরিতা চুপচাপ বসে রইল ইন্দ্রের দিকে চেয়ে। যে পাঙ্কায়াম ভাল্লমটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে বলল, এখানে বসার একটা ভাল জায়গা আছে। আপনারা ইচ্ছে করলে ডাঙায় উঠে বসতে পারেন।

ইন্দ্রের মনে হল লোকটি রসিক। একটুখানি নিভৃতে কথা বলার সুযোগ করে দিতে চায়।

ইন্দ্র অমনি বলল, সিগারেট পাওয়া যাবে কাছেপিঠে কোথাও?

লোকটা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, মিনিট পনের বসুন ওখানে। আমি ভাল্লম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কিছু দূরেই দোকান আছে, এনে দিচ্ছি।

ওরা উঠে বসল, নারকেল গাছের তলায় একটা সুন্দর বাঁধান সিমেন্টের বেদীর ওপর। লোকটি তিরতির করে ভাল্লমটা বেয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

পাশাপাশি বসেছিল ওরা। ভাল্লমের জল কেটে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধবধবে জ্যোৎস্না ইতস্তত ছড়ান অভ্রের কুচির মত ঝিলমিল করে উঠল।

ইন্দ্র বলল, এই মুহূর্তে কাউকে কিছু একটা দিতে ইচ্ছে করছে।

সরিতা ইন্দ্রের দিকে চেয়ে হাসল।

ইন্দ্র বলল, আপনাকে প্রিয়জন বলে ভাবতে পারি, এ স্পর্ধাটুকু কি আপনি সহ্য করবেন?

সরিতা মিষ্টি হেসে বলল, এতদিন তাহলে আপনি কি আমাকে অপ্রিয় বলে ভেবে এসেছেন ?

ইন্দ্র বলল, পদ্মনাভপুরম্ প্যালেস থেকে নাচ দেখে ফেরার দিন বিকল গাড়ীর ভেতর বসে অন্ধকারের বোরখা ঢাকা একখানা মুখকে আমার বুকের ভেতর ধরে রেখেছিলাম—এ ঘটনাকে আমার আজও দারুণ রকম অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

সরিতা ইন্দ্রের একখানা হাত তুলে নিয়ে তার সারা মুখে ছুঁইয়ে আবার কোলের ওপর রেখে দিয়ে বলল, আমাকে স্পর্শ করেও কি আপনার বিশ্বাসটুকু ফিরে আসছে না ?

ইন্দ্র বলল, সরিতা লোভ দেখাবেন না, আমি তো মানুষ, হয়তো আপনার সম্মান রাখতে পারব না। চপলতা ঘটে যেতে কতক্ষণ! তখন বিবেকটাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অবাধ্য আবেগের স্রোত।

সরিতা বলল, চারদিকে লক্ষ্য নজর রেখে ভেবে চিন্তে কেউ কোনদিন কাউকে ভালবেসেছে, এমন নজির একটা দেখাতে পারেন ?

ইন্দ্র বলল, এতদিনে আশ্বস্ত হলাম। আমার পাশে বসে যে মেয়েটি তার কোলের ওপর আমার হাতখানাকে তুলে নিয়েছে, সে একেবারে চন্দ্র সূর্যের মতই সত্যি। আর সে আমার মত একটি অতি সাধারণ ছেলেকে ভালবাসে।

সরিতা তার কোলের ওপর রাখা ইন্দ্রের হাতটা নিজের দু' হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, বাসেই তো। অসাধারণ কিছু সে নিজেও নয় তাই অসাধারণ কাউকে ভালবাসার ইচ্ছেও তার নেই।

ইন্দ্র বলল, আমার হাতে তোমার গলার মালা। এ মালায় তোমার অযাচিত দানের স্পর্শ মাখান। দরিদ্র আমি; তাই সেই মালাটাই তোমাকে পরিয়ে দিয়ে আজ প্রিয়জনকে কিছু দেবার আনন্দটুকু পেতে চাই।

ইন্দ্র মালার দু'প্রান্ত ধরে যত্ন করে পরিয়ে দিল সরিতার গলায়।

চুপচাপ জলের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল সরিতা। পরে ইন্দ্রের হাতের পাতায় নিজের মুখখানাকে ঢেকে ফেলল।

ইন্দ্র বলল, আমি বুঝতে পারছি না সরিতা এই আশ্চর্য মুহূর্তটা আমাদের ভাগ্যে কি লেখা লিখে দিয়ে গেল। সে বিধাতা পুরুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দুঃখ সুখ দুটোই তাঁর হাতে; নিঃশব্দে এসে কখন কি তিনি দিয়ে যাবেন তা আমাদের অজানা। শুধু হাত পেতে নিতে হবে।

সরিতা ইন্দ্রের হাতখানা কোলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, তাই মেনে

নেব। সুখ আমরা নিশ্চয় চাইব, কিন্তু দুঃখকে দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব না।

ইন্দ্র বলল, তোমাকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে সরিতা।

সরিতা বলল, উঁহু আগে ভুলটা শুধরে নিন, তারপর প্রশ্রয় দেবার কথা ভাবা যাবে।

ইন্দ্র পকেট থেকে লটারীর সেই দশ পয়সাটা বের করে কায়েলের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আমাদের সেই লটারীর ভূতটা এতক্ষণে অগাধ জলের তলায় ডুবে মরেছে। আর আমরা তাকে কোন মতেই বাঁচিয়ে তুলব না।

কথা শেষ করেই বুকের কাছে সরিতার মাথাটাকে টেনে এনে ইন্দ্র বলল, কখনো কি কোন প্রেমিক প্রেমিকাকে কেউ বলতে শুনেছে, আপনাকে একটু আদর কবতে ইচ্ছে করছে আমার।

বলেই ইন্দ্র নিজের মুখখানাকে সরিতার মুখের কাছে নামিয়ে আনল।

সরিতা বাঁ হাতের তিনটে আঙুলে ইন্দ্রের নেমে আসা মুখের সামনে একটা দুর্বল প্রতিরোধের বেড়া গড়ে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু ভেঙে গেল সব প্রতিরোধ। ইন্দ্রের বলিষ্ঠ ঠোঁটের পেষণে সরিতার কাঁঠালী চাঁপার মত দুটি ঠোঁটে যন্ত্রণার একটা ঢেউ উঠল।

সরিতা নিজেকে যখন মুক্ত করে নিল ইন্দ্রের বুকের বাঁধন থেকে তখন দুজনেই লজ্জা পেল কায়েলের দিকে তাকিয়ে।

এলোমেলো পাথর ফেলা সিঁড়ির তলায় কখন নিঃশব্দে এসে ভিড়েছে ভাল্লমখানা। নৌকোর ওপর সিল্যুয়েট ছবির মত দাঁড়িয়ে পাঙ্কায়ম। ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চাঁদ দেখছে।

সরিতা উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত ঘুরিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল। ইন্দ্র চুপি চুপি বলল, লোকটার কথা বেমালুম ভুলে বসেছিলাম।

সরিতার গলায় মৃদু তিরস্কার বেজে উঠল, ভুলে যাওয়াই তো তোমাদের স্বভাব।

ওদের গাড়ী যখন এসে পৌছল কারুনাগপল্লীতে তখন ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর ছুঁই ছুঁই। একটা পড়ো জমির আগাছা ভরা অস্পষ্ট পথের ওপর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে সরিতার গাড়ী এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কটা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়।

ইন্দ্র দেখল, সামনে একখানা পুরোনো দিনের ভগ্নপ্রায় পেল্লাই বাড়ী। পেছনে নারকেল বাগান। টগরফুলের মত জ্যোৎস্না ফুটে আছে চরাচরে।

গাড়ী থেকে নেমে পুরোনো পরিত্যক্ত প্রায় কেটেডমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সরিতা। পাশে এসে দাঁড়াল ইন্দ্র। সে শুধু সবিতার সঙ্গী। এই রহস্যপুরী সম্বন্ধে সে একেবারে অন'ভজ্ঞ।

সরিতা কোন কথা বলছে না, কোন রহস্যের আবরণ সরাচ্ছে না, কেবল এক একবার বাঁ হাতের ঘড়িখানা চোখের সামনে তুলে ধরে চাঁদের আলোয় সময় দেখছে।

একটা দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই এক বৃদ্ধের গলা বেজে উঠল।

'আহারম্ করিক্যাতবর উণ্ডাঙ্গিল ওয়ারিকা।'

তিনবার এমনি করে হাঁক দিল বৃদ্ধ।

'এমন কে আছ, যার আহার হয় নি এখনও, চলে এসো।'

বৃদ্ধের গলা থেমে গেলে সবিতা দ্রুত পা চালিয়ে ঐদিকে যেতে যেতে বলল, এসো।

ইন্দ্রও তাকে অনুসরণ করল।

বৃদ্ধ জীর্ণ বিরাট দরজাটা ভেজিয়ে দেবার জন্যে ভেতর থেকে উদ্যোগ করছিলেন, সরিতা তাঁর সামনে গিয়ে জানু ছুঁয়ে নমস্কার করল।

কে!

আমি তোমার ডাক শুনে এলাম আম্মাওয়ন।

কে? কে তুই, সরিতা!—বৃদ্ধের গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন সরিতাকে।

ইতিমধ্যে হাতে নিলা ভিলাক্কু নিয়ে একটি মেয়ে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রদীপের আলোয় মেয়েটিকে মনে হচ্ছিল একটি গন্ধরাজ ফুল। ধবধবে সাদা কাপড়ে আশ্চর্য লাবণ্যে ভরা একটি মূর্তি। বয়সে প্রেমাকেই মনে করিয়ে দেয়।

সরিতা! —মেয়েটির গলায় বিস্ময় বেজে উঠল।

ইন্দ্র বুঝল সরিতার সঙ্গে এই পরিবারটির নিবিড় ঘনিষ্ঠতা।

মেয়েটি ইন্দ্রের দিকে চেয়ে মুখ নীচু করতেই সরিতা বৃদ্ধকে বলল, আমাদের পরিবারের একটি বন্ধু সঙ্গে রয়েছেন।

বৃদ্ধ হাত তুললেন।

ইন্দ্র এতক্ষণে বুঝতে পারল বৃদ্ধ ভদ্রলোক অন্ধ। ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে নমস্কার করে বলল, আমার নাম ইন্দ্র, ইন্দ্র রায়।

বৃদ্ধ বললেন, মনে হচ্ছে বাঙালী।

সরিতা উত্তর দিল, হাঁ আপ্পাওয়ন উনি বাঙালী।

বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, আসুন আপনি আজ আমার বিশেষ অতিথি। বাঙালীদের আমি ভালবাসি। দেহ আর মনের দিক থেকে আমরা অনেক কাছাকাছি।

ইন্দ্র বলল, আমারও তাই মনে হয়। বিশেষ করে এই দুটি জাতির মানুষেরা একটু বেশী রকমের ইমোশনাল, জানি না এটা খারাপ কি ভাল।

বৃদ্ধের মুখ ঐ নিলা ভিলাকুর স্বল্প আলোয় উজ্জ্বল দেখাল। বললেন—

'Emotion is not something shameful, subordinate secondrate ; It is a supremely valid phase of humanity at its noblest and most mature.'

কথা কটি বলেই কিন্তু বৃদ্ধ আন্দাজে ইন্দ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলেন।

ধরেই বললেন, রাত হয়ে গেছে কথা বাড়াব না। চলুন যা আছে ভাগ করে খাওয়া যাক।

সরিতার হাত ধরে মেয়েটি প্রদীপ নিয়ে এগিয়ে চলল। বৃদ্ধ লাঠি একখানা ঠুকতে ঠুকতে অভ্যস্ত পথে তাদের অনুসরণ করে চললেন। ইন্দ্র চলল সবার পেছনে।

খাবার আসনে বসেই ইন্দ্র কথায় কথায় অনেক খবর জানতে পারল। গোবিন্দন পিল্লাই একসময় গৃহশিক্ষক ছিলেন সরিতাদের। তখন করুণাকর ব্যবসায়ের ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলেন যে মেয়েদের দিকে ঠিকমত নজর দেবার অবকাশ ছিল না তাঁর। সে সময় গোবিন্দন পিল্লাই চাকরী করতেন ঐ অঞ্চলে। পরিচয় হয় করুণাকরের সঙ্গে। ধীরে ধীরে যাওয়া আসা হতে লাগল দুই পরিবারের ভেতর। করুণাকর যখন বাইরে যেতেন তখন গোবিন্দন দেখাশোনা করতেন করুণাকরের মেয়েদের। গোবিন্দনের স্ত্রী তখন বেঁচে। তিনি মাতৃহীন দুটি মেয়েকে প্রায়ই নিজের কাছে ডেকে আনতেন। নিজের একটি মাত্র মেয়ে ললিতার সঙ্গ মিলেমিশে থাকত ওরা। শেষে ওদের লেখাপড়ার ভার পুরোপুরি করুণাকর দিয়ে দিলেন গোবিন্দন পিল্লাই-এর হাতে।

স্ত্রী মারা যাবার পর গোবিন্দন মেয়ে ললিতাকে নিয়ে বদলী হয়ে আসেন কারুনাগ পল্লীতে। তখনও সময় সুযোগ পেলে উৎসবে অনুষ্ঠানে দুটি পরিবারের ভেতর আসা যাওয়া চলত। আকস্মিকভাবে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে বড় বেশী স্থবির আর গৃহাশ্রয়ী হয়ে পড়েছেন গোবিন্দন। পাঁচ ছ'বছরে যোগাযোগটা অনেকখানি ছিন্ন হয়ে গেছে তাই।

গোবিন্দন একসময় বললেন, জানেন মিঃ রায় মাধবী আম্মার কাছে প্রেমা যখন নাচ শিখতে যেত তখন সরিতা চুপচাপ একটা গল্পের বই নিয়ে বসে থাকত আমার পাশের চেয়ারে। অফিসের সবাই ভেবে নিয়েছিল ও আমারই মেয়ে। অফিস থেকে ফেরার সময় ও নিজের ঘরে না গিয়ে ললিতার মায়ের কাছেই চলে আসত।

সরিতা বলল, ললিতার কিন্তু আমার সঙ্গেই ভাব ছিল বেশী। যদিও দিদির বয়সী ও।

ললিতা বলল, আমরা যত প্ল্যান করতাম তার সবটাই প্রায় গোপন করে রাখতাম প্রেমার কাছ থেকে।

গোবিন্দন হঠাৎ বলে উঠলেন, প্রেমা এল না কেন সরিতা?

কেন, আমি একা আসাতে মন ভরল না আম্মাওয়ন?

তুই চিরকাল ঝগড়াটে রয়ে গেছিস কুট্টি।

সরিতা বলল, প্রেমা নাচে বেশ নাম করেছে আম্মাওয়ন। ও গভর্ণমেণ্টের ডাকে কদিন ওদের গেস্ট হয়ে আছে। নাচ দেখাতে হবে সরকারী ভি আই পি—মিডল ইস্টের কোন এক সফররত বাদশাকে।

গোবিন্দন বললেন, আমি জানি প্রেমা দারুণ রকম ট্যালেণ্টেড।

সরিতা অমনি ফোঁস করে উঠল, আর আমি বুঝি একেবারেই ফ্যালনা?

অন্ধ গোবিন্দন আন্দাজে বাঁ-হাতটা তুললেন চাটি মারার ভঙ্গিতে কিন্তু সরিতা ততক্ষণে ছেলেমানুষের মত মাথাটা নীচু করে নিয়েছে।

ইন্দ্রের মনে হল এ খেলাটা অনেকদিনের পুরোনো। সেই পড়ানোর সময় হয়ত গোবিন্দন সরিতাকে শাসনের অভিনয় করতেন এমনি করে আর দুষ্টু সরিতাও ঠিক এমনিভাবে মাথাটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করত।

এখনও সরিতার ভেতর সেই কিশোরীটি রয়ে গেছে দেখে ইন্দ্রের ভীষণ ভাল লাগল।

খাওয়ার শেষে বৃদ্ধ গিয়ে বসলেন জ্যোৎস্না ধোয়া উঠোনের মাঝখানে এক-খানা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে। পাশের একখানা চেয়ারে বসল ইন্দ্র।

দুটি বান্ধবী অনেকদিন পরে একসঙ্গে হয়েছে তাই উঠে গেল ছাদের ওপর। সম্ভবত ঘুমের আগে কিছুক্ষণ মনের কথা বলবে দুজনে।

গোবিন্দন বললেন, দুটো গল্পে একসঙ্গে মিলেছে, কখন নামে দেখুন। আপনি বরং ওদের কথা না ভেবে বিছানায় চলে যেতে পারেন।

ইন্দ্র বলল, ওরা আমাকে শোবার জায়গাটা দেখিয়েই দিয়ে গেছে। কিন্তু কেন জানি না রাত হলেও ঘুম আসছে না চোখে।

ঘুম আমারও নেই মিঃ রায়। আজ চার-পাঁচ বছর রাতগুলো আমার কাছে বিভীষিকা।

গোবিন্দন পিল্লাই-এর কথাগুলো দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

একটু থেমে আবার বললেন, একটা নাতনি আছে আমার সে পাশটিতে শুয়ে থাকে গলা জড়িয়ে। তাকে গল্প বলে ঘুম পাড়াতে হয়। ও ঘুমোলে প্রায় সারাটা রাত আমি জেগে কাটাই। ঘুম আসে না।

ইন্দ্র বলল, ডাক্তার কি বলেন?

এ ডাক্তারের কেস নয় মিঃ রায়। আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে খেলা করছে।

ইন্দ্র বৃদ্ধের কথার রহস্য ভেদ করতে পারল না। কিছু জিজ্ঞেস করা সমীচীন নয় ভেবে চুপচাপ বসে রইল।

গোবিন্দন নিজেই আবার কথা শুরু করলেন, বেশ কেটে যাচ্ছে। বিধাতা চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে নতুন একটা জগতের দরজা খুলে দিয়েছেন। সেখানে দিনে রাতে অনেকটা সময়ই নিজের সঙ্গে কথা বলি। অন্ধকার জগতটার আনাচে-কানাচে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াই।

ইন্দ্র অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল, আজ আমরা যখন এখানে এলাম তখন আপনি অভুক্ত মানুষদের খাবার জন্যে ডাক দিচ্ছিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ নতুন বলে মনে হয়েছে।

বৃদ্ধ গোবিন্দন বললেন, এ আমার নতুন কিছু সৃষ্টি নয়, কেরালার প্রাচীনপন্থী পরিবারে এই রীতি আজও চলে আসছে। আমার বাপ-ঠাকুর্দা এমনি করে রাতে খাবার আগে অভুক্তদের ডাক দিতেন, আমিও তাই করি, অতিথি আসুক আর না আসুক। ঠিক দশটা বাজলেই অতিথিদের ডাক দিই আমি।

ইন্দ্র বলল, অতিথি সেবার চলন ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই ছিল কিন্তু এমন করে আজ আর বোধহয় ভারতের কোন অঞ্চলের মানুষ অতিথিদের ডাক দিয়ে ঘরে আনে না।

গোবিন্দন বললেন, সমাজ বদলাচ্ছে, অনেক উন্নত প্রথা পদ্ধতির চলনও হচ্ছে কিন্তু লোপ পাচ্ছে এমন সব আচার-আচরণ যা ছিল আমাদের দেশের একেবারে হৃদয়ের জিনিস।

আমি একেবারে এ যুগের ছেলে হয়েও কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্যের সবকিছুকে ভুলতে পারি না।

বৃদ্ধ গোবিন্দন পিল্লাই হেসে বললেন, তাহলে তো আপনি ব্যাকডেটেড হয়ে গেলেন এ যুগের চোখে।

ইন্দ্র বলল, আমাকে আপনি বলে ডাকলে দুঃখ পাব, যদি তুমি বলে ডাকেন তাহলে খুশী হব অনেক বেশী।

গোবিন্দন তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন ইন্দ্রের দিকে। ইন্দ্র অন্ধ গোবিন্দনের হাত নিজের দুটো হাতের ভেতর ধরে রাখল।

গোবিন্দন বললেন, তুমি আমাকে বড় বেশী বিচলিত করে তুললে বাবা। আজ তোমার হাতে হাত রেখে একটা শোকের ঢেউ বুকের ভেতর থেকে উঠে আসতে চাইছে।

ইন্দ্র বুঝল বৃদ্ধ গোবিন্দনের কোন কোমল জায়গার আবরণ সে অন্তরঙ্গতার হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে।

ইন্দ্র বলল, আপনাকে দেখে আমার বাবার মুখখানা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। বাবাও অপরিচিতকে খুব তাড়াতাড়ি আপনার করে নিতে পারেন। আপনার মতই উনি একটু বেশী রকমের সেন্টিমেন্টাল।

গোবিন্দন কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। একসময় নিজের ভেতরের আবেগটুকু সামলে নিয়ে বললেন, বিরাট একটা পাথরের স্তূপ আমার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। এমন কাউকে কাছে পাই না যাকে বুকের ভেতর জমে থাকা কথাগুলো বলে একটু হালকা হতে পারি।

এবার ইন্দ্রের চুপ করে বসে থাকা ছাড়া করণীয় কিছু ছিল না।

বৃদ্ধ গোবিন্দন পিল্লাই কান পেতে কোন কিছু শোনার চেষ্টা করলেন।

ওরা দুবান্ধবীতে গান গাইছিল ছাদের ওপর বসে। বোধহয় ছাদের অন্ত প্রান্তে বসে গাইছিল তাই গানের কথা বা সুর স্পষ্ট হয়ে বাজছিল না।

গোবিন্দন বললেন, কোন কিছুর তোয়াক্কা করতাম না ইন্দ্র, ভেবেছিলাম লোহা পিটিয়ে যেমন অস্ত্র বানায় তেমনি করে ভাগ্যকে গড়েপিটে আমি নিজের খুশী মত পথ তৈরী করে নেব। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল দেখলাম ভাগ্যই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মনের সবটুকু শক্তি জড়ো করে ভাগ্যকে

অস্বীকার করতে চাইলাম কিন্তু একটা লোহার ফ্রেমে আটকে দিয়ে ভাগ্য আমার সকল শক্তি কেড়ে নিল।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। অন্ধ গোবিন্দনের নিজস্ব জগতে একটা কিছু আলোড়ন চলছে। ওদিকে দুটি কণ্ঠ এক হয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে সুর। দমকা হাওয়ায় এলোমেলো বৃষ্টিধারার মত সুরগুলো ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে।

গোবিন্দন বললেন, তোমার মত একটি ছেলের সঙ্গে ললিতার বিয়ে দিয়েছিলাম। ছেলেটি বেশ প্রমিশিং বলে আমার মনে হয়েছিল। সবে ডাক্তারী পাশ করেছে। সার্জারীতে হাত ভাল দেখে ওকে ফরেনে পাঠানোই স্থির করলাম। একটিমাত্র মেয়ে আমার। কার জন্যে আর সঞ্চয় করব। ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলাম বিলেতে।

কিছুকাল নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলেছিল তারপর ওদিক থেকে খবর আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ললিতার মানসিক অবস্থা যে কি তা তুমি অনুমান করতে পার। সে তখন মা হতে চলেছে। যেদিন আমার নাতনী তুল্লু ভূমিষ্ঠ হল তার ঠিক সাতদিন পরে এল এক টেলিগ্রাম, আকস্মিক দুর্ঘটনায় ললিতার স্বামী মারা গেছে। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল তার কোন এক বন্ধু।

ইন্দ্র একটা দুঃখের শব্দ তুলে বলল, মারা গেলেন।

বৃদ্ধ গোবিন্দন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এক সময় বললেন, ললিতা অন্তত তাই জানে। তাছাড়া আমার পরিচিত জনেরাও একথা বিশ্বাস করে নিয়েছে।

ইন্দ্র বলল, মারা গেছেন এতে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন কি! আমি ভাবতে পারছি না এত অল্প বয়সে ললিতা তাঁর স্বামীকে হারালেন।

গোবিন্দন বললেন, স্বামীকে হারিয়েছে ঠিক কিন্তু সে ছেলেটি মারা যায়নি, বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। একটি জার্মান মেয়েকে বিয়ে করে জার্মানীতেই সেটল করেছে। লণ্ডনেই ওদের পরিচয় হয়েছিল তার পরিণতি ঘটল জার্মানীতে গিয়ে।

আপনার সংগ্রহ করা খবরটা কি সঠিক?

গোবিন্দন বললেন, আমার পরিচিত এক বন্ধু জার্মানীতে দীর্ঘদিন রয়েছে, সে ওর ঠিকানা পর্যন্ত আমাকে জানিয়েছে।

আপনি চিঠি দেননি?

গোবিন্দন হাসলেন। জ্যোৎস্নার রহস্যময় আলোয় সে হাসির অর্থ ভেদ করতে পারল না ইন্দ্র।

একসময় গোবিন্দন কথা বললেন, কি হবে চিঠি দিয়ে বল? যে নিজেকে চোরা পথে চোরের মত লুকিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাকে আমার মেয়ের স্বামী বলে ভাবব! তার চেয়ে সে মারা গেছে একথা ভাবা অনেক বেশী শান্তি আর সম্মানের নয় কি?

ললিতাকে এই আসল খবরটা জানাননি কেন?

সে সইতে পারবে না বলে। ওর মনটা ওর মায়ের মতই নরম। আমার মত মানসিক শক্তি ও পায়নি।

ইন্দ্র চুপ করে রইল। গোবিন্দন বললেন, সবচেয়ে ট্রাজেডি হল ললিতা তার ঘরে ঐ প্রতারক ছেলেটার একখানা বড় ফটো টাঙিয়ে রেখেছে। রোজ ফুলের মালা পরায়। ধূপ আর প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। মৃত্যুর দিনটিতে অভুক্ত থেকে পুজোআচ্চা করে। মা আর মেয়েতে প্রার্থনা গীত গায়।

ইন্দ্র বলল, আশ্চর্য!

সব কিছু জেনে শুনেও আমাকে দাঁড়াতে হয় ওর পাশে। গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকি ঐ প্রতারকটার মৃত্যু বার্ষিকীর দিনে। ললিতার কান্নাভরা মুখখানা বুকের ভেতর চেপে ধরে সান্ত্বনা দিই।

ইন্দ্র বলল, একটা চরম মিথ্যেকে সত্যের মুখোশ পরিয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করতে হচ্ছে, এর চেয়ে ট্রাজেডি আর কি হতে পারে।

ইন্দ্র আমি অন্ধ হয়ে বেঁচেছি। যদি স্বাভাবিক চোখ নিয়ে ওর সামনে দাঁড়াতাম তাহলে ও আমার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে পারত না। তাতে ওর বুকের যন্ত্রণাই বেড়ে যেত। এখন ও ইচ্ছে মত কেঁদে বাঁচে আর ওর কান্নাভরা মুখ দেখতে হয় না বলে আমিও বাঁচি।

ইন্দ্র খোঁজ নেয়, ললিতার মেয়েটির বয়েস এখন কত?

গোবিন্দন বললেন, তা বছর পাঁচেক হল। ওই এখন ললিতার সান্ত্বনা, তার ভরসা যাই বল।

ভোরবেলা দেখা হল ললিতার মেয়ে তুল্লির সঙ্গে। এমন নাম এখানে আসা অবধি ইন্দ্র কানে শোনে নি। সরিতাকে কথাটা বলতেই ও তুল্লিকে বেশ খানিকটা আদর করে নিল। তারপর ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, এ ধরণের নাম কেউ কখনো রাখে না এখানে। তুল্লি হল ফোঁটা। ও ললিতার চোখে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে এসেছে। তাই ললিতাই ওর অমনি একটা নাম রেখেছে।

ইন্দ্র চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখল তুল্লিকে। সুন্দর দেখতে মেয়েটি অবিকল মায়ের মুখখানা কে যেন ছাঁচে তুলে বসিয়ে দিয়েছে। বড় বড় উদাসী দুটো চোখ।

অপরিচিত ইন্দ্রের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ।

সরিতা ইন্দ্রকে দেখিয়ে বলল, ও কে বলতো ?

তুল্লি লজ্জা পেয়ে সরিতার মুণ্ডির একটা প্রান্ত ধরে নিজের মুখখানাকে আড়াল করে নিল।

সরিতা লুঙ্গিখানাকে টেনে নিয়ে ইন্দ্রের দিকে আঙুল তুলে মোলায়েম গলায় বলল, বল কে ?

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সরিতার গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ রেখে তুল্লি বলল, আপ্‌পা।

ইন্দ্র কথাটা শুনতে পেল না, কিন্তু সরিতার বড় বড় চোখ দেখে বুঝল মেয়েটি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছে।

ললিতাকে ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। সরিতা তুল্লিকে বলল, চেরি-আচ্চন। তোমার কাকামণি।

ইন্দ্র বুঝল, তুল্লির দারুণ রকম একটা ভুলকে তাড়াতাড়ি শুধরে দিল সরিতা। এখন ইন্দ্রের সঙ্গে তুল্লির হল কাকা-ভাইঝি সম্পর্ক।

ললিতা একটা প্লেটে খানিকটা হালুয়া এনেছিল। ইন্দ্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, খান।

ইন্দ্র অমনি বলে উঠল, একটু আগে চা জলখাবার খেলাম। আধ ঘণ্টাও পেরোয় নি। এ রকম খাওয়ালে এ জায়গা থেকে আর কিন্তু নড়াতে পারবেন না।

ললিতা হাসল। ওর চোখ দুটো কেমন করুণ করুণ। হাসলেও মেঘ ভাঙা রোদের মত মনে হয়।

বলল, বেশ তো থাকুন না। কে আপনাকে চলে যেতে বলছে। তবে সরিতা চলে গেলে আপনি কি আর থাকতে পারবেন।

কথাটা বলেই চোখের কোণে তাকাল সরিতার মুখের দিকে। দুষ্টুমির হাসি ঠোঁটে লেগে আছে ললিতার।

ইন্দ্র বুঝল, গত রাত্রে দু'বান্ধবীতে মনের কথা উজাড় করে বলা হয়ে গেছে। ললিতার চোখে ইন্দ্র এখন আর কোন অপরিচিত মানুষই নয়।

ইন্দ্র বলল, আপনার বান্ধবী আমার মালিক। তার মর্জির ওপর আমার

থাকা না থাকা নির্ভর করছে। সরিতা সম্মতি দিলেই আমি থেকে যাই।

সরিতা বলল, খুউব, খুব যে। থাকই না। এক্ষুণি সই করে দিচ্ছি ছুটির দরখাস্তে। যদ্দিন খুশী থেকে যাও ছুটি নিয়ে।

ইন্দ্র ললিতার দিকে চেয়ে বলল, দেখছেন তো আপনার বান্ধবী কি রকম দয়ালু। ছুটি চাইতে না চাইতেই মঞ্জুর।

ললিতা বলল, সরিতার বন্ধুটি মালিকের প্রতি অনুগত বলেই তাকে এতটা ফেভার দেখানো হচ্ছে।

তিনটি হলুদ প্রজাপতি নেচে বেড়াচ্ছিল হাওয়ায় তিনটে আধফোটা ঝিঙে ফুলের মত। তুল্লি তাদের পেছন পেছন ছুটছিল। সে প্রজাপতিগুলোকে ধরার কোন চেষ্টাই করছিল না। শুধু সারা বাগান ওদের সঙ্গে ছুটে ছুটে ওদের নাচ দেখছিল অবাক চোখে। দুটো কচি কচি হাত পেছন দিকে বেঁধে চোখ দুটো ওপরে তুলে যখন দাঁড়িয়েছিল তুল্লি তখন তাকে শ্রেষ্ঠ কোন চিত্রকরের পুরস্কার পাওয়া ছবি বলে ভ্রম হচ্ছিল।

এই মুহূর্তে কি মনে করে ইন্দ্রের কাছে দৌড়ে এল তুল্লি। কচি গলায় কলকলিয়ে বলে উঠল, আপ্‌পা প্রজাপতিরা কোথায় থাকে?

ইন্দ্র ততক্ষণে সংকোচে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। ললিতা আর সরিতা স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

ললিতা এগিয়ে এসে বলল, উনি তোমার আম্মাওয়ন তুল্লি। ইন্দ্রের দিকে চোখ তুলে পরিষ্কার বাংলায় বলল, মামাবাবু।

তুল্লি তার কচি আঙুল তুলে মাকে শাসনের ভঙ্গীতে বলল, বোকামী করে না, উনি আমার চেরি-আচ্চন।

কথাটা বলেই সে একটা বিজ্ঞের হাসি হেসে সরিতার দিকে তাকাল।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা হঠাৎ লঘু হয়ে গেল। সরিতা অমনি হেঁকে বলল, ভেরি গুড, ভেরি গুড।

ললিতা আবার পায়ে পায়ে পেছনে সরে গিয়ে দাঁড়াল সরিতার পাশে।

ইন্দ্র তুল্লির দুটো হাত ধরে বলল, তোমার প্রজাপতিরা সবুজ বনে সোনা আর রূপোর তৈরী ঘরে রাত দিন ঘুমিয়ে থাকে। হঠাৎ কোনদিন ওরা স্বপ্ন দেখে নীল নীল জলের ওপর চাঁদের আলো ঝিলমিল নাচ নাচছে। হাওয়ার ঘায়ে দোল খাচ্ছে ফুলের ডাল।

অমনি ঘুম ভেঙে যায় ওদের। তখনি হুড়মুড়িয়ে ঘরের দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেয় ওদের স্বপ্নে দেখা সেই নাচ।

বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে তুল্লি শুনল প্রজাপতিদের গল্প।

অমনি বায়না ধরল, আরও গল্প বল।

কিসের গল্প শুনতে চাও?

তুল্লি ভেবে ভেবে বলল, পুতরিদের গল্প জান তুমি?

ইন্দ্র বলল, জোনাকীদের মায়ের রঙ বেজায় কালো। তাই দিনের বেলা আলোর সামনে বেরোয় না। দিন ফুরোলে সে ঘুরে বেড়ায় সব জায়গায়। যেখানে যায় সেখানকার গাছপালা ঘর-বাড়ী নদী-নালা সব কিছু তার রঙের ছোঁয়ায় অন্ধকার ঘুরঘুট্টি হয়ে যায়। যেদিন রাতে চাঁদ ওঠে সেদিন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাড়ে, বনের গভীরে আর পাহাড়ের গুহার ভেতর।

সে যখন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় তখন লোকজন বড় একটা কেউ বেরোয় না। তার কালো রঙের ছায়ায় পথ দেখা যায় না, তাই।

লোকে জোনাকীদের মাকে বড় একটা পছন্দ করে না, কিন্তু তাতে কি এসে যায়। তার ছেলেমেয়েগুলো একেবারে হীরের টুকরো। পথ দিয়ে গেলে সবাই তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। আলোর ফুলকির মত, তুল্লির মাসির নাকের ঐ হীরেটার মত ঝলমল করে ওঠে তারা।

আর কি নাচের ঘটা তাদের। বনে বনে পথে পথে, ঝিলেবিলে ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়ায় মনের খুশীতে। ভাই-বোনেদের কি ভাব! যেখানে যাবে এক সঙ্গে যাওয়া চাই।

লোকে পুত্‌রীদের মা নিশিবালাকে পছন্দ না করলেও তার হীরের টুকরো ছেলেমেয়েগুলোকে খুব ভালবাসে। আর তাই নিয়ে মায়ের গর্ব যেন ধরে না। কচি-কচি ছেলেমেয়েরা তুল্লির মত ফুটফুটে সুন্দর আর লক্ষ্মী হলে কোন মায়ের না ভাল লাগে বল?

এমনি করে সুন্দর ছেলেমেয়েদের পেয়ে নিজের দুঃখ ভুলে গেছে পুত্‌রীদের মা।

শুধু যখন দিনের আলো জ্বলে ওঠে তখন মা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢুকে পড়ে গাছের ফাঁক ফোকরে অথবা কোন গুহা গর্তে। পুত্‌রীরা কিন্তু দিনের আলোয় বাইরে বেরোবে বলে কোন রকম বায়নাই ধরে না। ওরা মাকে খুব বেশী ভালবাসে। তুল্লির চেয়ে বেশী, তাই না তুল্লি?

তুল্লি এবার জোরে জোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল। তারপর ইন্দ্রের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ললিতা বলল, আপনি কিন্তু মহা মুশকিলে পড়বেন। গল্পের নেশা

যেভাবে ধরিয়ে দিলেন তাতে তুল্লি আপনাকে সহজে নিষ্কৃতি দেবে বলে মনে হয় না।

ইন্দ্র বলল, আমি কচিকাঁচাদের দারুণ পছন্দ করি।

ললিতা অমনি সরিতার দিকে আড় চোখে চেয়ে বলল, আর কাঁচাদের ধাশা মাসিগুলোকে পছন্দ করেন না?

ইন্দ্র বলল, অনেক মাসিকে এক সঙ্গে পছন্দ করতে হলে আমাকে মিশরের ফারাও বা আরবের বাদশা হতে হয়।

সরিতা ললিতার দিকে চেয়ে মন্তব্য করল, যেমন বলতে গিয়েছিলি।

তুল্লি কখন বাইরে চলে গেছে। এখন ঘরের পেছন দিক থেকে তার পরিত্রাহি চীৎকার শোনা গেল।

সবাই হুড়োহুড়ি করে সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, গাইগরু একটা বাঁধা রয়েছে নারকেল গাছের সঙ্গে। সে গাছের কাণ্ডে জড়ান গাদা থেকে খড় টেনে টেনে চিবুচ্ছে! ধবধবে সাদা বাচ্চাটা পুষ্ট পটলের মত দুধের বাঁট ধরে প্রাণপণ শক্তিতে টেনে টেনে চুষছে। বাছুরটার পাশে মাটিতে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে হাপুস চোখে কাঁদছে তুল্লি। চীৎকারটা উঠেছিল পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে।

সরিতা দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল তুল্লিকে।

ললিতা বলল, এ আবার এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে তুল্লির। পাণ্ডুটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ও বাঁট চুষে দুধ খাবে। যত না দুধ খায় তার চেয়ে চাঁট খায় বেশী।

সরিতা শঙ্কিত গলায় বলল, কোনদিন দেখ আবার দারুণ রকম চোট পেয়ে না বসে।

ললিতা বলল, পাণ্ডুটি কিন্তু খুব শান্ত। শুয়ে থাকলে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দেয় তুল্লি। পাণ্ডুটিও তুল্লির মাথার ওপর মুখ তুলে দেয় আদরের ভঙ্গীতে। সে এক দৃশ্য। কিন্তু ও যদি পাণ্ডুটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবকিছু করতে চায় তাহলে চোট ওকে পেতেই হবে।

মধ্যাহ্নভোজে বসেছে ওরা। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই ললিতার ভেতর। সে যেন অনেক দিন পরে জেলখানার দমবন্ধ করা একটা সেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার করুণ দুটো চোখ কখন ভোরের রোদের মত আলোর জোয়ারে ভরে উঠেছে। সপ্রতিভ ললিতা বার বার ইন্দ্রকে বলল, আপনার খেতে খুব

অসুবিধে হচ্ছে। আমাদের তৈরী খাবার বাঙালীদের মুখে রোচে না আমি জানি। আর একটুখানি সম্বর দেব? কালন ওয়েল আবিয়েল? কিছু চাই না? বুঝেছি, খেয়ে পেট ভরে নি। হোটেলে নিজের খুশী মত বানিয়ে খান তো।

ইন্দ্র বলল, যা চাইব দেবেন?

বলুন—আডুকালার ওয়াদিল ধরে দাঁড়িয়ে মুখে হাসির ঝিলিক তুলে বলল ললিতা।

ইন্দ্র বলল, পর্দামন। সত্যি আপনার পায়েসের তুলনা হয় না।

সরিতা বলল, পেতে পার, তবে পায়সম তৈরীর আদ্দেক উপাদান অন্ততঃ বলতে হবে তোমায়।

ইন্দ্র ভেবে ভেবে বলল, আধসেদ্ধ ডালের সঙ্গে কাজুর গুঁড়ো কিসমিস নারকেলের দুধ দিয়ে ঘন করে ফোটান হয়েছে বলে মনে হয়।

অন্ধ গোবিন্দন হা হা করে হেসে উঠে বললেন, প্রায় ফুল মার্কস পেয়ে পাশ করে গেলে ইন্দ্র। ললিতা হেরে গেছ তুমি। বাকী সবটুকু পায়সম্ কিন্তু ইন্দ্রেরই প্রাপ্য।

ইন্দ্র বলল, তা হলেই হয়েছে। সবটুকু এখন খেতে হলে তৃপ্তিটা হয়ে উঠবে শাস্তি।

সরিতা বলল, এখন দেখছি প্রেমা যোগ্য লোকের হাতেই হোটেল চালাবার ভার দিয়েছে।

ললিতা বলল, তুই কি এতকাল ওঁকে অযোগ্য ভেবেছিলি নাকি?

সরিতা চারটে আঙুলের ডগা ঠোঁটের মাঝখানে ছুঁইয়ে মাথাটা বুড়োবুড়ি পুতুলের মত ওপর নীচে দোলাতে লাগল।

দুপুরে বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় একটা বইয়ের ভেতরে ডুবে গিয়েছিল ইন্দ্র। জামাইকা ইন। ন্যাড়া পাহাড় আর জলাভূমি চলে গেছে থাঁড়ি অব্দি। জনপদ থেকে অনেকখানি দূরে পাহাড়ী পথের ওপর অদ্ভুত একটা সরাইখানা। প্রবল বর্ষার রাতে সেখানে এসে পৌঁছল তরুণী একটি মেয়ে। সরাইখানার মালিক মেয়েটির মেসো, ভয়াবহ চরিত্রের লোক। মাসি সদাই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। খুনজখম চোরাকারবারের পীঠস্থান সেই রহস্যময় সরাইখানাটি। কিন্তু সবচেয়ে যা ইন্দ্রের ভাল লাগছে তা হল নায়িকার চরিত্র।

এমন বিপদের মাঝখানেও কি আশ্চর্য নির্ভীকতা। একা জলাভূমির মারাত্মক রাস্তার ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে চলেছে। কখনও বা ন্যাড়া পাহাড় বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে চেয়ে চেয়ে দেখছে প্রকৃতির ভীষণ শূন্যতা।

সরিতা ঘরে ঢুকতেই চমকে তাকাল ইন্দ্র। মগ্নতা ভেঙে গেলে এমনি একটা চমক লাগে শরীরে। সরিতার দিকে চেয়ে ইন্দ্রের হঠাৎ মনে হল, সে জামাইকা-ইনের দুরন্ত সাহসী যদৃচ্ছ বিহারিণী সেই মেয়েটিকে তার সামনে দেখছে।

সরিতা এসে বলল, আমি যাচ্ছি আম্মাওয়নকে নিয়ে আরণমূলায় পার্থ-সারথির মন্দিরে।

ইন্দ্র বলল, আরণমূলাটা কোথায়?

আলেপ্পি জেলার চেঙ্গান্নুর তালুকের একটা গ্রাম।

তুমি এতদূরে যাবে?

সরিতা বলল, অন্ধ মানুষ, একটা ইচ্ছে হয়েছে, তাঁকে কি না বলা যায়!

চল আমিও তোমার সঙ্গী হই।

সরিতা বলল, তাহলে তো ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু ইয়ংম্যান, তোমাকে আজকের রাতটা থাকতে হবে বাড়ী পাহারায়।

ইন্দ্র বলল, ভয়ডর আমার নেই কিন্তু তোমরা রাত কাটাবে ওখানে?

আম্মাওয়নের ইচ্ছেটা তাই। মন্দিরে সন্ধ্যা আর প্রভাত আরতির সময়টুকু কাটিয়ে তবে ফিরতে চান।

ইন্দ্র বলল, আমার কোন অসুবিধে হবে না তোমরা নিশ্চিন্তে যেতে পার। খাবার ব্যাপারে চিন্তা কর না, একটা রাত শুকনো যা হোক কিছু খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারব।

সরিতা বলল, তা কেন, ললিতা আর তুল্লি তো থাকছেই।

ইন্দ্রের গলায় বিস্ময়ের স্বর বাজল, ওরা যাচ্ছে না?

সরিতা বলল, পাণ্ডু, পাণ্ডুকুটি রয়েছে না, তাদের ফেলে ও যাবে কি করে। তোমাকে শুকনো খাবার অব্দি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তা বলে পাণ্ডুদের পরি-চর্যার ভার তো আর দেওয়া যায় না।

ইন্দ্র বলল, বেশ থাকতে পারব তবে একটা রাত একজন কাছেপিঠে থাকবে না ভাবলেই বুকখানা কেমন খালি খালি লাগবে।

সরিতা বলল, ফিরে এসে না হয় খালি বুকখানা ভরে দেওয়া যাবে।

ওরা চলে গেল। দূরের পথ, বেলা থাকতে থাকতেই চলে গেল ওরা। গাড়ীটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে একবার থামল। সরিতার সুগঠিত শ্যামলা হাতখানা বেরিয়ে এল গাড়ীর বাইরে। পাঁচটা আঙুল একটি শাখার মাথায় পাঁচটি পাতার মত কেঁপে কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই হাতটা অদৃশ্য হল। গাড়ী বেরিয়ে গেল চোখের বাইরে।

ললিতা ইন্দ্রের পাশেই দাঁড়িয়েছিল তুল্লিকে ধরে। হঠাৎ ইন্দ্রের দিকে ফিরে বলল, মন খারাপ হয়ে গেল তো?

ইন্দ্র হেসে তাকাল ললিতার দিকে। বলল, বান্ধবীর বান্ধবী তো রইলেন। তাই বা কম কি।

কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন! সরিতা, সরিতা।

ইন্দ্র বলল, আর ললিতা ও ললিতা।

ললিতা এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, তা সত্যি, কারু সঙ্গে কোন দিক থেকেই আর কারু মিল নেই। এক একজন আকারে স্বভাবে সবদিক থেকেই আলাদা।

তুল্লি খেলতে খেলতে কোথায় চলে গেল।

ললিতা বলল, আসুন ভেতরে বসে গল্প করা যাক।

ললিতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র এসে ঢুকল ললিতার ঘরে।

বসুন।

ইন্দ্র ঘরের ভেতর পড়ে থাকা টুলটি টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছিল, ললিতা বলল, বিছানার ওপরেই বসুন। কোন সংস্কার নেই আমার।

ইন্দ্র বিছানায় বসতেই সামনের দেয়ালে চোখ গিয়ে পড়ল। বৃদ্ধের ভাষায় সেই প্রতারক ডাক্তার ছেলেটির ফ্রেমে বাঁধান ছবিটা তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে চেয়ে আছে।

ইন্দ্রের প্রথম ইম্প্রেশানটা ভাল হল না। হয়ত আগে থেকে বিরূপ একটা ধারণা থাকার জন্য লোকটা দেখতে শুনতে আর পাঁচটি যুবকের মত হলেও কেমন যেন চতুর চতুর বলে মনে হল।

ললিতা বলল, আমার স্বামীর ছবি।

ইন্দ্র বলল, ফটো দেখে মনে হয় আপনার স্বামীর ভেতর দারুণ একটা শার্পনেস আছে। ঠাণ্ডা মাথায় খুব কঠিন কঠিন কাজ করে ফেলতে পারেন বলে মনে হয়।

ললিতা বলল, হাঁ, বেশ ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন উনি। বেশী কথাবার্তা

বলতে ভালবাসতেন না। কাজের মানুষ কাজ নিয়েই থাকতেন। বলতে পারেন স্বভাবে আমার ঠিক উল্টোটি ছিলেন। অবশ্য কতটুকুই বা আমার জানাশোনা ওঁর সঙ্গে।

ইন্দ্র বলল, আপনার ট্র্যাজিক কনজুগাল লাইফের জন্য সত্যই দুঃখিত।

ললিতার বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। বলল, জীবনটা শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল।

জীবন কখনো শেষ হয়ে যায় না মিসেস নায়ার। মৃত্যু যদি আসে তাহলে তো সব চুকেবুকেই গেল। কিন্তু যতক্ষণ তা না আসে ততক্ষণ লাইফ একটা দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর মত এগিয়ে চলবেই। সে ভেঙেচুরে যেমন তছনছ করবে তেমনি তার বুকের ভেতর জমে থাকা সবটুকু এনার্জী বিলিয়ে দেবে সবাইকে।

ললিতা অন্যমনস্ক হয়ে পালঙ্কের বাজুতে হাত রেখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। এক সময় স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করল, আমি হেরে গেছি মিঃ রায়। জীবনটা চলতে চলতে হঠাৎ বড় বেশী পিছিয়ে পড়েছে। ওকে টেনে নিয়ে যাবার কোন উৎসাহই আর পাই না।

ইন্দ্র বলল, এ ধরনের মেণ্টাল ডিপ্রেশান অন্তত আপনার মত মেয়ের কাছ থেকে আশা করি না। আপনি যদি এডুকেটেড না হতেন, কোন দূর গ্রাম্য এলাকার অন্ধকার অঞ্চলের একটি মেয়ে হতেন তাহলে এসব কথা তোলার কোন মানেই হত না। সে ক্ষেত্রে চেষ্টা করলেও আপনার ডিপরুটেড সংস্কারগুলোকে কেউ ভাঙতে পারত না কিন্তু আপনার রুচি আপনার প্রাণশক্তি সব কিছুই যে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। সেখানে থেমে থাকলে চলবে কেন।

ললিতা হঠাৎ ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ইন্দ্রের মনে হল এইটুকু সময়ের ভেতর তার এতখানি কথা বলে ফেলা হয়তো ঠিক হয় নি।

অনেক সময় নিঃসঙ্গ থেকে যখন ইন্দ্র নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করেছে ঠিক তখনই হাতে কফির কাপ নিয়ে ঢুকল ললিতা।

ইন্দ্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ভয় নেই, খাবার দিচ্ছি না, কফি সব সময়েই চলতে পারে।

ইন্দ্র বলল, আপনার?

আনছি বলেই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে নিজের কাপটা নিয়ে এল ললিতা।

ললিতাকে এখন বেশ সহজ স্বাভাবিক বলে মনে হল। ইন্দ্র কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তাকাচ্ছিল ললিতার দিকে।

ললিতা বলল, কফির নিন্দা কিংবা প্রশংসা করলেন না তো?

বা রে সবটুকু খেতে দেবেন তো।

ললিতা কাপের কাণায় ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, প্রথম চুমুকেই বোঝা যায়। সবটুকু শেষ করে যে প্রশংসা তা হোস্টেসের মনরক্ষা ছাড়া কিছু নয়।

ইন্দ্র বলল, আপনি কিন্তু দারুণ রকম ইনটেলিজেণ্ট। আমার অনুমানের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

ললিতা বলল, আর বেশী প্রশংসা করবেন না। মাথা বিগড়ে যাবে।

ইন্দ্র এক সময় কফি খেতে খেতে বলল, সত্যি আপনার কফির হাত খুব সুন্দর।

ললিতা অমনি বলল, শুধু আমার কফির হাত সুন্দর? আর কিছু ভাল নয় বুঝি?

ইন্দ্র কাপ থেকে মুখ তুলে বলল, তাহলে তো হাত দেখতে হয়। ভালমন্দ সবই ঐ হাতে লেখা আছে।

ললিতা কফিটুকু চুমুক দিয়ে কাপটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে দিল ইন্দ্রের দিকে। বলল, সত্যি আপনি হাত দেখতে জানেন? দেখুন না আমার হাতটা।

ইন্দ্র তার পাশে সাদা বিছানার ওপর পেতে দেওয়া স্থলপদ্মের মত রক্তাভ হাতখানার দিকে চেয়ে দেখল। কফির কাপটা নীচে নামিয়ে রাখতে গেলে ক্ষিপ্র হাতে সেটা ধরে নিল ললিতা। কাপটা টিপয়ের ওপর রেখে আবার ফিরে এল সে।

এবার বিছানার এক কোণায় উঠে বসে হাত পাতল ইন্দ্রের সামনে।

ইন্দ্র ললিতার হাতের রেখাগুলোতে মাঝে মাঝে নিজের আঙুল বুলিয়ে মনে মনে কি যেন ভেবে নিচ্ছিল। এক সময় ললিতার হাতটা নিজের বাঁ হাতের পাতায় তুলে নিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

ললিতা তন্ময় হয়ে চেয়েছিল তার নিজের হাতের দিকে। অজস্র ভাঙা-চোরা আঁকাবাঁকা রেখা প্রাচীন কোন নগরীর অপরিচিত পথচিত্রের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। তার চোখ সেই গোলকধাঁধার আবর্তে অগাধ কৌতূহল নিয়ে ঘুরে ফিরছিল।

ইন্দ্র কথা বলল, আপনার হাত বিস্ময়কর।

মুহূর্তে ললিতার দুটো বাদামী চোখের তারা মধুসন্ধানী মৌমাছির মত উড়ে গিয়ে বসল ইন্দ্রের মুখের ওপর।

ইন্দ্র আবার বলল, সত্যি আপনার হাতের রেখায় রেখায় ভাগ্য দেবতার আশ্চর্য খেলার ছকটি পাতা হয়ে আছে।

ললিতা বলল, সে খেলার ছকে খেলতে খেলতে বার বার আমাকে হার মানতে হয়েছে।

হার আপনার হয় নি। কপট পাশায় ছল করে আপনাকে হারান হয়েছে।

ললিতার গলায় কৌতূহলের সুর বাজল, কি রকম?

ইন্দ্র অনেকক্ষণ হাতের রেখার দিকে চেয়ে বলল, সত্যি ললিতা আপনি প্রতারিত হয়েছেন। আচ্ছা আপনার কি ভালবেসে বিয়ে হয়েছিল? অবশ্য যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে অসংকোচে উত্তর দেবেন।

হ্যাঁ।

আপনার ভালবাসা কি শুধু মিঃ নায়ারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল না তার আগেও আপনি কাউকে ভালবাসতেন?

একটু থেমে আবার বলে উঠল ইন্দ্র, অবশ্য উত্তর দেওয়া না দেওয়া আপনার মর্জি। ডাক্তারের কাছে গেলে যেমন রোগ গোপন করতে নেই ঠিক তেমনি পামিস্টের কাছে গেলে তার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে নেই।

ললিতা একটু চাপা গলাতেই বলল, আপনি তো আগেই আমার হাতের লেখা পড়ে নিয়েছেন, এখন সিক্রেট বলে কিছু নেই। হাঁ আমি কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলেকে ভালবাসতাম। তাকে আমি বিয়ে করব বলে কথাও দিয়েছিলাম।

ইন্দ্র বলল, তারপর কথা যে রাখতে পারেননি তা তো আপনার হাতের রেখাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ললিতা মাথাটা নীচু করে কি যেন ভাবল। হয়ত সে তার অতীতের অপরাধটাকেই স্মরণ করছিল।

এক সময় বলল, ঐ অন্যায়ের জন্যেই হয়ত আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি।

ইন্দ্র বলল, আমি জানতে চাই না আপনি কেন কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেন নি। তবে আপনার স্বামীর সঙ্গে বিয়ের কতদিন আগে থেকে আপনার পরিচয় ছিল সে কথাটা জানা আমার দরকার।

সামান্য কয়েকটা দিন মাত্র।

ইন্দ্র বলল, ব্যস তাতেই ভালবাসা আর বিয়ে!

ললিতা বলল, আমি ছোটখাটো একটা অপারেশনের জন্যে মেডিক্যাল কলেজের সার্জিকাল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলাম। মিঃ নায়ার অপারেশনের আগে দু' একবার আমাকে দেখে গিয়েছিলেন। ইয়ং ডাক্তার, নার্সদের সঙ্গে কথা বলছিলেন বেশ ডিগনিফায়েড ওয়েতে। আমার প্রথম দেখাতেই বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল।

অপারেশনের দিন আমার কাছে এসে একটু হেসে বললেন, অ্যানাসথেসিয়া দিলে আপনি গভীর ঘুমে ডুবে যাবেন তখন জানতেও পারবেন না কখন আপনার অপারেশন হয়ে গেল।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, লোকাল অ্যানাসথেসিয়া দিয়ে অপারেশন করা যায় না?

ডাক্তার নায়ার বললেন, যায় কিন্তু আপনি কষ্ট পাবেন।

আমি তখন খানিকটা জেদের সঙ্গেই বললাম, তা হোক আপনি লোকাল অ্যানাসথেসিয়া দিয়ে যদি সম্ভব হয় তাহলে অপারেশনটা করুন।

আমার কথা উনি রেখেছিলেন আর আমিও ওঁর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার কষ্ট ভুলেছিলাম।

অপারেশনের শেষে উনি এক মুখ হাসি উপহার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বিকেলে যখন উনি রাউণ্ডে এলেন তখন আমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম। উনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। কপালে সে হাতটা সরে এল। আমার শরীরে তখন দারুণ এক ধরণের রোমাঞ্চ। আমি ভুলে গেলাম যন্ত্রণা।'

বাড়ীতে ফিরে আসার পরেও উনি আসতে লাগলেন আমাদের এখানে। আমাকে বলতেন, ব্রেভ ইয়াং লেডি। বুঝতেই পারছেন এর পর আমাদের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে আর বেশী সময় লাগে নি। বাবাও এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু তুলি জন্ম নেবার আগেই উনি এফ আর সি এস করতে চলে গেলেন লণ্ডনে আর ফিরতে পারলেন না।

শেষ কথাটি বলার পরে ললিতাকে বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক দেখাল।

ইন্দ্র ললিতার হাতটা ধরে নাড়াচাড়া করল। এক সময় সোজা ললিতার মুখের ওপর চোখ ফেলে বলল, আমি এখন আপনার হাতের রেখা বিচার করে যা বলব তা কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

ললিতা বলল, বিশ্বাসই যদি না করব তাহলে হাতটা বাড়িয়ে দেব কেন।

ইন্দ্র বলল, সত্যটা বড় কঠিন, আপনি আঘাত পেতে পারেন।

ললিতার মুখে শেষ বেলাকার আলোর মত একটা বিষণ্ণ হাসি খেলা করে গেল। আস্তে বলল, কত আঘাত আর পাব। আঘাত সইবার ক্ষমতা আমি ধীরে ধীরে অর্জন করেছি মিঃ রায়।

ইন্দ্র সোজাসুজি বলল, আপনার হাতে বৈধব্যযোগ দেখতে পাচ্ছি না মিসেস নায়ার।

হঠাৎ ঘরখানাতে কোন নর্তকী যেন তার নূপুর দ্রুত লয়ে বাজিয়ে গেল। ভেঙে ভেঙে সুরেলা একটা হাসি সারা ঘরে ছড়িয়ে দিল ললিতা।

কথাটা শুনতে খু-উ-ব ভাল, কিন্তু মিঃ রায় কথাটা শোনার পর আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?

ইন্দ্র জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল ললিতার মুখের দিকে।

ললিতা বলল, কর্পূরের গন্ধ পাচ্ছিলাম এতক্ষণ; খুব মিষ্টি লাগছিল কিন্তু স্থায়ী হল না উবে গেল।

ইন্দ্র আস্তে ললিতার হাতখানা নামিয়ে রাখল বিছানার ওপর। ম্লান একটুখানি হাসল ললিতার দিকে চেয়ে।

ললিতা একটু হেসে বলল, অমনি জ্যোতিষীমশায়ের রাগ হয়ে গেল।

হাতখানা ইন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখুন তো এ দুনিয়া থেকে সরে যাবার যোগটা কখন আসবে।

ইন্দ্র ললিতার হাতটা ধরল না। শুধু বলল, আমি হেরে গেছি। যে মুখোশটা এতক্ষণ পরেছিলাম সেটা মিথ্যে। আমি পামিস্ট নই।

ললিতা ইন্দ্রের হাতের ওপর হাতটা রেখে দিয়ে বলল, দেখুন না বাবা একটুতেই এত রাগ।

ইন্দ্র ললিতার হাতটা নিজের দুটো হাতের ভেতর চেপে ধরে বলল, বিশ্বাস করুন আমি জ্যোতিষী নই। এতক্ষণ মিথ্যে জ্যোতিষীর অভিনয় করেছিলাম। তবে আপনার স্বামী যে মারা যাননি এটা ধ্রুব নক্ষত্রের মত সত্য।

ইন্দ্রের হাতের মুঠোয় ধরা ললিতার হাতখানা থর থর করে কেঁপে উঠল।

ইন্দ্র দেখল ললিতার মুখের রং মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল।

এক সময় ললিতা যেন তার শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে বলল, আপনি জানলেন কি করে মিঃ রায়?

কথা দিন আমার কাছ থেকে যে শুনেছেন তা কাউকে বলবেন না।

ললিতা শব্দ করল না কিন্তু মাথা নেড়ে জানাল সে কাউকে কথাটা বলবে না।

ইন্দ্র বলল, যে বিশ্বাস নিয়ে আপনি ডাক্তার নায়ারকে ভালবেসেছিলেন তার মর্যাদা রাখার মত মানুষ ছিলেন না তিনি। আপনাকে তাঁর শুধু কাছে পাবার দরকার ছিল মনের ভেতর ধরে রাখার মত প্রেরণা ছিল না।

ইন্দ্র দেখল ললিতার চোখ বিছানার ওপর স্থির হয়ে গেল।

ইন্দ্র একটু থেমে বলল, আপনার কষ্ট হয় কোন কিছুতে এটা আমি চাই না। যতটুকু শুনেছেন তার বেশী শোনার দরকার নেই আপনার।

মুহূর্তে ললিতা চোখ তুলে চাইল ইন্দ্রের দিকে। বলল, না না আমার কিছু হবে না। দয়া করে আমাকে অন্ধকারে রাখবেন না। সবটুকু ঘটনা খুলে বলুন।

ইন্দ্র দেখল ললিতার দুটো চোখে অস্বাভাবিক এক ধরণের দৃষ্টি।

ইন্দ্র বলল, বিচলিত হবেন না মিসেস নায়ার, সারাজীবন একটা মিথ্যের বোঝা বইবার চেয়ে সত্য যত কঠিন হোক তার মুখোমুখি দাঁড়ান ভাল।

ললিতা বলল, আমি সব শুনতে চাই। সইবার শক্তি ঈশ্বরই আমাকে দেবেন।

ইন্দ্র বলল, ডাক্তার নায়ার এখন জার্মানীতে প্র্যাকটিশ করছেন। ওখানকার সিটিজেন উনি। ওখানেই নতুন সংসার পেতেছেন। মৃত্যুর খবর একটা ভাঁওতা।

ললিতা বলল, আপনি কোথা থেকে খবর পেয়েছেন তা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব না তবে আপনার কথা যে সত্যি একথা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি।

আপনার বাবা এ খবর জানেন, তিনিই আমাকে জানিয়েছেন।

আমি কিছুদিন থেকে সে রকম একটা সন্দেহ করছিলাম, বলল ললিতা। তুল্লি তার দাদুর কাছে যখন তার বাবার কথা জানতে চাইত তখন একটু রূঢ়ভাবেই আমার বাবা সে প্রসঙ্গ চেপে যেতেন। কিছু বিরূপ মন্তব্যও করতে শুনেছি তাঁকে। উনি অন্ধ তাই বুঝতে পারতেন না যে আমি তাঁর আশপাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছি।

ইন্দ্র বলল, জার্মানী থেকে ওঁর এক বন্ধু ওঁকে সবকিছু জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন।

ললিতা বলল, বাবা অন্ধ হয়ে যাবার আগে সে চিঠি এসেছিল। আমি ছেঁড়া চিঠির সামান্য একটুখানি টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন সেইটুকু থেকে কোন সত্যে পৌঁছুতে পারিনি। কেবল ঐ মানুষটার নামের একটা উল্লেখ দেখেছিলাম।

ইন্দ্র বলল, আমি জানি না আপনাকে আজ একথা বলে আমি ভুল করলাম কিনা। আপনি আপনার স্বামীর স্মৃতি দিয়ে যে পবিত্র একটা শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন তা ভেঙে দিতে গিয়ে আমি হয়ত-আপনার জীবনে অনেকখানি অশান্তি ডেকে আনলাম।

ললিতা বলল, আজ সত্যিকার যদি কোন বন্ধু আমার থেকে থাকে তাহলে সে আপনি। সারাজীবন যে ভুলটা বয়ে বেড়াতাম তাকে আপনি সত্যিকার বন্ধুর মত শুধরে দিলেন।

ইন্দ্র বলল, ললিতা আপনার ভাগ্যের কথা ভেবে সত্যিই আমি দুঃখিত।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না ললিতা। নীচের ঠোঁটে বুড়ো আঙুলটা ঠেকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় ইন্দ্রের চোখে চোখ রেখে বলল, কিছুদিন আগে আমি এর্নাকুলম গিয়েছিলাম সেখানে একটা ছবি দেখেছিলাম। ছবিটা এসেছিল 'কবিতা' সিনেমায়। ছবির নাম 'সান ফ্লাওয়ার'। ছবি দেখে আসার পর রাতের বিছানা আমার চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। আজ ভাবছি সে ছবির সঙ্গে আমার জীবনের যেন কোথায় একটা মিল আছে। অবশ্য সে ছবির নায়কের ভেতর কোন প্রতারণা ছিল না।

ইন্দ্র বলল, বেশ কিছুদিন আগে আমিও সে ছবি দেখেছি। পরিস্থিতিই নায়ককে বাধ্য করেছিল বিদেশে নতুন সংসার রচনা করতে।

ললিতা বলল, জানেন আমি পাগলের মত তুল্লির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। ডাক্তার নায়ারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য খুঁজতাম ওর ভেতর। একটুখানি মিল খুঁজে পেলেই আনন্দে অধীর হতাম। এখন ওর ভেতর ঐসব মিল দেখলে হয়ত আমার ভয় করবে। আমি ওকে আর তেমন করে আদর··· বলতে বলতে বন্ধ হয়ে এল ললিতার গলা। সে নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগকে বুকে চেপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্র বসে বসে ভাবতে লাগল, একটা নিরপরাধ শিশুকে কি করে অস্বীকার করতে পারল লোকটা। আর নারী হিসেবে ললিতা যে কোন পুরুষেরই চোখে পড়ার মত। এমন একটি কাম্য তরুণীকে বেমালুম ভুলে যাবার ভেতর আর যা থাক ডাক্তার নায়ারের রুচির পরিচয় ছিল না।

অনেকখানি সময় ঘরের ভেতর একা একা কাটিয়ে যখন বাইরে যাবার জন্যে ইন্দ্র উঠবে কিনা ভাবছে ঠিক সেই সময় ললিতাকে ঘরের দরজার সামনে দেখা গেল।

ললিতার মুখে শোকের কোন চিহ্ন ছিল না। সে হাতের ইশারায় ইন্দ্রকে

ডাকল। ইন্দ্র ললিতার দিকে এগিয়ে যেতেই ললিতা পেছন ফিরে চলতে শুরু করল। ইন্দ্র তাকে অনুসরণ করে চলল।

প্রশস্ত কেটেজের ভগ্নপ্রায় করিডোর পেরিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল ঘরের পেছনে নারকেল বাগানের সামনে।

ললিতার প্রসারিত আঙুলটিকে অনুসরণ করে ইন্দ্রের চোখ এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে গেল।

আকর্ষণীয় ছবি। নারকেল গাছের তলায় প্রথম অপরাহ্নের আলোছায়ার বিছানায় শুয়ে অলস মন্থর ভঙ্গীতে জাবর কাটছে ললিতাদের গাইগরুটি। আর ঠিক তার কোলের কাছটিতে নিশ্চিন্ত আরামে মাথা রেখে মুখ গুঁজে অকাতরে ঘুমুচ্ছে দুটি অবোধ শিশু। একটি পশু শিশু অন্যটি মানবশিশু। তুল্লির কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুজন। কতক্ষণ ওরা চেয়ে রইল ওর দিকে।

ইন্দ্র বলল, শিশুর কোন জাত নেই ললিতা, শিশু তাই সবার প্রিয়। আর তুল্লির তো কোন তুলনাই নেই। ও এক অসাধারণ শিশু।

ললিতা বলল, জানেন কিছুদিন আগে এক আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাচ্ছিলাম। তুল্লি তার আদরের পুতুলটাকে সঙ্গে নেবেই। কোন বারণেই কান দিল না। বুকে চেপে ট্রেনে উঠল। আমি পথে যেতে যেতে সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলো ওকে দেখাতে লাগলাম। ঐ দেখ তুল্লি কায়েলের জল কেটে কেটে একটা ভাল্লম চলেছে সাদা পাল তুলে দিয়ে! ঐ যে পাহাড়টা কেমন ধাপে ধাপে নেমে এসেছে।

এমনি অনেক কথা বলতে বলতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কানে কয়েকটা শব্দ এসে বাজতেই জেগে উঠলাম। আড়চোখে দেখলাম তুল্লি তার পুতুলটাকে ট্রেনের জানালার ধারে চেপে ধরেছে আর সমানে বকবক করে চলেছে। ঐ যে দেখ দেখ কত বড় পাখী ডানা মেলে উড়ছে। ঐ যে জাহাজ চলেছে জলের ওপর দিয়ে। বড় হলে তোমাকে ঐ জাহাজে করে বেড়াতে নিয়ে যাব।

যেই লঞ্চের একটা বাঁশি তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে বেজে উঠল অমনি দারুণ ভয় পেয়ে তুল্লি পুতুলটাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরল।

জানতাম হঠাৎ কোন আওয়াজে তুল্লি ভীষণরকম চমকে ওঠে। আর আমি ওকে তখন অভয় দিয়ে বলতাম, ভয় কি তুল্লি তুমি আমার কত সাহসী মেয়ে।

পুতুলটাকে বুক থেকে কোলে নামিয়ে নিয়ে সেদিন তুল্লিকে বলতে শুনলাম, বোকা মেয়ে ভয় পেতে নেই। তুমি না কত সাহসী মেয়ে।

ইন্দ্র বলল, সত্যি আপনার তুল্লির জুড়ি নেই। ওর তুলনা ও নিজেই।

ইতিমধ্যে গরুটা গা ঝাড়া দিতেই তুল্লির মাথাটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। ভাগ্যিস আঘাত লাগেনি তাই অবাক চোখে শুধু চেয়ে রইল তুল্লি, কোনরকম চেঁচামেচি করল না।

ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে তার চাওড়া বুকের ভেতর তুলে নিল তুল্লিকে। অনেক আদরে ভরে দিতে দিতে তাকে নিয়ে চলল বাইরের প্রাঙ্গণে। ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় কতক্ষণ তুল্লির কচি নরম আঙুলগুলো ধরে ঘুরে বেড়াল। তার অজস্র বকবকানি শুনল। তাকে শোনাল অনেক টুকরো টুকরো মজাদার গল্প। অদ্ভুত অদ্ভুত এমন সব প্রশ্নের জবাব দিতে হল যা কোন অর্থ পুস্তক প্রণেতার প্রশ্নোত্তরে পাওয়া যায় না।

সম্মানীয় অতিথির অভ্যর্থনার কোন ক্রুটি রাখল না ললিতা। সন্ধ্যে থেকেই নানারকম ভোজ্য আর পানীয়ের আমদানি হল। একসময় ইন্দ্রকে বলতে হল, রাতের খাবারের তাহলে ইতি হোক এখানেই।

সে কি! ললিতার গলায় বিস্ময়, আমাকে তাহলে যে অতিথি আপ্যায়নের ক্রুটির দায়ে পড়তে হবে।

ইন্দ্র বলল, বিচারকদের এজলাসে অতিথি যদি কেস না তোলে তাহলে ভয় কি?

আপনি তো অভয় দিলেন কিন্তু আমি নিজের কাছে কি কৈফিয়ৎ দি।

তাই বলুন, না খাওয়াতে পারলে আপনারই শান্তি নেই।

ললিতা হেসে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, আর খেয়ে যত আপনার অশান্তি তাই না?

রাতে বড একটা ক্ষিদে না থাকলেও খেতে বসতে হল ইন্দ্রকে। রাত দশটায় তেমনি অভুক্ত অতিথিদের ডাক দিল ললিতা। কেউ যখন এল না তখন ইন্দ্রকে আসন পেতে খেতে দিল।

ইন্দ্র বলল, তুল্লিকে কি ঘুম পাড়িয়ে এলেন?

একটু দূরে বসে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল ললিতা।

তাহলে নিযে আসুন আপনার খাবার, একই সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।

ইন্দ্রের পীড়াপীড়িতে একটু দূরে আর একটা আসন পেতে নিজের খাবার নিয়ে এসে বসল ললিতা।

ইন্দ্র অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছে ললিতা যেন বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। তার আচার-আচরণে আগের মত সংকোচ বা দ্বিধা নেই। মনের ওপর থেকে দীর্ঘদিনের একটা গুরুভার নেমে গিয়ে সে যেন মুক্তি আর স্বস্তি দুটোই পেয়েছে। স্বামীর ধ্যানে মিথ্যা যে আনন্দটাকে পাচ্ছিল সে, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়াতে যতটুকু আঘাত পেয়েছে তার অনেক বেশী মুক্তির সুখ পাচ্ছে সে এখন।

ললিতা যেন ফিরে পেয়েছে তার কুমারী জীবন। পিতার গৃহে সে এখন থেকে নেবে চঞ্চলা একটি মেয়ের ভূমিকা। তুল্লি যেন তার খেলার পুতুল। তাকে নাওয়ানো খাওয়ানো গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো এই হবে তার সারাদিনের কাজ।

ইন্দ্র বলল, রান্না করলেন এতগুলি পদ কিন্তু নিজের পাতে নিলেন না তো কিছুই। সবই তো দেখছি উজাড় করে দিলেন অতিথির পাতে।

ললিতা বলল, জানেন নিজেকে উইডো বলে ভেবেছিলাম যখন তখন সেরকম করে পোষাক পরেছি খাবারও খেয়েছি। এখন আর আমার সে সব সংস্কার নেই তবু অনেকদিনের অনভ্যাসে আমিষ খাবার প্রবৃত্তিটা হারিয়েছি। আর সাদা পোশাক পড়তে আমি সব সময়েই পছন্দ করি, তাই সাদার ওপর গোল্ডেন একটা পাড় বসিয়ে নিলেই চলবে। ওতেই আমার বৈধব্যের বেশটা পাল্টে যাবে।

ইন্দ্র বলতে চাইল তাহলে নতুন করে এবার আর একটি সংসার গড়ে তুলুন। কথাটা কিন্তু ইন্দ্রের মুখ দিয়ে বেরুল না। সে শুধু বলল, পাঁচ বছরের অভ্যেস কি একদিনে ঝেড়ে মুছে ফেলা যায়।

কিছুক্ষণ ওরা কোন কথা না বলে খেতে লাগল। হঠাৎ একসময় ইন্দ্রের দিকে চেয়ে ললিতা বলল, আপনি আমার বন্ধুর ঘনিষ্ঠজন তাই আপনাকে কতকগুলো হাল্কা প্রশ্ন করলে নিশ্চয় কোন কিছু মনে করবেন না।

ইন্দ্র খাওয়া থামিয়ে বলল, মেনন পরিবারের সঙ্গে আমার এমপ্লয়ার এমপ্লয়ীর সম্পর্ক। সরিতার কাছ থেকে যদি কোন ভালবাসা পেয়ে থাকি তাহলে সেটা আমার পাওনার অতিরিক্ত বলে আমি মনে করি।

ললিতা বলল, সরিতার কথা থেকে মনে হল সে আপনার দারুণ গুণগ্রাহী। ভক্তও বলতে পারেন।

ইন্দ্র বলল, অতটা বাড়িয়ে বলবেন না। ওতে আমার বিপদ ঘটতে পারে চাকরী রক্ষা দায় হয়ে উঠবে। তবে মিথ্যে বলে লাভ নেই, আপনার বান্ধবী আমাকে সুনজরে দেখেন।

ললিতা হেসে বলল, আপনি নজর কেড়ে নিয়েছেন বলুন।

ইন্দ্র ললিতার হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, নজর কেড়ে নেবার মত কোন যোগ্যতাই আমার নেই। আপনার বান্ধবী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ওপর একটু কৃপার দৃষ্টি ফেলে থাকেন।

ললিতা বলল, আপনি কিন্তু বন্ধু হিসেবে বেশ নির্ভরযোগ্য।

ইন্দ্র বলল, ঐ ধরনের কমপ্লিমেণ্ট দেবার কারণটা জানতে পারি কি ?

মনের কথাকে কেমন চেপে রাখতে পারেন, বলল ললিতা।

ইন্দ্র হঠাৎ বলে বসল, মনের সব কথাকেই কি আর খোলাখুলি বলা যায়, আপনিই বলুন ? কোন মানুষের ভেতরের মনটাকে যদি দেখা যেত তাহলে তার চেয়ে বড় বিস্ময় পৃথিবীতে আর কিছুই থাকত না

ললিতা কি ভেবে বলল, সত্যি।

ইন্দ্র বলল, আজ চাঁদ উঠবে কখন ?

ললিতা ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, কাল রাতে ঘুমুতে যাবার আগে চাঁদ পেয়েছিলেন, আজ আপনার স্বপ্নের ভেতর চাঁদ উঠবে।

যদি জেগে থেকে চাঁদের প্রতীক্ষা করি তাহলে কি চাঁদ উঠবে না ?

ললিতা হেসে বলল, কাল অব্দি জেগে কাটিয়ে দিন, পূর্ণিমার চাঁদের উদয় আপনার ঘরেই হবে।

ইন্দ্র বলল, ওটি আমার অমাবস্যার চাঁদ।

ফোঁস করে উঠল ললিতা, কেন আমার বান্ধবী কি এতই কালো ?

ইন্দ্র বলল, আপনার কিংবা প্রেমার কাছে না দাঁড়ালে শ্যামলী বলা যায়।

ললিতা বলল, মনে হচ্ছে কিছু উদ্দেশ্য আছে।

ইন্দ্র বলল, এ কথা কেন ?

এই যে আমার রঙের তারিফ করে বসলেন।

আপনার প্রশংসা শুরু করলে তো আর শেষ করা যাবে না। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল অব্দি একটি একটি শ্লোক লিখে বর্ণনা করতে হবে।

ললিতা বলল, কপাল আমার, এমন একজন কবিকে কাছে পেয়েও চিরদিনের করে ধরে রাখতে পারলাম না।

কথাটা শেষ করেই ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ইন্দ্রের কিন্তু ললিতার শেষ কথাটায় কেমন এক ধরনের ঘোর লাগল। কি বলতে চায় ললিতা ? কবিকে ধরে রাখতে পারল না বলে সত্যিই কি তার আক্ষেপ, না এটা উড়ো হাওয়ার মত একটা কথার কথা।

ললিতাও থেমে গিয়েছিল। সে হয়ত তলিয়ে দেখছিল হঠাৎ বলা কথাটার গুরুত্ব।

এরপর খাওয়ার পর্ব ঢুকল। একটা কম পাওয়ারের বাল্ব সন্ধ্যে থেকে জ্বলছিল ভেতরের বারান্দায়। তার খানিকটা অনুজ্জ্বল ছটা ভেতরের উঠোনটাকে কোনরকমে অন্ধকারের গ্রাস থেকে বাঁচাচ্ছিল। ধারে কাছে ওঁৎ পেতে ছিল অন্ধকার। সুইচটা অফ হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে উঠোনের ওপর।

ললিতা রান্নাঘরের ভেতর কি কাজে যেন ঢুকতে গিয়ে বলল, আপনি উঠোনে বসুন গিয়ে, আমি এই আসছি।

ইন্দ্র উঠোনে নেমে দেখল পাশাপাশি দুটো বেতের চেয়ার পাতা। গত রাতে মিঃ পিল্লাই আর সে ঐ দুটো চেয়ারে বসেছিল। পিল্লাই বলছিলেন তাঁর মেয়ে জামাইয়ের কাহিনী। প্রায় অপরিচিত একটি যুবকের কাছে হৃদয় উজাড় করে কথাগুলো বলে যেতে কোন দ্বিধা আসেনি তাঁর। কি পরিমাণ ভার তিনি বুকের ভেতর অনুভব করছিলেন, যে কারণে পারিবারিক জীবনের গোপন কথাগুলো আর একটি হৃদয়ের কাছে বলে বেশ খানিকটা লঘু হতে চেয়েছিলেন।

ইন্দ্র লক্ষ্য করে দেখেছে, এ দেশের নারীপুরুষের ভেতর মেলামেশার ব্যাপারে যেমন দ্বিধা নেই, তেমনি মনের কথাকে উজাড় করে দিতে কার্পণ্যও নেই।

ইন্দ্র একটা চেয়ারে বসল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল নক্ষত্ররা অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তারই মত নির্নিমেষ চেয়ে আছে। পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়নি তখনও এরা অনাগত কোন কিছুর আবির্ভাবকে দেখবে বলে চেয়েছিল। রহস্যের কুহেলি ঢাকা তরুণী পৃথিবী ধীরে ধীরে যখন ঘোমটা খুলল তখন অপার বিস্ময় নিয়ে দেখল তাকে। তারপর একে একে ধরিত্রীর গর্ভ থেকে জন্ম নিল জল, স্থল, প্রকৃতির নানা বৈভব বৈচিত্র্য। সেই সমান ঔৎসুক্য নিয়ে নক্ষত্রেরা চেয়ে দেখল সৃষ্টির এক একটি পরিণতি, বিবর্তন। এখনও তারা চেয়ে আছে পৃথিবীর নতুন নতুন রহস্যকে দেখবে বলে।

ইন্দ্রের হঠাৎ মনে হল, এক তরুণী যাদুকরী যেন এক একটি করে বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখিয়ে চলেছে, আর সারা নক্ষত্রলোক অবাক চোখে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে। আশ্চর্য এই তরুণীর খেলা যার কোন রহস্যই তারা ভেদ করতে পারছে না।

ললিতা পাশে এসে দাঁড়াতেই চমক ভাঙল ইন্দ্রের। ললিতা তার দিকে

ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখে কোন কথা নেই। ঠিক যেন রহস্যময়ী তরুণী যাদুকরী।

ইন্দ্র অস্পষ্ট আলোয় দেখল, ললিতা মুঠি ভরে কিছু যেন এনেছে তার জন্যে। সে মুঠি সমেত ললিতার হাতখানা তার চওড়া ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরল।

ললিতা বলল, বাব্বাঃ, হীরে মণিমাণিক্য নেই ওতে, ছাড়ুন, ছাড়ুন, দেখাচ্ছি।

ইন্দ্র হাত ছেড়ে দিয়ে চেয়ে রইল ললিতার দিকে। ললিতা কপট ক্ষোভে বলল, না দেখাব না।

ইন্দ্র বলল, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময় কথা দিয়েছিলেন দেখাবেন।

ললিতা বলল, জানেন তো, গল্পের শেয়াল কুমীরের কামড় থেকে পাখানাকে বাঁচাবে বলে নিজের পাকে লাঠি বলেছিল। আমিও বাঘের থাবা থেকে হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিলাম কৌশলে।

কিন্তু আপনি মিথ্যের দায়ে পড়লেন।

ললিতা মুখখানা দোলাতে দোলাতে বলল, না মশায়, প্রাণে বাঁচতে মিথ্যের আশ্রয় নেওয়াটা কোন অন্যায় নয়।

ইন্দ্র মুখ নীচু করে বসে রইল।

ললিতা ইন্দ্রের মুখের অনেক কাছে সরে এসে বলল, আহা বান্ধবীর বন্ধু আপনি, আপনার সঙ্গে এমন ছলনাটা করা ঠিক হয়নি। বান্ধবী শুনলেই বা কি বলবে। এখন হাঁ করুন তো দেখি।

ইন্দ্র ইজি-চেয়ারে ঘাড় কাত করে একটুখানি হাঁ করল। ললিতা ইন্দ্রের মুখের ভেতর একখিলি পান ভরে দিল। তারপর বাঁ হাতের ভেতর থেকে ওদের দেশের রীতি অনুযায়ী একখণ্ড কাঁচা সুপুরী বের করে ইন্দ্রের মুখের ভেতর দিতে যেতেই ইন্দ্র দাঁত দিয়ে ললিতার আঙুল চেপে ধরল। ললিতা উঃ করে একটা আওয়াজ তুলতেই ইন্দ্র ওর আঙুল ছেড়ে দিল।

ললিতা ব্যথা পাওয়া আঙুলটা সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখে পুরে চুষতে লাগল।

ইন্দ্র বলল, ক্ষমা করবেন, আপনার কুমীরের গল্পটা মনে পড়ে গিয়েছিল।

ললিতা বলল, সরিতা আসুক আপনার কুমীরের গল্পের ডেমনোস্ট্রেশন দেওয়া বের করব।

অন্যায় যদি করে থাকি তাহলে তার শাস্তি আপনার হাতেই হোক, বান্ধবীকে আবার এর ভেতর টানা কেন!

আমি কি বলেছি, আপনি অন্যায় করেছেন? শুধু কুমীরের মত

আপনি কামড়ে ধরেছিলেন আর আমি কৌশলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি এ কথাটুকুই বলব।

ইন্দ্র বলল, কি ভীষণ নিষ্ঠুর আপনারা। মানুষকে ভয় দেখিয়েও আনন্দ পান।

ললিতা পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। ইন্দ্রের মনে হল, আবার কি নতুন খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে যাদুকরী।

ললিতা বেতের চেয়ারের চওড়া হাতলে কনুই ঠুকে অঞ্জলি করা হাতের পাতায় নাক মুখ গুঁজে বসে রইল।

কিছু পরে মুখটি কাৎ করে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, চাঁদ উঠতে এখনও প্রায় তিন কোয়ার্টার বাকী। ইচ্ছে করলে ঘুমুতে যেতে পারেন।

ইন্দ্র বলল, চাঁদকে দয়া করে জাগতে দিন আগে, তারপর ঘুমুতে যাওয়া যাবে। আপনি যান শুতে, তুল্লি একা শুয়ে রয়েছে। আমার জন্যে আপনি যদি বসে থাকেন তাহলে খুব খারাপ লাগবে।

ললিতা বলল, নিজের ইচ্ছায় যদি বসে থাকি, তাহলে খারাপ লাগবে না তো আপনার ?

ইন্দ্র হেসে উঠল, সত্যি আপনি সরিতার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। দুজনে একই স্কুলে বোধহয় কথা বলা শিখেছিলেন।

ললিতা বলল, ও কথা বলবেন না, আমার বান্ধবীর তুলনা সে নিজেই। কারো সঙ্গে তুলনা দিতে গেলে ওর কৃতিত্বকে ছোট করা হয়।

হঠাৎ ললিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন, আসছি।

ললিতা চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের আবছায়া থেকে বেরিয়ে এল কতকগুলো ভাবনার জোনাকী। ওরা চুমকীর পোষাক পরে ইন্দ্রের চারদিকে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ললিতা চার্মিং। ললিতা দারুণ সরস। একটা জীবনকে ভরে দেবার মত যথেষ্ট কোয়ালিটির সঞ্চয় আছে ওর ভেতর। রূপোলী মাছের মত ও জল কেটে কেটে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ একটা ঘূর্ণির পাকে পড়ে কিছু সময়ের জন্যে জলের অন্ধকার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। এখন আবার উঠে এসেছে অনেক ওপরে। কাচের মত স্বচ্ছ জলের ভেতর দেহের ঝিলিক তুলে তুলে খেলা করছে।

অনেকখানি সময় পার করে উঠোনে ইন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়াল ললিতা।

যাবেন এক জায়গায় ?

কোথায় ?

চাঁদ দেখতে।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চাঁদ উঠেছে বুঝি, চলুন দেখি।

ললিতা বারান্দার বাতিটা নেভাতে গিয়েও নেভাল না। সে করিডোরের ভেতর দিয়ে পেছনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। হাত দিয়ে ঠেলে দিতেই দরজার পাল্লা বাইরের দিকে খুলে গেল। ইন্দ্র দেখল অন্ধকার তখনও জমে আছে। ললিতা যে আগে থেকে দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিল সেকথা তার মনে হল। ললিতা কি তাহলে একরকম ধরেই নিয়েছিল যে তাকে ডাকলেই সে চলে আসবে।

ললিতার সঙ্গে ও বাইরে এসে দাঁড়াল। ললিতা দরজাটা ভেজিয়ে বাইরের থেকে তালা দিয়ে দিলে। ইন্দ্রের দিকে ফিরে বলল, আপনি আমার হাত ধরুন। সামনের জংলা রাস্তাটা অন্ধকারে চিনে পেরোতে পারবেন না।

ইন্দ্র ললিতার হাত ধরে অন্ধের মত তাকে অনুসরণ করে চলল।

এক সময় ললিতার পথ চলার নির্দেশ থেমে যেতেই ইন্দ্র নীচের দিক থেকে চোখ তুলে সামনে তাকাল। বোঝা গেল একটা ক্যানেলের ধারে ওরা এসে পৌঁছেছে। এতক্ষণ গাছপালার জটিল জটাজালের ভেতর অন্ধকার বড় বেশী প্রশ্রয় পেয়েছিল, এখন মনে হল, ধুলোমাখা একটা কাচের ভেতর দিয়ে যেমন সব কিছু আবছাভাবে দেখা যায় ঠিক তেমনি চারদিকটা দেখা যাচ্ছে। ক্যানেলের ওপারে নারকেল গাছের অজস্র সমাবেশ। তার ওপারে দিগ্‌বলয়ের একটি বিশেষ জায়গার আকাশে হালকা একটা আলো ফুটে উঠেছে।

ললিতা বলল, আসুন এই গাছের তলাটায় বসা যাক। বালিমাটি জমে শক্ত হয়ে আছে।

ওরা পাশাপাশি বসে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল। লাল চাঁদটা দূর-দিগন্তরেখা থেকে ওপরে উঠছে। গাছের ফাঁকে ললিতা দেখতে পেলেও ইন্দ্র শুধু বনের মাথায় দেখছে তার জেগে ওঠার দীপ্তিটুকু।

ঐ যে চাঁদ, দেখতে পাচ্ছেন?—নারকেল বাগানের দিকে আঙুল তুলে দেখাল ললিতা।

ইন্দ্র এদিক ওদিক মাথা নাড়তে লাগল।

ললিতা অসঙ্কোচে ইন্দ্রের মাথাটা টেনে আনল নিজের দিকে। বাঁ হাতে মাথাটা বেষ্টন করে ডান হাত তুলে দেখাল চাঁদের উদয়। হৃদপিণ্ডের মত রক্তাভ চাঁদ নারকেলের দীর্ঘ শাখার ফাঁকে আটকে আছে।

ইন্দ্রের মনে হল কৃষ্ণবর্ণের লৌহশলাকার মত নারকেল পাতায় কার যেন হৃদপিণ্ড বিদ্ধ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই চাঁদের রঙ পাল্টে গেল। লাল থেকে হলুদ আবার হলুদ থেকে সাদায় রূপান্তরিত হল চাঁদ। নারকেল বনের মাথায় জেগে ওঠা চাঁদ ক্যানেলের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল। যত আঘাত তত জ্বলে ওঠা। কিছু সময়ের ভেতরেই পটটা একেবারে পাল্টে গেল। চারদিকে চাঁদের আলোয় পাতলা দুধের তরঙ্গ বইতে লাগল।

ইন্দ্র আর ললিতা আশঙ্কাজনক সান্নিধ্যে বসে চাঁদ দেখছে। ললিতার স্তন আবৃত করে কটি পর্যন্ত নেমে এসেছে সাদা নেরিয়দ। ইন্দ্র দেখছে নেরিয়দের সোনালী পাড় যুবতীর পূর্ণ যৌবনের মত জ্বলে আছে। রাতের খাবার আসনে ললিতার দেহে ছিল আগের বৈধব্য বেশ। এখানে আসার সময় ললিতা তার পাঁচ বছরের পরিত্যক্ত সুখীজীবনের পোষাকটা নতুন করে বুকে জড়িয়ে নিয়েছে।

ললিতা বলল, চাঁদ চাঁদ করে পাগল হয়ে উঠেছিলেন এখন দেখুন চাঁদ। বিয়ের আগে প্রায়ই এখানে পালিয়ে এসে একা বসে আমি চাঁদ দেখতাম।

ইন্দ্র কোন কথা না বলে চেয়ে রইল পূর্বদিকে। নারকেলের তরঙ্গিত অরণ্য এখনও আদিম রহস্যে ভরা। অদূরে সমুদ্রের আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর চাপা কান্না গুমরে গুমরে উঠছে। চাঁদ তার সব কটি রূপোলী অলঙ্কারে সাজিয়ে দিয়েছে তরুণী তরঙ্গিনীকে। ইন্দ্র আর ললিতা বসে আছে পাশাপাশি।

এই ধরণের মুহূর্তগুলো যখন আসে তখন বর্তমান পেছন ফিরে দাঁড়ায়। তারপর যাদুর পাদুকা পরে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই পৌঁছে যায় আদিম অতীতে। সেখানে বিশ্বের প্রথম মানব মানবী পাশাপাশি বসে বিহ্বল চোখে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে।

ললিতার মুখে ইন্দ্র সেই আদি মানবীর আদল দেখে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

বিছানার বালিশে মাথা রেখে শুতে গিয়ে ইন্দ্র একটা সুন্দর গন্ধ পেল। কোন একটা ফুলের গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরের দরজার ছিটকিনি বন্ধ করার শব্দ শুনল সে। দুটো শোবার ঘর পাশাপাশি। মাঝে পুরনো দিনের গরাদ দেওয়া একটা বড় জানালা, বাইরের ঘরে বয়ে আসা হাওয়া যাতে ভেতরের ঘরেও খেলতে পারে তারই ব্যবস্থা। জানালায় কোন পর্দা ছিল না। এ ঘরে

গত রাতে শোয়নি ইন্দ্র। সম্ভবতঃ আজ মিঃ পিল্লাই নেই বলে তাঁরই শোবার ঘরে আজকের রাতে তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। একেবারে বাইরের ঘরে আজ তাকে শুতে পাঠিয়ে দিতে ললিতার বোধহয় বাধ বাধ ঠেকেছে।

ইন্দ্র আড় চোখে দেখল, পূবের জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্নার যে ফেনাটুকু ঘরের অন্ধকারে গড়িয়ে পড়েছে তাতে ঘরের ভেতরের সবকিছু চেনা যাচ্ছে।

ললিতা শরীরটাকে শিল্পীর মডেলের মত নানা ভঙ্গীতে ভেঙে ভেঙে শুয়ে পড়ল। পাতলা একখানা চাদর পায়ের ওপর থেকে টেনে নিল বুক অব্দি। ডান হাতখানা ঘুমন্ত তুল্লির ওপর একবার রাখল। কি মনে করে পাশ ফিরে তুল্লিকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করল। তুল্লির নড়নচড়ন নেই। ঘুমে একেবারে ন্যাতা হয়ে পড়ে আছে। আধ-বসার ভঙ্গীতে উঠে তুল্লির গায়ের চাদর ভাল করে টেনে দিয়ে ললিতা আবার শুয়ে পড়ল। কনুই ভাঙা হাতখানা পড়ে রইল কপালের ওপর।

বাইরের এক ঝলক হাওয়ায় গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। ইন্দ্র বুঝল ভিকটোরিয়া রোজের গন্ধ। কিন্তু ফুলটা কোথায়। মনে হল বালিশের ভেতর থেকে যেন গন্ধটা আসছে।

ইন্দ্র গন্ধের উৎসের খোঁজে উঠে বসল। খাটের পাশে হাত বাড়াতে গিয়ে হাতে ঠেকল একগুচ্ছ গোলাপ। টিপয়ের ওপর ফুলদানীতে সাজান। মুখটাকে গোলাপ গুচ্ছের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকল। খাটের লেভেলের খানিকটা নীচে রাখা অথচ দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যে গন্ধটা ভেসে আসে। ইন্দ্র পরিকল্পনা-কারিণীর প্রশংসা করল মনে মনে।

শুতে গিয়ে হাতে ঠেকল আর একটি গোলাপ। বালিশের ঢাকার এক কোণায় ক্লিপ দিয়ে আটকানো। তরতাজা গোলাপটা হাতে নিয়ে ইন্দ্র আর ঘুমোতে পারল না। সে শুয়ে শুয়ে গোলাপটার গন্ধ নিতে লাগল।

ইন্দ্রের মনে হল গোলাপটা যেন এক তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পিঙ্ক রঙের শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে যৌবনের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। ঠিক যেন ফুটন্ত গোলাপের পাপড়ির সুষমা।

ইন্দ্র উঠে বসল। কি মনে করে জানালার ফাঁকে ছুঁড়ে দিল গোলাপটা। অমনি অব্যর্থ লক্ষ্যে ফুলটা এসে পড়ল ললিতার বুকের ওপর।

ললিতা কি ঘুমোয় নি। কপালের ওপর ফেলে রাখা হাতটা সরে গেল তার। বাঁ হাতের কনুইতে ভর দিয়ে মাথাটা তুলে আধশোয়ার ভঙ্গীতে পাশ

ফিরল ললিতা। ইন্দ্র দেখল বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া গোলাপটা তুলে নিয়ে উঠে বসল সে।

চুলগুলো খুলে গেছে ললিতার। চরাচরের অন্ধকার যেন ঘন হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওর কালো চুলের গভীরে।

ললিতা কোন দিকে তাকাল না। সে জানালার দিকে পাশ ফিরে আবার শুয়ে পড়ল। ইন্দ্র দেখল অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর মাঝে ফুলের বোঁটাটি ধরে অন্য মনে ললিতা দোলাচ্ছে।

কত রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কেটে গেল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত শরীরের রক্তস্রোত আছড়ে পড়ল বুকের বেলাভূমিতে, তবু কোন প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল না।

কতক্ষণ এমনি কেটে যাবার পর স্থির নিশ্চল ললিতার দিকে চেয়ে ইন্দ্রের মনে হল ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছে।

তখনও ইন্দ্রের খেলার সখ মেটে নি। সে একটি একটি করে গোলাপ ফুলদানী থেকে তুলে নিয়ে ললিতার বিছানায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল।

ললিতা ঘুমিয়ে আছে মনে করে তার শরীরটাকে লক্ষ্য করে আর ফুল ছুঁড়ল না। ভোরে উঠে ললিতা দেখুক সে ফুলের বিছানায় শুয়ে আছে।

সব কটা ফুল ললিতাকে উপহার দিয়ে সে দারুণ খুশী হয়ে উঠল। যা ভাবে ভাবুক ললিতা। বালিশের ঢাকায় ক্লিপ দিয়ে যদি ললিতা ফুল উপহার দিতে পারে তাহলে সে কেনই বা অভিযুক্ত হবে গোলাপের খেলা খেলতে গিয়ে।

অনেক রকম এলোমেলো ভাবনা আর উত্তেজনার ভেতর কখন চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল ইন্দ্রের।

রাত কত ঠিকানা নেই। ইন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল সমুদ্র থেকে বয়ে আসা এক ঝলক দমকা হাওয়ায়। সে উড়ে যাওয়া চাদরখানা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দেখল ললিতা দাঁড়িয়ে আছে দুটো ঘরের মাঝের জানালার রেলিং ধরে। চেয়ে আছে তারই দিকে। শ্যাম্পু করা চুলগুলো প্রপাতের মত নেমে গেছে পিঠ পেরিয়ে নিতম্বের দিকে। কতকগুলো এলো চুল কাঁধের ওপর দিয়ে উছলে নেমে এসেছে বুকের দুটো নিটোল শিলাস্তূপের গা বেয়ে।

বাইরে চাঁদের আলোয় এখন যৌবনের জোয়ার। তার একফালি সাদা আঁচল জানালার ফাঁকে লুটিয়ে পড়েছে ললিতার ঘরের ভেতর। ললিতা এখন আর অস্পষ্ট নয়।

ইন্দ্রকে জাগতে দেখে ললিতা চোখের দৃষ্টি মেঝের ওপর নামিয়ে নিল।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল। সে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। একপাশে মুখখানা ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ললিতা।

ইন্দ্র জানালার একেবারে কাছে মুখ এনে ডাকল, ললিতা!

তার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে গেল।

ললিতা এখন তার রহস্যময় চোখের গভীর থেকে চেয়ে আছে ইন্দ্রের দিকে।

ইন্দ্র উত্তেজনায় কাঁপছিল। সে তার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ডাকল, ললিতা।

লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ললিতা তার দুটো হাত বাড়িয়ে দিল ইন্দ্রের দিকে।

ইন্দ্র দেখল ললিতার অঞ্জলি করা দুটো হাতে তারই ছুঁড়ে দেওয়া গোলাপ।

ইন্দ্র ফুল সমেত ললিতার দুটো হাত নিজের হাতের পাতায় চেপে ধরল। অজস্র চুমুতে ভরে দিল ললিতার হাত।

ললিতা হাত সরিয়ে নিল না। কোন কথাও বলল না। শুধু পলকহীন দুটো চোখ মেলে চেয়ে রইল।

ইন্দ্র ললিতার হাত নিজের বুকের কাছে টেনে এনে তাকাল তার দিকে।

সাদা নেরিয়দখানা বুকের ওপর কৌশলে বাঁধা। নাইটির মত সে কাপড় দেহ আবৃত করে নেমে এসেছে পা অব্দি। ললিতা দাঁড়িয়ে আছে না কোন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের তৈরী শ্বেত পাথরের একটি নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তা বোঝা গেল না।

ইন্দ্র ললিতার হাত শিথিল করে দিতেই ওর হাত থেকে সব কটা ফুল ইন্দ্রের ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

ইন্দ্র ফুল কুড়োনোর খেলা খেলল না। একটা পাহাড়ের মাথায় জমে থাকা সাদা বরফের স্তূপকে নিয়ে সূর্য যেমন গলিয়ে ঝরিয়ে দেবার খেলা খেলে ইন্দ্রের ভেতর থেকে একটা দুরন্ত উত্তাপ তেমনি সামনের শ্বেত মূর্তিটাকে ঝরিয়ে দিতে চাইল।

ইন্দ্র দুটো হাত বাড়িয়ে ধরল ললিতার মোমের মত মসৃণ মুখখানা। কিন্তু নিজের মুখ নিয়ে যেতে পারল না সেই দূরত্বে যেখানে ললিতা নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে একটা বিপন্মুক্ত ব্যবধানে। সে কিন্তু চেয়ে আছে তেমনি স্থির চোখ মেলে। ইন্দ্রের হাতের পাতায় ধরা তার মুখখানা।

এক সময় ইন্দ্রের আকুতি-ভরা চোখ যখন আছড়ে পড়ল ললিতার বদ্ধ ঘরের

দরজার ওপর তখন নিজের হাত দিয়ে ইন্দ্রের হাতখানা চেপে ধরে বলল ললিতা, প্লিজ ইন্দ্র আমাকে তুমি দুর্বল করে দিও না। আমি তোমাকে ফুল দিতে এসেছিলাম।

ইন্দ্র একটা চাপা শ্বাস ফেলে বলল, শুধু গোলাপ দিতে এসেছিলে আর কিছু নয়?

ওধার থেকে ললিতা বলল, মিথ্যে বলব না তোমাকে ভাললেগেছিল।

তাহলে ললিতা?

সব তো হলের জবাব নেই ইন্দ্র।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্র বলল, যদি তোমাকে স্পর্শ করে অন্যায় করে থাকি তাহলে…।

ইন্দ্রের হাত শিথিল হল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত শক্ত করে বুকের কাছে তুলে ঠোঁটে চেপে ধরল ললিতা।

বলল, আমার বন্ধু ইন্দ্র। আজ থেকে দুজনের দুঃখ আমরা দুজনে বোঝার চেষ্টা করব। অনেক দূরে চলে গেলেও আমরা বন্ধু। অনেক অদেখা দিনেও আমরা ভাবব দুজনের কথা।

ইন্দ্র বলল, আমরা দুজনের অনেকটা কাছে আসতে পারি না ললিতা? যেখানে ঘ্রাণে পাওয়া যায় দেহের আশ্চর্য এক ধরনের গন্ধ আর মনের অনেকখানি জুড়ে অদ্বিতীয় কারুর আনাগোনা।

কেন চঞ্চল করে দাও ইন্দ্র। কেন নতুন জীবনের লোভ দেখাও। আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। আর তাছাড়া আমি তো প্রতারণা করতে পারব না।

প্রতারণার কথা কেন ললিতা?

তুমি কি কোনদিন মনের থেকে ভালবাসনি সরিতাকে?

সেই মুহূর্তে কোন কথা জোগাল না ইন্দ্রের মুখে। একটু পরে নিজের দুটো হাত ললিতার হাতের বাঁধন থেকে টেনে নিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াল। জানালার ফাঁকে মুখখানা রেখে বলল, আজ এই মুহূর্তে একটা সত্য তোমাকে বলি, সরিতাকে তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসি না ললিতা, আবার তোমাকেও সরিতার চেয়ে বেশী ভালবেসে ফেলেছি একথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব না।

ললিতা বলল, তার মানে দুজনকেই তুমি ভালবাস!

জানি না ললিতা একে ভালবাসা বলে কিনা তবে এ যে ভাল লাগা, অসহ্য ভাল লাগা তা বলতে পারি। কাল সন্ধ্যায় অষ্টমুদি লেকের জলে যার পাশে বসে ভালবাসার কথা বলেছি তার সঙ্গে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা

ললিতার কোন তফাৎ আমি দেখছি না আজ। বিশ্বাস কর ললিতা আমি কাউকেই প্রতারণা করি নি।

ললিতা বলল, তোমার ভাবনার সঙ্গে আমার সংস্কারের হয়তো অনেক গরমিল আছে তবু তোমাকে ভাল না বেসে পারা যায় না ইন্দ্র। এই একটি দিনের ভেতর সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজনে এত কাছে সরে আসা সম্ভব হয়েছে শুধু তোমার চার্মিং পার্সোনালিটির জন্য।

ইন্দ্র বলল, আমার ভেতর যদি কোন আকর্ষণ তুমি খুঁজে পেয়ে থাক তাহলে তোমার ভেতরেও আছে দুরন্ত এক আকর্ষণ। একবার তোমাকে দেখলে তোমার কাছে এলে কেউ সহজে ফিরে যেতে পারবে না ললিতা। আমি নিজেকে দিয়েই এ সত্যটুকু যাচাই করে নিয়েছি।

ললিতা বলল, তা নয় ইন্দ্র, সবার চোখ সমান নয়। নায়ার আমাকে যে চোখে দেখেছিল সে চোখের সঙ্গে তোমার চোখের কোন মিল নেই। তাই সে আমাকে পেয়ে হারিয়েছে আর তুমি আমাকে না পেয়েও পেলে।

ইন্দ্র হতাশ গলায় কৌতুকের স্বরে বলল, এ যে দুয়ার বন্ধ করে বলছ ঘরের সব ধনরত্ন তোমার।

ললিতা বলল, সব ধনরত্নই তোমার তবে খোলার চাবিটা সরিতার হাতে। ও যখন ঘর খুলবে তখন তুমি দেখতে পাবে ললিতা সরিতা হয়ে গেছে। অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু তো।

খিল খিল করে হেসে উঠতে গিয়ে ঘুমন্ত তুল্লির দিকে চেয়ে দু'হাতে মুখখানা ঢেকে ফেলল ললিতা।

হাত বাড়িয়ে ললিতাকে ধরল ইন্দ্র। মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে দিতেই ইন্দ্রের হাত দুটো ভিজে উঠল ললিতার চোখের জলে।

ভোরবেলায় দরজায় মৃদু ধাক্কা দিচ্ছিল কেউ। ঘুম ভেঙে গেল ইন্দ্রের দরজা খুলে দিতেই এক ঝলক হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করল ললিতা, কি মশাই ঘুম ভাঙল না এখনও।

ইন্দ্র ম্লান হেসে বলল, অতিথি আপ্যায়ন এ হারে চললে অতিথিকে গৃহস্বামীর ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হবে।

হঠাৎ ইন্দ্রের চোখ পড়ল সামনের আঙিনায় সদ্য দেওয়া আল্পনার ওপর। ইন্দ্র বলল, এত ভোরে আল্পনাও দেওয়া হয়ে গেছে।

এ রীতি আমাদের অনেক দিনের। আমার দিদিমাকেও রোজ সকালে এমনি করে আল্পনা দিতে দেখতাম। উনি বলতেন ভোরবেলা উঠোন থেকেই অতিথি সেবা শুরু করতে হয়। সামান্য পিঁপড়েদেরও উনি অতিথি বলে মনে করতেন। চালের গুঁড়ির আল্পনা খাবার জন্যে তাদের আমন্ত্রণ জানান হত।

ইন্দ্র বলল, দারুণ আইডিয়া তো! আল্পনাকে আমরা শুধু শিল্প বলেই জানি, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে যে অতি ক্ষুদ্র অতিথিদেরও সেবা করা যায় সে ধারণা আমাদের একেবারেই নেই।

ললিতা বলল, আর কথা বাড়াব না। এখুনি ওম্‌না আসবে দুধ দুইতে। আপনার চায়ের জোগাড় দেখিগে। ছোট অতিথির খাবার দেওয়া হল এখন বড় অতিথির আহারের আয়োজন করতে হবে।

ভোরের ললিতা যেত রাতের ললিতাই নয়। রাতের রহস্যময়ী ভোরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সেবিকায়।

ললিতা ত্রস্ত পায়ে চলে গেল। একেবারে সহজ স্বাভাবিক। ভাষাতেও আর রাতের সেই অন্তরঙ্গ সম্বোধন নেই। এখন ললিতার মুখে সম্মানীয় অতিথি সম্বোধনের ভাষা।

মাজা পেতলের রঙের সূর্য ঝিলিক দিচ্ছে নারকেল গাছগুলোর পাতার ফাঁকে। লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছের আগায় আলোর সোনালী চমক। ঋতু গণনায় শীতকাল হলেও এখানকার বাতাসে থাক না শীতের কামড়। হাল্কা একখানা আলোয়ান গায়ে দিয়ে পাঞ্জাবী আর ধুতি পরে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় পায়চারী করছিল ইন্দ্র। মনের ভেতর রাতের ছবিটা ফুটে উঠলেই সে তাকে জোর করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

চেরি আচ্চন, চেরি আচ্চন—ডাক দিতে দিতে ছুটে এল তুল্লি। এসেই অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল ইন্দ্রের হাঁটুর ওপর।

পেছনে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ললিতা। কাছে এসে বলল, দেখুন তো কি মুশকিল, সবটুকু দুধ বেড়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে বসে বসে খাইয়ে এসেছে। আমি এখন কি করি।

ইন্দ্রের মুখের দিকে ভীতু ভীতু চোখ তুলে তাকাল তুল্লি। ইন্দ্রকে সে ভেবে নিয়েছে তার একমাত্র ত্রাণকর্তা।

ইন্দ্র হেসে বলল, মায়ের স্বভাব পেয়েছে মেয়ে। মা ভোরবেলা চালগুঁড়ির আল্পনা এঁকে পিঁপড়েকে খাইয়েছে, মেয়ে এখন খাওয়াল বেড়ালকে।

ললিতা বলল, চা করব এক কৌটা দুধ নেই। ওমুনা দুধ দুয়ে সকালের কাজ সেরে চলে গেছে। ওকে যে বাইরে পাঠাব তার উপায় নেই।

যদি অনুমতি করেন তাহলে দুধ সংগ্রহের চেষ্টায় বেরোই।

ললিতা বলল, কাছেপিঠে পাওয়া যাবে না। খামোকা চেষ্টা চালাবেন।

ইন্দ্র একটা ফ্লাস্ক চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে বলল, আপনি দয়া করে তুল্লিকে একা পেয়ে শাসন করবেন না যেন। যদি দুধ পাই তাহলে আসামী বেকসুর খালাস পাবে আর যদি না পাই তাহলে আপনার মর্জিমাফিক বিচার হবে।

ললিতা হেসে বলল, আপনার মত ব্যারিস্টার পেয়ে তুল্লি বর্তে গেল।

দুধ মিলল। একটি লোককে রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে দুধ দিয়ে ক্যান নিয়ে ফিরতে দেখে পাকড়াও করল ইন্দ্র। লোকটা পাশের পল্লীতে নিয়ে গেল ইন্দ্রকে। ফ্লাস্ক ভরে দুধ দিয়ে দিল।

ইন্দ্র যখন দুধ নিয়ে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল তখন সত্যি চমকে উঠেছিল ললিতা।

আপনি দুধ আনলেন!

নয়তো কি আপনি ভাবছেন পিটুলিগোলা জল।

আপনার হিম্মত আছে।

ইন্দ্র হঠাৎ বলল, হিম্মত যে নেই তার প্রমাণ কাল রাতেই তো পেয়েছেন।

ললিতা কোন কথা না বলে জলখাবারের জন্যে উপ্‌মা নেড়ে চলল।

সরিতারা এল দুপুরে। তখন সবে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্র।

ওরা সকালে আসবে এমনি একটা অনুমান সকলে করেছিল, কিন্তু পার্থসারথি মন্দিরের পুরোহিত আটকে রেখেছিলেন মিঃ পিল্লাই আর সরিতাকে। পরিচয়সূত্রে জানা গিয়েছিল সরিতার বাবার স্কুলের বন্ধু ছিলেন ঐ পুরোহিত মশাই। তাই দুপুরের খাওয়া সকাল সকাল খাইয়ে দিয়ে তবে ছেড়েছেন।

সরিতা এসে পৌঁছেই ইন্দ্রকে বলল, রেডি হয়ে নাও, এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

ইন্দ্র বলল, আমার রেডি হতে দেরী কি।

ললিতা রাতটা অনেক করে কাটিয়ে যেতে বলল সরিতাকে, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না।

সরিতা পোষাক বদলাতে ললিতার ঘরে ঢুকেছিল সেই ফাঁকে বাইরের ঘরে ইন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়াল ললিতা।

বলল, বিয়ের যেন খবরটা পাই।

ইন্দ্র বলল, তাহলে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

কেন একথা বলছেন ? সরিতা কি চিরকাল আনম্যারেড থাকবে ?

তা কেন থাকবে।

আপনি বিয়ে না করলে তাকে তো কুমারী থেকে যেতেই হবে।

একথা নিশ্চিত করে কি বলা যায় ললিতা।

ললিতা বলল, নিশ্চিত করে বলা না গেলেও আশা করব তাই। যেখানে নিজে হেরেছি সেখানে অন্যকে জিততে দেখলে বিশ্বাস করুন আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হব।

ইন্দ্র বলল, আমি জানি না সরিতা একদিন আমার জীবনে আসবে কিনা তবে কাঞ্চনাগপল্লীর একটি স্মৃতি আমি কোনদিনও ভুলব না।

ললিতা আনমনা হল। একসময় বলল, বেঁচে থাকতে কার না ইচ্ছে করে বলুন, একটি মনের ভেতর বেঁচে আছি এর চেয়ে জীবনে বড় বাঁচা আর কিছু নেই।

ইন্দ্র ললিতার হাত ধরে ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলল, আমি ভুলব না, কোনদিনও ভুলতে পারব না।

ললিতা কিন্তু আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। উদ্গত চোখের জল ইন্দ্রের কাছ থেকে গোপন করে দৌড়ে পালাল।

গাড়ীতে যেতে যেতে সরিতা বলল, বড় গম্ভীর হয়ে আছ যে ? কথা বলছ না।

ইন্দ্র বাঁকের মুখে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, ফিরে যেতে কার ভাল লাগে বল ? এই কটা অসাধারণ মুহূর্ত এমনি করে ফুরিয়ে যাবে এ যেন ভাবাই যায় না।

সরিতা হঠাৎ বলল, ললিতাকে চিরকালই জানতাম বড় শক্ত মেয়ে কিন্তু এবার আসার সময় ও এমন করে ফুলে ফুলে কাঁদল যে আমার সঙ্গে কথাই বলতে পারল না ভাল করে।

ইন্দ্রের বুকের ওপর একটা যন্ত্রণার ঢেউ দারুণ বেগে ধাক্কা দিয়ে সারা চেতনায় ছড়িয়ে পড়ল।

সরিতা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ইন্দ্রের গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে বলতো ? আম্মাওয়নের বাড়ী থেকে বেরিয়ে অব্দি মুখে কথা নেই।

ইন্দ্র বলল, এখানে না আসাই বোধ হয় ভাল ছিল সরিতা। ফিরে গিয়ে

একটুও কাজে মন বসবে না। তুমি থাকবে প্রেমার চোখের সামনে আর আমি এই দু'একটা দিনের স্মৃতি নিয়ে যন্ত্রণায় কাটাব।

সরিতা ইন্দ্রের থাই-এর ওপর হাত রেখে বলল, তুমি দারুণ সেন্টিমেণ্টাল ইন্দ্র। সবকিছুকে বেশ স্পোর্টিংলি নাও না কেন? আমরা তো আর হারিয়ে যাচ্ছি না।

একটু থেমে ইন্দ্রের হাঁটুতে চাপ দিয়ে বলল, আমরা অনেক কাছে সরে এসেছি, তাই না ইন্দ্র?

ইন্দ্র তাকাল সরিতার দিকে। মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে বলল, খুব কাছে সরে এসেছি কি? একেবারে দুজনে মিশে যাকে বলে এক হয়ে যাওয়া।

ইন্দ্রের থাই-এর ওপর তিন চারটে কীল মেরে সরিতা বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য হয়ে গেছ ইন্দ্র। মনে হচ্ছে এরপর মালিককে আর তেমন মান্য করে চলবে না।

ইন্দ্র গাড়ীতে স্পীড দিয়ে বলল, যে ডালে বসে আছি সে ডালটাই কাটব, অন্তত এমন বোকা আমাকে ভেব না সরিতা।

ইন্দ্রের বাঁ হাতে নিজের গালটা চেপে রেখে সরিতা বলল, বড় কষ্ট হচ্ছে ললিতার জন্যে, তাই না?

এমন আকস্মিকভাবে প্রশ্নটা করে ফেলল সরিতা যে হঠাৎ কোন কথা জোগাল না ইন্দ্রের মুখে। মনে হল যেন চারদিকে আগুন, পালাবার কোন পথই নেই।

ইন্দ্রকে চুপচাপ থাকতে দেখে সরিতা বলল, আমি কিচ্ছু মনে করিনি।

গাড়ীটা থামিয়ে ইন্দ্র সরিতার একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর ভরে নিয়ে বলল, তোমার কাছে অপরাধ করেছি, ক্ষমা চাইবার মুখ নেই আমার।

সরিতা খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি এমন আপসেট হয়ে পড়ছ কেন, নির্জনে ললিতার মত একটা মেয়ের কাছাকাছি এলে সহজে কারু পক্ষে ফেরা কি সম্ভব! এটুকু সাধারণ জ্ঞান আমার আছে ইন্দ্র।

ইন্দ্র কাতর গলায় বলল, তুমি যদি জানতে তাহলে এমন করে একা তার কাছে আমাকে ফেলে দিয়ে গেলে কেন?

হাসল সরিতা। বলল, একটা পরীক্ষা তো হল। পরীক্ষায় বসলে অভিজ্ঞতা হয়, ভয় ভাঙে। পাশ ফেলের প্রশ্নটা এখানে নাই বা তুললাম।

ইন্দ্র বলল, আমি চঞ্চল হয়েছিলাম সরিতা, কিন্তু এমন কিছু করিনি যাতে ফেরা যায় না।

সরিতা বলল, তুমি কতদূর এগিয়েছ আমি তো তা জিজ্ঞেস করিনি। ভালবাসার দু' একটা কথা বলতে পার আবার দেহসম্পর্কের একস্ট্রিমেও যেতে পার, ও দুটোর গুরুত্বই কিন্তু সমান। উপেক্ষা করলে দুটোকেই করতে হয়, আবার দাম দিলে দুটোই কিন্তু সমান দামী।

ইন্দ্র চুপচাপ সরিতার দিকে চেয়ে আছে দেখে সরিতা বলল, ভালবাসা একটা খেলা ইন্দ্র। কখনো হার কখনো জিৎ। খেলার ভেতর কখনো মন বসে যায়, আবার কখনো বা বারে বারে ভুলের জালে জড়াতে হয়। খেলোয়াড়কে সব সময় সব পরিস্থিতির জন্যে তৈরী থাকতে হয়।

ইন্দ্র সরিতার হাতখানা জোরে চেপে ধরে বলল, প্লিজ সরিতা, আমাকে বরং শাস্তি দাও, কিন্তু এ ধরণের নিরাসক্ত মন্তব্য করো না।

সরিতা হেসে বলল, আচ্ছা ও কথা থাক, এখন বলতো দেখি, ব্যাপারটা আমি কি করে জানলাম ?

ইন্দ্র সহজ হল, ললিতা কিছু বলে থাকবে।

তাহলে তুমি খুব বুঝেছ ললিতাকে। বিশ্বাস কর ও বিশ্বাসঘাতকতার কোন কাজই করেনি।

ইন্দ্র বলল, আর ও তোমার সঙ্গেও কোন রকম প্রতারণা করেনি। যদি ও তোমাকে ঠকাতে চাইত, তাহলে ও গতরাতে অনেকখানি এগিয়ে আসতে পারত। ও তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছে সরিতা।

সরিতা দারুণ একচোট হেসে নিয়ে বলল, ললিতা কি তোমাকে উকিল নিযুক্ত করেছে নাকি ? এতক্ষণ তার পক্ষ নিয়েই সওয়াল করে যাচ্ছ।

ইন্দ্র চুপ করে রইল দেখে সরিতা বলল, আচ্ছা তোমরা দুজনে এত বোকা কেন বলতে পার ! শোন, আমি ওর ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখলাম, ওর স্বামীর ফটোটা যেখানে থাকত, সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপর চোখ পড়ল পাশের ঘরের দিকে। বালিশের নীচ থেকে আধখানা সিগারেটের প্যাকেট উঁকি দিচ্ছে। বুঝলাম তুমি কাল রাতে আমাওয়নের ঘরেই শুয়েছিলে।

তখনই মনে হল, কিন্তু কেন, বাইরের ঘর থেকে ইন্দ্র এখানে শুতে এল কেন !

তার পরেই চোখ পড়ল, জানালার এপার ওপারে ছড়িয়ে পড়ে থাকা নানা

রঙের কতকগুলো গোলাপের ওপর। এ যে তুলির সংগ্রহ করে আনা গোলাপের খেলা নয় তা বুঝতে একটুও কষ্ট হল না। তাহলে একটিও পাপড়ি আর থাকত না আর বহু রঙের গোলাপেরও আমদানী হত না।

সবশেষে চলে আসার আগে আমার অনুমান সত্য হল, বাইরের ঘরে ললিতাকে সম্পূর্ণভাবে দৌড়ে যেতে দেখলাম। মিনিট দশেক পরে ও যখন ফিরে এল তখন ওর চোখ দুটো টকটকে লাল। বুঝলাম, অনেক শোক বুকে নিয়ে ও তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ঐ অবস্থায় ও আমাকে থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করল আর সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। এর পর নিতান্ত তুলি ছাড়া আর কারো পক্ষে ব্যাপারটা বুঝে নিতে কি খুব অসুবিধে হয় ইন্দ্র।

ইন্দ্র বলল, একটুও মিথ্যে নেই তোমার অনুমানে, তবু বলব ললিতা অসাধারণ সংযমী মেয়ে। তার স্বামীর যে মৃত্যু হয়নি, সে যে একটি প্রতারক, এ খবরটুকু পাবার পরই সে ঘর থেকে মিঃ নায়ারের ফটোটা সরিয়ে ফেলেছে।

সরিতা বলল, তাও আমি জানি। আম্মাওয়ন কাল রাতে আমাকে সেকথা বলেছেন। তুমিও যে ব্যাপারটা জান, সেটা তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি। কিন্তু ললিতাকে তিনি এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নি। তাই ফটোটা ওর ঘরে নেই দেখেই বুঝেছিলাম, তুমি কোন এক অবসরে ওকে ওর স্বামীর কথা বলেছ। মিঃ নায়ার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মন স্বাধীন হয়ে গেছে। তখন যে কোন সূত্র ধরেই হোক, তোমাদের মিলতে অসুবিধে হয়নি।

ইন্দ্র বলল, আমার ইচ্ছার আগুনে ওকে টানতে চেয়েছিলাম সরিতা, কিন্তু ও তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা নষ্ট করে রাতে ওর ঘরের দরজা আমার জন্যে খুলে দেয়নি।

সরিতা বলল, আবার বলছি ইন্দ্র আমি তোমাদের এই অ্যাফেয়ারটাকে খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছি। আমার মনে এখন একটুও যন্ত্রণা নেই। আর আমি তোমার চেয়ে অনেক ভাল করে জানি ললিতাকে। মনের দিক থেকে ও অনেক বড়। সাময়িক উইকনেস আসতে পারে, কিন্তু তাকে জয় করতেও ওর বেশী সময় লাগে না।

ইন্দ্র বলল, এখন থেকে একটি মানুষ তোমার কাছে সন্দেহের পাত্র হয়ে রইল।

সরিতা এবার ইন্দ্রের হাতখানাকে বুকে জড়িয়ে ঠোঁটে ছুঁইয়ে আদর করতে

করতে বলল, আমি ঈশ্বরপুত্র ক্রাইস্টকেও চাই না আর গার্ডেন অব ইডেনের স্যাটান্‌কেও চাই না। আমি চাই তোমার মত একটি মানুষ। যার দুরন্ত প্যাশান আছে, যে ভুল করে, আবার ভুল স্বীকার করে নেয়। তুমি যদি নিজের ইচ্ছেয় না চলে যাও, আমি তোমাকে কোনদিনও ছাড়তে পারব না ইন্দ্র।

সরিতাকে একটা ছোট পাখির মত বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে অজস্র আদরে ভরে দিতে দিতে ইন্দ্র বলল, তোমাকে যদি আমি কোনদিন ডিসিভ করি তাহলে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ থেকে আমি বঞ্চিত হব সরিতা।

# দুই

প্রেমা, তুমি তো জান চিরদিনই আমি পুরস্কার আর প্রশংসাপত্রের আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি। তাই জার্নালিস্ট আসোসিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী সভাতেও আমি যোগ দিতে পারলাম না। নাচ সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু পুরস্কার ব্যাপারটাকে কোন দিনই নয়। ঐ যে গেঁয়ো মানুষটি তুল্লাল নেচে গেল, দেখেছ তার চোখ আর হাত পায়ের কাজ? আমার পাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সারাক্ষণ আমি ওকে নিয়ে চাপা গলায় কৌতুক করতে দেখেছি। আমি জানি এই সমস্ত শিল্পী সমাবেশের ভেতর ঐ লোকটিই শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর সম্মানের অধিকারী। কিন্তু এও আমার অজানা নয় অজস্র নামী ফুলের মেলায় ও পাতার আড়ালেই থেকে যাবে।

গুরু পানিক্কররকে প্রণাম, তিনি এমন এক প্রতিভাকে খুঁজে বের করে এনেছেন দারুচিনি বনের ভেতর থেকে। হাঁ দারুচিনি বনই তো। ইডিক্কির মুনারে দারুচিনি আর এলাচ বনে লোকটি কাজ করে। বৃত্তিতে একেবারে বনশ্রমিক। লোকটির সংসারে পোষ্য অনেকগুলি, তাই সংসার চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তবু লোকটি সদানন্দময়। দুঃখকে ভুলতে জানে। ও যে অনেক বড় সম্পদ পেয়েছে। নাচের আনন্দে ওর সব দুঃখ ভেসে যায়।

'এসব খবর আমি লোকটির কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি।

পুরস্কার বিতরণী সভায় ও হয়ত বসার একখানা আসন পাবে। পুরস্কার প্রাপককে সকলের দেখাদেখি ও হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবে। তারপর ওর পাহাড়ী পল্লীতে ফিরে গিয়ে চাষী বন্ধুদের কাছে অনুষ্ঠানের গল্প করবে। যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের প্রশংসা করবে শতমুখে। তার চেয়ে যে সবাই বেশী গুণী একথা ভেবে মনে মনে লজ্জা পাবে। কিন্তু পুরস্কার না পাবার জন্যে কোন ক্ষোভ থাকবে না তার মনে। কারণ সে জানে না কত বড় সম্পদ সে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের মধ্যে।

গুরু পানিক্করের সঙ্গে বোধ হয় তোমার দেখা হয় নি। তিনি তোমার নাচের আন্তরিক তারিফ করছিলেন। আমার সঙ্গে উনি এক মত যে তুমি নাচের ভাষা বোঝ, নাচের সঙ্গে লীন হয়ে যেতে জান। সবাই জানেন, তুমি মাধবী আম্মার ছাত্রী। তাহলেও গুরু পানিক্করই এই সরকারী আয়োজনের

উৎফোক্তা। যদি পার ওঁর সঙ্গে দেখা কর। তাছাড়া যথার্থ গুণী আর সমঝদার যে কজন মানুষ এখনও দেশে রয়েছেন, তাঁদের শীর্ষে আছেন এই নিরভিমান বৃদ্ধ গুরু পানিকৃকর।

অনেক কথা লিখে ফেললাম। কলাকেন্দ্রমে যে কটা বছর একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সে দিনগুলো হঠাৎ পুরনো পাতার মত আমার চোখের সামনে একটা দমকা হাওয়ায় নাচের খেলা দেখাতে দেখাতে উড়ে এল। তাই সতীর্থকে এতবড় একখানা চিঠি লিখে বসলাম। তুমি জান, আমি ভবঘুরে, তাই ঠিকানা দিতে পারি না কাউকে। শুধু গুরু পানিকৃকরকে মাসের ভেতর একবার এসে প্রণাম করে যাই।

দেবন।

প্রেমা চিঠিখানা দুবার করে পড়ল। বিশেষ বিশেষ জায়গায় কয়েকবার করে পড়ে পড়ে আবৃত্তি করল। তার হোটেলের স্যুইটে বেয়ারা এসে চিঠিখানা দিয়ে যাবার পর থেকেই প্রেমা বিভোর হয়ে আছে। দেবন তাকে চিঠি লিখেছে, এ যেন ভাবাই যায় না। দেবন চিরদিনই কম কথা বলে, তদ্গত শিল্পী। অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দু-একবার দেখা হয়েছে মাত্র। অনুষ্ঠানের দু দিন পরে জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের যে টি-পার্টি আর পুরস্কার বিতরণী সভা বসবে তাতে সে দেবনকে ধরবে, আর নিয়ে আসবে তার হোটেলে এই ছিল তার পরিকল্পনা। কদিন নাচের ব্যাপারে ঘোরের ভেতর কেটেছে। তাই দু-একবার দেখা হলেও নিভৃতে আলাপের সুযোগ হয়নি। কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে গেল দেখে প্রেমার কেমন যেন কান্না পেল। কেন সে অনুষ্ঠানের ফাঁকে বলে রাখল না দেবনকে যে সে যেন চলে যাবার আগে একটিবার তার সঙ্গে দেখা করে যায়।

প্রেমা চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। খোলা চুলে চিরুণী চালাচ্ছিল সে। চিরুণীটা আটকে রইল চুলের ভেতর। হারিয়ে যাবার দুঃখকে আকুল হয়ে অনুভব করতে লাগল।

কলাকেন্দ্রমের মঞ্চে ও প্রথম যেদিন দেবনকে দেখেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ল। মহাভারতের পাতা থেকে যেন মহাবীর কর্ণ নেমে এসেছে।

সারা শরীরে সূর্যের শক্তি আর সৌন্দর্যের দীপ্তি। গুরু বালকৃষ্ণণ একটি একটি করে নাচের মুদ্রা শেখাচ্ছিলেন তরুণ ছাত্রদের। প্রেমা তার বান্ধবীদের নিয়ে বসেছিল দর্শক আসনে। নিজের ক্লাশ না থাকলে যে কোন ক্লাশে এসে বসার অধিকার ছিল ছাত্রছাত্রীদের।

গুরু বালকৃষ্ণণ একটি মুদ্রা ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই দেবন তার অবিকল অনুকরণ করে গুরুকে অবাক করে দিচ্ছিল।

নদী বইছে। বালকৃষ্ণণ দেখাচ্ছেন। দেবন সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে তরঙ্গ তুলে হাতের মুদ্রায় বয়ে চলা নদীর ভাবটি অবিকল ফুটিয়ে তুলল।

হাতি চলেছে। গুরুর সঙ্গে সঙ্গে দেবন অভিজাত পদক্ষেপে পরিক্রমা করতে লাগল সারা মঞ্চ। মাথার দুলুনিতে, প্রসারিত হাতের সঞ্চালনে শুঁড় উঁচিয়ে যেন চলেছে দুই হস্তী আগে পিছে।

ফুল ফুটছে, কুঁড়ি পাপড়ি মেলে জাগছে। দুটো হাত দেবনের পদ্মের মুদ্রায় বাঁধা। চোখ মুখ স্থির হয়ে আছে সেই করপদ্মের ওপর। হঠাৎ কেঁপে উঠল হাত থরথর করে। একটি একটি করে পাপড়ি মেলছে পদ্মকলি। চোখে মুখে সেই ফুটে ওঠার আনন্দ ভোরের রোদের মত ছড়িয়ে পড়েছে। ফুল কুঁড়ির বাঁধন খুলে যখন পূর্ণ বিকশিত হল, তখন দেবনের সারা শরীর আনন্দে, রোমাঞ্চে থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

ভ্রমর উড়ে আসছে ফুলের সন্ধান পেয়ে। দেবন হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে হাত। তারপর আঙুলের মুদ্রায় ভ্রমরকে উড়িয়ে আনছে ফুলের ওপর।

এত স্বাভাবিক আর এমন চার্মিং দেবনের কাজ যে দেখতে দেখতে প্রেমার মনে হত, সে ফোটা ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। চোখে দেখছে ভ্রমরের উড়ে আসা, কানে শুনছে তার গুঞ্জনগান।

পাঠ শেষ হলে গুরু বালকৃষ্ণণ ছাত্রদের বলতেন, তোমরা দেবনকে অনুকরণ করো।

দেবন কিন্তু মুখ নীচু করে একেবারে মঞ্চপীঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সংকোচের মূর্তিখানাও তার কত সুন্দর। প্রেমা উঠে আসত, কিন্তু তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যেত দক্ষ শিল্পী দেবনের সসংকোচ ছবিখানা।

দেবনদের যখন ক্লাশ থাকত না তখন ওরাও আসত প্রেমাদের অনুশীলন দেখতে। প্রেমার মনে হত, সে যার প্রতীক্ষায় নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে সেই প্রেমিক পুরুষ আজ এসেছে তার কাছে। প্রেমার নাচের মুদ্রায় তখন দুঃখ সুখের ঢেউ উঠত। তিলানার দ্রুতলয়ে সে যেন হার থেকে খসে পড়া মুক্তোর দানার মত সারা স্টেজে ছড়িয়ে পড়ত। তার হাস্যে লাস্যে, আমন্ত্রণ-মুদ্রায় দর্শকদের সে বিহ্বল করে দিত।

প্রেমার নাচ শেষ হলে কখনো বা দেবন দিত করতালি। মাধবী আম্মা মঞ্চের ওপর থেকে দর্শক আসনের দিকে কঠিন শাসনের চোখে তাকাতেন।

তিনি চাইতেন না শিক্ষা চলাকালে তাঁর কোন ছাত্রী দারুণ রকম প্রশংসা পাক। তাঁর মতে এতে দুটো অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয়। তরুণ শিক্ষার্থীর মনে অহংকারের বিষ ঢুকে যেতে পারে, আবার সতীর্থরা নিজেদের হীন মনে করতে পারে। তাতে নাচের উন্মাদনায় ভাঁটা পড়ারই সম্ভাবনা।

গুরু বলকৃষ্ণণ ও গুরু মাধবী আম্মার ভাবনার ভেতর ওরা লক্ষ্য করত এমনি ছোটখাট কত পার্থক্য।

গুরু বালকৃষ্ণণ যে ছাত্রকে অনুশীলন চলার সময়ে সকলের সামনে শাসন করতেন তাকেই আবার নাওয়া খাওয়া ভুলে শেখাতেন নাচের কঠিন মুদ্রাগুলো।

রাত চারটের সময় ছাত্রাবাসে এসে ঐসব পিছিয়ে পড়া ছেলেদের হাঁকডাক দিয়ে তুলতেন। সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন সমুদ্রের ধারে। বলতেন, দেখ নারকেল গাছটা কেমন দুলছে। পাতাগুলো কেমন থরথর করে কাঁপছে। দেহটাকে এমনি করে দোলাবি, দরকার হলে পাতার মত শিউরে উঠবি থরথর করে।

ঐ দেখ, সমুদ্রে ঢেউগুলো কেমন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে একের পর এক আছড়ে পড়ছে তীরে। ফুঁসছে, ফেনিয়ে উঠছে। কথাকলিতে দুজনে যখন যুদ্ধ করবি, তখন এমনি ফুঁসবি, এমনি প্রতিপক্ষের ওপর আছড়ে পড়ার ভঙ্গী করবি।

অন্যদিকে মাধবী আম্মাকে ছাত্রীরা দারুণ সমীহ করত। কেউ নিষ্ঠা হারালে তিনি চেঁচিয়ে বকুনি দিতেন না। কিন্তু এমন কঠিন চোখে চেয়ে থাকতেন যা কারো পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব হত না।

তিনি বলতেন, মোহিনী আটাম লাস্য নৃত্য। সারা অঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে হবে চটুল চঞ্চল ভাব, কিন্তু নিজের মনকে কোন দিন চঞ্চল করতে নেই। নিজে স্থির থেকে সমস্ত দর্শক চিত্ত চঞ্চল করে টানতে হবে নিজের দিকে। তবেই শিল্পীর সিদ্ধি লাভ।

প্রেমা তাঁর কাছেই থাকত। মাধবী আম্মা যে প্রেমার মায়ের বান্ধবী ছিলেন একথা কেউ কোন দিন শোনেনি গুরু মাধবী আম্মার মুখ থেকে। কোন ছাত্রী কোনদিন দেখেনি মাধবী আম্মা প্রেমার ওপর অতিরিক্ত নজর দিচ্ছেন। সকলে জানত প্রেমার থেকে তারা অনেক পেছনে পড়ে, প্রেমার সঙ্গে তাদের তুলনাই চলে না। কিন্তু মাধবী আম্মার আচরণে মনে হত, যে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে নাচ শিখলে প্রেমা হতে পারে। চাই কি তাকে অতিক্রম

করেও যেতে পারে। মাধবী আম্মা কঠিন শিক্ষাগুরু, কিন্তু সকলে জানত শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি সমদর্শিনী।

এক ছুটির সন্ধ্যায় কলাকেন্দ্রম থেকে গাড়ীতে করে কোভালমে নিজের বাড়ীতে ফিরছিল প্রেমা। পনেরটি দিনের অবকাশ যাপনের জন্যে মন উৎসুক। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই চালাচ্ছিল গাড়ী। হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় সকলেই চলে গিয়েছিল। মাধবী আম্মাও কদিন আগেই চলে গেছেন ত্রিচূরে কোন এক আত্মীয়ার বাড়ী।

সন্ধ্যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মত পথঘাট প্লাবিত করে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। প্রেমা তার গাড়িখানা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কোভালমের পথে। হঠাৎ রাস্তার এক জায়গায় এসে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেল ব্রেক কষে। একটি লোক রাস্তার প্রায় মাঝখান দিয়ে হেলতে দুলতে চলছিল। মাথায় একটা বাক্স।

গাড়ীটাকে হর্ণ বাজিয়ে ব্রেক কষতে দেখেই লোকটি পায়ে পায়ে সরে গেল রাস্তার ধারে।

গাড়ী থেকে মুখ বের করে প্রেমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, মাতাল নাকি, পথ চলতে জান না?

লোকটি যেন গালাগাল গায়েই মাখে না, এমনি নির্বিকারে সে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলতে লাগল।

দারুণ রাগ হল প্রেমার। লোকটা অন্যায়ের জন্যে কোথায় অনুতপ্ত হবে তা না উল্টে উপেক্ষা করে যেন চলতে লাগল।

প্রেমা গাড়ীখানা একেবারে তার পাশে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে গেল, কালা নাকি? কিন্তু গলার স্বর গলাতেই থেকে গেল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল লোকটির মুখোমুখি।

দেবন। আশ্চর্য!

দেবন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার গাড়ীর তলাতেই তাহলে পড়তে যাচ্ছিলাম বল?

প্রেমা বলল, আরে ওঠ ওঠ, কথা হবে পরে।

দেবন বলল, দূর, তোমার গাড়ীতে এখন কে চড়তে যাচ্ছে। হুস্ করে গাড়ী বেরিয়ে যাবে। আমি চাঁদের এমন সুন্দর আলোটাকে গায়ে মেখে নিয়ে পথ চলতে পারব না।

প্রেমা বিমর্ষ হয়ে গেল। বলল, এমনি পায়ে হেঁটে যদি চল তাহলে তো তোমার বাড়ী পৌছতে কম সে কম দিন তিনেক লাগবে।

তিনদিন কেন, পাঁচদিন লাগলেও ক্ষতি কি? ছুটি তো পনের দিনের। কি করব তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকে। তার চেয়ে হাটে বাজারে, পথেঘাটে সংসার পেতে পেতে চলব।

একটু থেমে বলল, পায়ে চলে চারদিকটাকে দেখে দেখে যাবার মত আনন্দ কোথায় পাওয়া যাবে প্রেমা। চোখ কান খোলা রেখে যত হাঁটবে, ততই রোমাঞ্চ। পথে পথে হাজারো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে।

দেবনের কথাগুলো খুব ভাল লাগল প্রেমার। তার মনে হল, সারা রাত সে দেবনের সঙ্গে এমনি করে হেঁটে হেঁটে মাঠ-ঘাট, বন পাহাড় পেরিয়ে চলে যাবে। নীল সমুদ্রের বুকে চাঁদের অজস্র অভ্রকুঁচি ছড়িয়ে দেবার খেলা দেখতে দেখতে, নারকেল গাছের পাতার কাঁপন বুকের ভেতর ভরে নিতে নিতে, কায়েলের পাশ দিয়ে কখনো বা নরম বালিতে পা ডুবিয়ে সে চলবে দেবনের সঙ্গে। দেবনের বাক্সটাকে সেও মাথায় তুলে নিয়ে পথ চলবে কিছুক্ষণ। কি আশ্চর্য রোমাঞ্চ আছে এ ধরনের পথ চলায়। একেবারে জিপ্সী মেয়ে-পুরুষের মত। ঘর বাঁধার ঝক্কি নেই। শুধু পথ চলার আনন্দ!

কি ভাবছ, বলল দেবন।

চমক ভাঙল প্রেমার। সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে যেন থেমে গেল।

প্রেমা বলল, না তেমন কিছু নয়, এই তোমার পথ চলার কথাই ভাবছিলাম।

আর ভেবে কাজ নেই, চটপট উঠে পড় গাড়ীতে। এমনি রাত হয়ে গেছে, অনেক দেরী হয়ে যাবে কোভালম্ পৌঁছতে।

প্রেমা অনুযোগের স্বর তুলে বলল, এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন বাবা?

দেবন হেসে ফেলে বলল, পথটা কি আমার একার যে আমি একাই ভোগ করব। তবে কেউ পথের ওপর জোর কদমে চলে আনন্দ পায়, কেউবা ধীর কদমে। আমি ধীরে চলতেই ভালবাসি প্রেমা।

প্রেমা কথান্তরে গেল, তোমার কি নিজের বাড়ীর ওপর কোন টানই নেই?

থাকবে না কেন, বলল দেবন, তবে বাবাও চিরকাল ভবঘুরে, ছেলেও তাই। মায়ের একা ঘরে থেকে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আমরা রুটিন ধরে কাজ করতে গেলেই মায়ের কেমন অস্বস্তি লাগে।

প্রেমা বলল, তোমরা ক'ভাই বোন?

দেবন বলল, তুমি আবার বংশপঞ্জী নিয়ে বসলে যে। আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

প্রেমা বলল, বাবা এখন কি করছেন ?

ঘরে বসে বই লিখছেন।

প্রেমা বিস্ময়ের সুরে বলল, বই! কিসের বই ?

বাবা আরথ্রাইটিসে প্রায় পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে আছেন। দীর্ঘ জীবনে নাচের সন্ধানে সারা দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাই নিয়ে বই লিখছেন।

প্রেমা বলল, তোমার বাবা কি নাচতেন ?

না।

প্রেমা বলল, তাহলে যে শুনেছিলাম, তুমি নৃত্যশিল্পীদের বাড়ীর ছেলে।

দেবন বলল, বাবা কেরালার সব রকম নাচের উৎপত্তি আর অগ্রগতি নিয়ে সারা জীবন চর্চা করেছেন, কিন্তু নিজে নাচেননি কখনও। আমার ঠাকুর্দা, তাঁর বাবা, সবাই ছিলেন নাচিয়ে। সেদিক থেকে বলতে পার আমি নাচিয়েদের বাড়ীর ছেলে।

প্রেমা অন্যমনস্কভাবে বলল, তাই তোমার রক্তে নাচ, তোমার অণু-পরমাণুগুলো নাচের ছন্দে বাঁধা।

তা আমি জানি না প্রেমা, তবে স্টেজে যখন নাচতে নামি তখন মনে হয় কেউ যেন আমার ওপর ভর করেছে।

একটু থেমে দেবন বলল, এইযে আটপেটিখানা আমি মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছি, এতে কি আছে জান ?

প্রেমার গলায় ঔৎসুক্য, কি ?

দেবন সেই জ্যোৎস্নার আলোয় পথের ধারে রেখে দেওয়া আটপেটিখানা খুলে ফেলল। প্রেমা দেখল, বাক্সখানার ওপরে দেবনের কয়েকটা জামাকাপড়। দেবন কাপড়-জামাগুলো সরিয়ে নিয়ে তলা থেকে বের করতে লাগল একটি একটি করে কথাকলির পোশাক। একদিকে অতি সাবধানে রাখা একটি খোপের ভেতর থেকে বের করল কিরীটম। প্রেমার হাতে দিয়ে বলল, দেখ তো কেমন ?

প্রেমা জ্যোৎস্নার আলোয় দেখল, মুকুটখানা অনেক কালের পুরোন, কিন্তু গঠনের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত।

প্রেমা বলল, এ ধরনের কিরীটম তুমি জোগাড় করলে কোথা থেকে ?

দেবন তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে একে একে বের করতে লাগল, কানের তোড়া, বাহুর পারস্তিকা মণি, বুকের কোল্লারয়ের ওপর কাক্সারম।

কোমরবন্ধনী—পাভিআরঞ্জানম, হাতের বালা আর মণিবন্ধের হস্তকটকম। নিম্ন-দেহের বাস পাটওয়ালের ওপর গাঢ় হলুদ রঙের মুম্পি। সাদা উত্তরীয়ের শেষপ্রান্তে অনেক বড় কঙ্কেফুলের আকারের সোনালী জরির কাজ।

প্রেমা দেখল সবকটি জিনিসই পুরোন। নতুন পোশাকের ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু পোশাকটির কোন কোন অংশে বেশ অভিনবত্ব আছে।

প্রেমা একটি একটি করে পোশাক যত্নে হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছিল। মাঝে মাঝে মন্তব্য করছিল বিস্ময়ের ভাষায়।

সব দেখানো শেষ হলে অতি যত্নে দেবন সেগুলিকে আবার গুছিয়ে রাখল তার আটপেটিতে। বাক্সের মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ পোশাক আমার ঠাকুরদার বাবা পরতেন প্রেমা। একশো পাঁচ বছর আগেকার এই পোশাকের উত্তরাধিকার আমি লাভ করেছি। এটি পরে স্টেজে দাঁড়ালেই আমি অন্যমানুষ হয়ে যাই। এক অদৃশ্য শক্তি আমার ভেতর তখন কাজ করতে থাকে।

প্রেমা বলল, আশ্চর্য!

দেবন বলল, তুমি জান আমি কলাকেন্দ্রমে নাচ শিখছি স্কলারশিপ নিয়ে, আমাদের সংসারের অবস্থা কোন কালেই ভাল ছিল না আজও নয়। তবু জান, প্রেমা, আমি যদি আমার পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে অনেক অর্থ পেতাম তাহলেও এত খুশি হতাম না, যত হয়েছি এই পোশাক আর আটপেটিখানার মালিকানা পেয়ে।

প্রেমা গভীর গলায় বলল, সত্যি, তোমার এ ঐশ্বর্য ঈর্ষা করার মত।

দেবন বলল, আমি যদি ভুল না শুনে থাকি তাহলে বলব, প্রেমা যেমন অনেক বড বাড়ীর মেয়ে। টাকা খরচ করে তাকে নামী গুরুর কাছে নাচ শেখানো হয়েছে। অনেক দামী আর নামী সমঝদারের চোখে এখনই সে পড়েছে। তার নাচের তারিফ বিশিষ্ট লোকেদের মুখে মুখে।

প্রেমা অধীর গলায় বলল, এ কথা কেন দেবন? বড়লোকের ঘরে জন্মে আমি কি খুব বড় একটা অপরাধ করেছি?

দেবন বলল, আমি ঠিক সেকথা বলতে চাইনি প্রেমা। হয়তো আমি আমার মনের কথাগুলো বলতে গিয়ে তোমাকে আঘাত করে বসতে পারি কিন্তু বিশ্বাস কর তোমার মনে কোনরকম আঘাত দেবার উদ্দেশ্য আমার আদপেই ছিল না। আমি আমার নিজের জীবনের কথাগুলোই তোমাকে বলতে চাইছিলাম।

প্রেমা বলল, থাক সেসব কথা, এখন তুমি যা বলতে চাইছিলে বল।

দেবন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবল। এক সময় বলল, অনেক আগে আমাদের নাচিয়ে সম্প্রদায়ের মানুষদের বড একটা সম্মান ছিল না। কিন্তু যারা নাচ শিখেছে এত কষ্ট করে তারা সবাইকে তো তা দেখাতে চায়। মানুষের মুখের একটুখানি বাহবা পেলেই তারা কৃতার্থ হয়ে যায়।

প্রেমা বলল, আমার বাবা কিন্তু এসব ব্যাপারে খুবই প্রোগ্রেসিভ ছিলেন। আমাদের কনভেণ্টে পড়াশোনার ব্যবস্থা যেমন করেছিলেন তেমনি নাচ শেখানোর ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন দারুণ। তিনি বলতেন, গাছের শাখায় যেমন পাতা জাগে আর ফুল ফোটে ঠিক তেমনি দেহের শাখায় শাখায় নাচের মুদ্রাগুলো আশ্চর্য সব অনুভূতির ফুল ফোটায়। তিনি নাচ শুধু ভালবাসতেন না, নাচিয়েদের দারুণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

দেবন বলল, এখন দর্শক অনেক শিক্ষিত হয়েছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও বদলেছে। কিন্তু আমাব দাদুর মুখে গল্প শুনেছি, তাঁরা ছোটবেলা নাচের জন্যে কত অপমান সহ্য করেছেন।

কি রকম ?

দেবন বলল, পাঠশালায় বানান ভুল করলেই পণ্ডিতমশায় বলতেন, পড়তে এসেছিস কেন ? কস্মিনকালেও তো কিছু শিখতে পারবি না। তোর বাপ নাচিয়ে, ধেই ধেই করে নেচে বেড়াগে যা।

যাদের কোন কালচার নেই তারাই এ ধরনের কথা বলে।

শোনই না, দেবন বলে চলল, আমার ঠাকুর্দা তাঁর বাবার সঙ্গে আটপেটি মাথায় বয়ে নিয়ে কোন উৎসব বাড়ীতে গিয়ে হাজির হতেন। শুধু নাচ দেখাবেন, এই ইচ্ছে। জমিদারের মর্জি হলে অনুমতি পাওয়া যেত। আশ্রয় মিলত কেটেডমের একেবারে বাইরে গাছের তলায়। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না প্রেমা, জমিদারবাড়ীর হাতি আর ঘোড়াগুলোকে দালানের ওপর খেতে দেওয়া হত, অথচ দাদুদের খাবার জন্যে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তারওপর কলাপাতা পাততে হত। তারই ওপর চূড়ো করে ভাত ঢেলে দিত জমিদারবাড়ীর চাকরগুলো। সামান্য একপদ তরকারী পেলেই যথেষ্ট।

প্রেমা বলল, এ ধরনের অবস্থা ভাবাই যায় না।

এত অপমান সত্ত্বেও কিন্তু শিল্পীরা বসে থাকত। শুধু যে বিদ্যা তারা এত সাধনায় শিখেছে তাকে সকলের সামনে তুলে ধরবে বলে। জান প্রেমা, আমি শুনেছি পাঁচ বছরে পড়লেন দাদু আর সেই থেকে শুরু হয়ে গেল

তাঁর শিক্ষা। দশ বছরের পর দিনে কমপক্ষে দশ ঘণ্টা প্র্যাকটিশ করতে হত। সামনে জ্বলত নারকেল তেলের ভিলাকু। তার সামনে সাধনার আসন পেতে মুখ আর চোখের কাজ করতে হত। মাংসপেশীর সেসব কাজ দেখলে আজকের শিল্পীরা থ বনে যাবে। আমার দাদু বলতেন একই মুখের একদিকে কান্না আর একদিকে হাসি ফোটানোর খেলা দেখাতে যদি না পারলি তাহলে শিখলি কি ?

প্রেমা বলল, সত্যি এইসব সাধকই আমাদের প্রেরণা।

হঠাৎ দেবন বলল, দেখ প্রেমা কথা শুরু হলে কথা আর শেষ হবে না। দয়া করে আমাকে যেতে দাও। রাত দশটার ভেতরে একটা বাজারে পৌঁছতে না পারলে রাতের খাবারটাও জুটবে না।

অন্ততঃ ঐটুকু পথ তোমাকে পৌঁছে দিতে দাও।

আটপেটিটা মাথায় তুলে নিয়ে দেবন বলল, কিছু মনে কোরো না প্রেমা, অভ্যেস আমি খারাপ করব না। একদিনের সুখের কথা মনে করে দুঃখ পেতে হবে চিরদিন। ওতে আমি নেই। যেমন চলছি, এমনি আমাকে নিজের মত করে চলতে দাও।

প্রেমা মনে মনে বলল, কি নিষ্ঠুর আর কি অহংকারী তুমি দেবন। মুখে বলল, আচ্ছা এসো, পনেরটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আবার দেখা হবে কলাকেন্দ্রমে। তখন তোমার এই পথচলার অভিজ্ঞতার কথা শুনব।

প্রেমা গাড়ীতে স্টার্ট দিল। দেবন তেমনি আটপেটি মাথায় পথের ধার ঘেঁষে চলতে লাগল, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটু আগে যে প্রেমা নামে এক সতীর্থার সঙ্গে তার আলাপ চলেছিল তার কোন চিহ্ন নেই দেবনের আচরণে। প্রেমা গাড়ী চালিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় উৎসুক চোখে একবার তাকাল কিন্তু পথের ওপর পড়ে থাকা দেবনের দৃষ্টিকে সে কোনরকমেই নিজের দিকে টানতে পারল না।

কলাকেন্দ্রমে পাঁচটি বছরের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে দেবনের মুখোমুখি হয়েছে প্রেমা কতবার। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করেছে ওরা একই সঙ্গে। দেবনের প্রাধান্যকে ও মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। দেবন যখন নিরাসক্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে আসন্ন উৎসব পরিকল্পনার কথা বলে গেছে, তখন প্রেমা শুধু দেখেছে দেবনকে। তার কানে হয়ত দেবনের একটিও কথা বাজেনি। সে তার সামনে দেখেছে সেই শক্তিমান কর্ণকে, যার সমস্ত শক্তি অদৃশ্য ভাগ্যদেবতা নির্মম কৌশলে হরণ করে নিয়ে চলেছে।

শিক্ষকেরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন দেবন কলাকেন্দ্রমের অদ্বিতীয় শক্তিমান শিল্পী। কিন্তু যখনই কোন উৎসবের আয়োজন হয়েছে, বিশিষ্ট দর্শকেরা এসেছেন কলাকেন্দ্রমে তখনই তাঁরা দেবনকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করলেও পুরস্কার কিংবা উপহারের বস্তুগুলি একে একে তুলে দিয়েছেন প্রেমার হাতে।

প্রেমা মাথায় ঠেকিয়ে তুলে নিয়েছে সে দান কিন্তু তার মন সেগুলিকে গ্রহণ করতে পারেনি। সে জানে সে মোহিনী, আর সেই মোহিনীমায়ায় সে সবার চোখে মোহের অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া সকলেই জানে সে অন্যতম বিজনেস ম্যাগনেট করুণাকরের মেয়ে। বাড়তি একটা সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই সে তার অজ্ঞাতে সবার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। এসবে প্রেমার নিজের কোন ইচ্ছার প্রশ্নই ওঠে না। সমস্ত অনুকূল পরিস্থিতি ঘুরেছে তাকে কেন্দ্র করে।

অন্যদিকে অধিরথ সূতপুত্র দেবন। কর্ণের কবচকুণ্ডল সে স্মিত হাসিতে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। শক্তি তার থেকে ঝরে পড়া তুষার নদীধারার মত চিরপ্রবহমান। কিন্তু ভাগ্যের আশ্চর্য খেলায় বারে বারে তার গতি শুষ্ক মরুতে লুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রেমা ছবি দেখে—তার কর্ণের রথচক্র গ্রাস করেছে মেদিনী। মহা শক্তিধর সেই প্রথিত চক্রকে শেষ শক্তিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করছে, আর ভাগ্যের দেবতা নিষ্ঠুর শরাঘাতে অসহায় সংগ্রামীকে বিদ্ধ করতে উদ্যত।

ছবি দেখতে দেখতে হাহাকার করে কেঁদে উঠেছে প্রেমা। কিন্তু সেই অনুচ্চারিত হৃদয়ের শব্দ কারো কানে গিয়ে পৌঁছয়নি। এমনকি প্রেমা যখন অশান্ত কাতর হৃদয়ের ভার বয়ে নিয়ে তার কর্ণের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কোন সমুদ্রবেলায়, দেবন স্মিত হাসিতে তাকে অভ্যর্থনা করেছে। তার পুরস্কার প্রাপ্তিতে জানিয়েছে অন্তরের গভীর অভিনন্দন।

কিন্তু প্রেমা তার সামনেই বালির জমিনে তার প্রাপ্ত পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে, এ আমার নয় দেবন, এ আমার নয়। এ পুরস্কার তোমার। কিন্তু এ উচ্ছিষ্ট বস্তুটি আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পারব না, আর এও জানি এ পুরস্কার তুমি স্পর্শ করবে না।

প্রেমার হাত ধরে দেবন বলেছে, বড় বেশী সেন্টিমেন্টাল তুমি প্রেমা। আমার নাচ তোমার ভাল লাগতে পারে, মাষ্টার মশায়দের ভাল লাগতে পারে তা বলে সবার লাগবে এ কথা কি করে বলা যায় বল। তাঁরাও তো গুণী। তাঁদের বিচারের দাম দিতে হবে বৈকি।

উদ্গত অভিমানটুকু বুকের মধ্যে চেপে রেখে ভারী গলায় বলে উঠেছে প্রেমা, থামো তোমাকে আর বিচারকদের সাফাই গাইতে হবে না।

দেবন হেসে উঠে বালির ওপর ফেলে দেওয়া প্রেমার পুরস্কারটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলেছে, এই অবোলা জড় পদার্থটির অপরাধ কি প্রেমা। ওকে অমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কি লাভ হচ্ছে তোমার। একদিন এই উপহারকে তুচ্ছ বলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে হয়ত তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।

প্রেমা দেবনের হাত থেকে সে পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেছে সমুদ্রের দিকে। জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠেছে, এ আমারও নয়, তোমারও নয়, একে মহাসমুদ্র গ্রাস করুক।

দেবন অশান্ত প্রেমার দুটো হাত আবার নিজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলেছে, ঐ সমুদ্রের সঙ্গে তোমার কোন তফাৎ নেই প্রেমা। ও অনন্তকাল ধরে নাচের লীলায় মেতে আছে, তুমিও তাই। তোমার দেহেই শুধু নয়, মনেও চঞ্চল নাচের একটা লীলা চলেছে সারাক্ষণ।

প্রেমা দেবনের হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বালির জমিনে পায়ের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে ত্রস্ত পায়ে চলে গেছে কলাকেন্দ্রমের দিকে।

দেবন চেয়ে চেয়ে দেখেছে খেয়ালী প্রেমাকে। তার ভাল লেগেছে প্রেমার সবকিছু। চঞ্চল পায়ে ঢেউয়ের মত এগিয়ে এসে আক্ষেপে আছড়ে পড়া আবার দূরে সরে সরে চলে যাওয়া। সবকিছুর ভেতর ওর একটা সুন্দর অশান্ত ছন্দ আছে, যে কোন শিল্পীর মনকে তা নাড়া দিয়ে যাবেই। দেবন অভিভূত হয়, সে ভাবে প্রেমার অন্তর ঐ দিগন্ত ছুঁয়ে থাকা সমুদ্রের মতই প্রসারিত।

দেবনের চিঠিখানা হাতে নিয়ে প্রেমা ভাবছিল ফেলে আসা কলাকেন্দ্রমের দিনগুলোর কথা।

হঠাৎ তার মনে হল, দেবন কি যে কোন নারী সম্বন্ধেই নিস্পৃহ! প্রেমা যেমন করে তার অবসর মুহূর্তগুলো ভরে তোলে দেবনের ভাবনায়, দেবনও কি তেমনি করে ভাবে না তার কথা। হয়ত ভাবে হয়ত ভাবে না। শিল্পী কি তার চারদিকের চলমান চঞ্চল জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিরাসক্ত থাকতে পারে! সে দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে জীবনকে দেখে দেখে যায়, আর স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে তাকে রূপ দিয়ে চলে। দেবনকে তার মনে হয় বিরল উপাদানে গড়া বিশ্বকর্মার সৃষ্টির একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

প্রেমা ভাবল, দেবন কখনো কাছে আসে না সে দূরে থেকেই আকর্ষণ করে। চন্দ্রের মত সে দূর আকাশে থেকে সমুদ্রকে টানতে থাকে। তাই সমুদ্র উচ্ছ্বাসে

উত্তাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর আকর্ষণকারীকে না পেয়ে আক্ষেপে ভেঙে পড়ে বেলাভূমিতে।

ঘরের ভেতর জলতরঙ্গের শব্দ তুলে বেলটা বেজে উঠতেই প্রেমার ধ্যান ভাঙল। সে মাথা থেকে চিরুণীটা টেনে নিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল।

প্রেমা দরজা খুলতেই ঝড়ো হাওয়ার মত একটা উচ্ছ্বাস ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মিঃ পিল্লাই দুখানা হাতই প্রেমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, হ্যালো কনগ্র্যাটস, প্রেমা তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কারটা সবার চোখের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। ওঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি কম হয়েছিল, একবার দেবনের দিকে পাল্লা ঝোলে তো আরবার প্রেমা মেননের দিকে। সুধা আয়েঙ্গারের ভারতনাট্যম পারফরমেন্সের প্রশংসায়ও কেউ কেউ পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ অব্দি কেরালার বিউটি কুইন, ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট প্রেমা মেননের মাথাতেই জয়ের মুকুটটা উঠল।

প্রেমা শান্ত গাম্ভীর্যে বলল, বসুন, আসছি।

আড়ালে বেসিনের কাছে গিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। চোখ থেকে ক্রমাগত গড়িয়ে আসছে জলের ধারা। বেসিনের হাতভরা জলেও ঐ ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলকে ধুয়ে মুছে ফেলা যাচ্ছে না। এ জল উত্তাপে শুকোয় না, জলেও ধুয়ে যায় না। আশ্চর্য এর প্রবাহ।

আলতো করে তোয়ালেতে মুখখানা মুছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল প্রেমা। জয়ী হলে মানুষ সুখী হয় কিন্তু এমন সুখও আছে যা পরাজয়ের ভেতর দিয়ে আসে। সেই সুখই প্রেমা পেতে চেয়েছিল। দেবনের কাছে হার হলে সে মনে মনে তার সমস্ত কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিত বিচারকদের উদ্দেশ্যে। শাস্ত্রে বলে, পুত্র আর শিষ্যের কাছ থেকে পরাজয় গৌরবের। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা জানেন না ভালবাসার জনের কাছে হেরে গেলেও কি অসীম তৃপ্তি আর গর্বে মনটা ভরে ওঠে।

প্রেমা এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। মুখে একটুখানি হাসির রেখা টেনে বলল, পুরস্কারটা কিন্তু আমার প্রাপ্য নয়।

মিঃ পিল্লাই শক্ খেয়ে যেন সোফায় উঠে বসলেন। বললেন, এ কথা কেন প্রেমা! সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়ে তুমি জয়ী হয়েছ। এ ব্যাপারে কারো কিছু বলার নেই।

প্রেমার ঠোঁটের সূক্ষ্ম হাসিটা রহস্যময় হয়ে উঠল। সে বলল, পুরস্কার পাবার ব্যাপারে সত্যি করে বলুন তো আপনার হাত ছিল কতখানি?

লোকটি যেন হকচকিয়ে গেল। কি বললে প্রেমা খুশি হবে, আর কি বললেই বা প্রেমার একটুখানি করুণা সে পেতে পারবে তাই ভাবতে গিয়ে অনেকখানি সময় চলে গেল পিল্লাই-এর।

আমতা আমতা করে বললেন, জন্মভূমি পত্রিকাই তোমার প্রথম নাচের পাবলিসিটি দিয়েছিল। তাই তোমাকে আমরা আমাদের আপনজন বলেই ভাবি। এক্ষেত্রে নিজের মানুষের জন্যে যতটুকু করা দরকার, তাই করা হয়েছে। আর দেখ, তুমি যদি পঙ্গু হতে তাহলে নিশ্চয় বিধাতাপুরুষ ছাড়া কেউ তোমাকে গিরি লঙ্ঘনের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত না।

প্রেমা ছোট করে বলল, বুঝলাম, এখন বলুন কি আনাব, হার্ড না সফ্‌ট্‌?

পিল্লাই চেঁচিয়ে উঠলেন, এতবড় একটা খবর বয়ে আনার পুরস্কার তুমি শীতল অভ্যর্থনায় দিতে চাও প্রেমা!

প্রেমা বেল বাজাল। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই প্রেমা মিঃ পিল্লাইকে বলল, আপনার জন্যে রাম, জিন, হুইস্কির কোনটা আনাব বলুন?

তুমি?

প্রেমা বলল, আমার বিয়ার।

মিঃ পিল্লাই বললেন, আজ আর আলাদা করে দূরে সরিয়ে দিও না প্রেমা। একই পানীয়ে আমাদের কণ্ঠ নীল হোক।

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

ড্রিঙ্কের ভেতরে কথা হচ্ছিল। মিঃ পিল্লাই বললেন, জন্মভূমি পত্রিকায় তোমার বাবার যে শেয়ার ছিল তা আমি বেচে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম, তাই না?

সে জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ মিঃ পিল্লাই।

কৃতজ্ঞতার কথা নয় প্রেমা। আমি বলতে চাইছি সেই থেকে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয়।

প্রেমা বলল, জন্মভূমি আমাকে অনেক দিয়েছে। টাকা যেমন পেয়েছি, পাবলিসিটিও পেয়েছি তেমনি। পুরো পাতা জুড়ে এমন করে আমার নাচের ছবিগুলো আর কোন পত্রিকায় ছাপে নি।

মিঃ পিল্লাই-এর গলায় আবেগ, যে সামান্য একজন রিপোর্টার সবকিছুর আড়ালে থেকে নীরবে কাজ করে গেল তাকে কি কোন দিন একটুখানি কৃপার চোখে দেখতে ইচ্ছে হয় না তোমার?

একথা বলে আমাকে ছোট করে দিচ্ছেন মিঃ পিল্লাই। আপনি আমাদের পরিবারের শ্রদ্ধেয় বন্ধু।

আবেগে মিঃ পিল্লাই প্রেমার একখানা হাত চেপে ধরলেন। বললেন, শ্রদ্ধেয় কথাটা উইথড্র করতে হবে। আমার সঙ্গে কি তোমার শ্রদ্ধার সম্পর্ক প্রেমা? আমি কি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর একজন হতে পারি না?

খিলখিল করে হেসে উঠল প্রেমা। বলল, অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার মতে একজনই হতে পারে, বাকী সব বন্ধু।

মিঃ পিল্লাই বললেন, একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর পদ আমি পাব, এমন দুরাশা আমার নেই, তবে আলোতে ঝাঁপিয়ে পড়ার অধিকার বুঝি সব পতঙ্গেরই আছে।

আবার হাসল প্রেমা। বলল, আপনি বেশ নাটক করে কথা বলতে পারেন। যারা নাটক দেখতে ভালবাসে তারা আপনাকে দারুণ রকম পছন্দ করে ফেলবে।

চুপ করে গেলেন পিল্লাই। মানুষটা আহত হয়েছে ভেবে প্রেমা তাকে খুশি করার জন্যে তার গ্লাসে বেশ খানিকটা বিয়ার ঢেলে দিল।

পিল্লাই বললেন, বিশ্বাস কর প্রেমা, জীবনে কারো কোন ক্ষতি করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। আমার সামর্থ্য মত সাহায্যের চেষ্টা করেছি মানুষের। কিন্তু আঘাত ছাড়া কোন দিন কোন পুরস্কার পাইনি।

প্রেমার মনটা হঠাৎ তার দ্বিগুণ বয়েসী মানুষটার ওপর নরম হয়ে উঠল। সে বলল, আমার কথায় যদি কোন রকম আঘাত আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মিঃ পিল্লাই।

আবার পিল্লাই গ্লাশটা নামিয়ে রেখে হাত ধরলেন প্রেমার। বললেন, তোমাকে ভালবাসতে খুব ইচ্ছে করে প্রেমা, কিন্তু ভালবাসা কারু হৃদয় থেকে জোর করে তো আদায় করে নেওয়া যায় না।

প্রেমা বলল, বিশ্বাস করুন আপনাকে এই মুহূর্তে আমার খুব ভাল লাগছে। কেন জানেন, ইনিয়ে বিনিয়ে ঢেকেঢুকে আপনি কথা বলতে জানেন না। মনের কথা খুব সোজা করে বলতে পারেন।

মিঃ পিল্লাই বললেন, প্রেমা, আমি এও জানি আমার এমন কোন যোগ্যতা নেই যে আমি প্রেমা মেননের মত তরুণীর সান্নিধ্য পেতে পারি। তবু ভয়ানক একটা দুরাশার হাত থেকে তো নিষ্কৃতি পাই না। তাই নিশ্চিত পাব না জেনেও তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারছি কই।

প্রেমা বলল, আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ?

মিঃ পিল্লাই কিছু সময় চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর গেলাসের সবটুকু পানীয় গলায় ঢেলে দিয়ে গ্লাসটা দূরে সরিয়ে রেখে বললেন, বড় দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়ে ফেললে প্রেমা। আমি আমার জীবনের ঐ অংশটার ওপর কালো পর্দা ফেলে রেখেছিলাম।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ক্ষমা করবেন, কৌতূহলটা আমার খুব সামান্যই ছিল, তাতে আপনার আহত কোন একটা জায়গায় ঘা লাগবে ভাবতে পারি নি। আপনার পারিবারিক প্রসঙ্গ ছেড়ে এখন আমরা অন্য প্রসঙ্গে আসতে পারি।

না, তা পার না—গলায় ভারী একটা আওয়াজ তুললেন মিঃ পিল্লাই। বললেন, প্রশ্নের হাওয়ায় যখন কালো পর্দাটা একবার উড়েছে তখন সবটুকু দেখে নাও প্রেমা।

প্রেমা বলল, বিশ্বাস করুন, আমি বিশেষ কোনকিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখন আমার খুব খারাপ লাগছে। মানে, আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

থাক তাহলে, তবে আমি কথাটা বলতে পারলে কিছুটা হাল্কা হতে পারতাম।

প্রেমা বলল, আপনি যদি আমার কাছে বলে শান্তি পান তাহলে শুনতে আমার একটুও আপত্তি নেই।

পিল্লাই বললেন, কথাটা কিছু বিচিত্র নয়। ঘটনা চরিত্র, সবই সাধারণ।

একটু থেমে হাসলেন পিল্লাই। রোজ আমার চারদিকের চরিত্র আর ঘটনাগুলোকে নিয়ে খবর তৈরী করেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি একদিন আমি নিজেই খবর হতে চলেছি।

প্রেমা টেবিলের ওপর কনুই ঠুকে গালে হাত দিয়ে চেয়ে রইল মিঃ পিল্লাইএর মুখের দিকে।

পিল্লাই বললেন, আমার স্ত্রী সুন্দরী বলে কোন দিনই আমি তাকে বন্দী করে রাখার ফিকির খুঁজিনি। আমি সব মানুষের মনের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলাম। আমাকে অফিসের কাজ নিয়ে এখানে ওখানে রোজ ঘুরে বেড়াতে হত, তাই স্ত্রীর মুখোমুখি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকার সময় হত না আমার।

প্রেমা কথার মাঝেই বলল, আপনার স্ত্রী এ নিয়ে অনুযোগ করতেন না ?

বিয়ের প্রথম দু-তিনটে বছর জোর অনুযোগ আর কান্নাকাটি করত।

আমি তাকে আর এমনটি হবে না বলে কথা দিতাম কিন্তু আমার সেসব কথার কানাকড়ি দাম ছিল না। কথা দেওয়াটা ছিল যেন কথা ভাঙার জন্যেই।

প্রেমা বলল, কেন এমনটা করতেন ?

কাজটা আমার এমনিতেই অফিস ঘরের বাইরে, তার ওপর উন্নতি করার নিদারুণ একটা আগ্রহে অফিস দূর দুর্গমের যেখানে পাঠাতে চাইত সেখানেই বিনা প্রতিবাদে চলে যেতাম। চাকরীতে উন্নতি হবে, ভাল করে সংসার গড়ে তুলব এই ভাবনায় প্রথম জীবনে খুব খেটে গেছি।

আবার একটু থেমে বললেন, মিস মেনন একটু বিরক্ত করব ?

—বলুন বলুন।

হুইস্কি একটা আনালে হয় না ?

ও সিয়োর—বলেই প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে বেল বাজাল।

বেয়ারা এল, অর্ডার নিয়ে সার্ভ করে গেল। পিল্লাই এর অনুরোধে মেননকেও ভাগ বসাতে হল।

পিল্লাই বলতে লাগলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে একটা পরিবর্তন দেখলাম আমার স্ত্রীর ভেতর। সে আর কান্নাকাটি তো করছেই না, বরং আমার কাজকর্মের খোঁজখবর নিচ্ছে। উন্নতির জন্যে আমি কোন রাস্তায় দৌড ঝাঁপ করছি সে সম্বন্ধে শলাপরামর্শ করছে।

ওর মন শান্ত হয়েছে, ও কঠিন সংসারটাকে বুঝতে শিখছে দেখে আমি অনেকখানি আশ্বস্ত হলাম। আরও বাড়তি উৎসাহ পেয়ে কাজকর্মে জোর মন দিলাম। বল প্রেমা স্ত্রী সহযোগিতা করলে কোন স্বামী না কাজে প্রেরণা পায়।

প্রেমা হাতের তেলোতে রাখা মুখখানা একবার সমর্থনের ভঙ্গীতে নাচাল।

পিল্লাই বললেন, বিয়ের পঞ্চম বার্ষিকীর দিনটিতে আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরব মনে করেছিলাম কিন্তু কাজের চাপে পারলাম না। ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল মিড-নাইট। একগুচ্ছ গোলাপ আগে-ভাগে আনিয়ে রেখেছিলাম, তাই নিয়ে ঘরে গেলাম। বাইরে থেকে কয়েকবার কলিং বেল টিপেও সাড়া পাওয়া গেল না। আমার কোয়ার্টারে পার্ট টাইম কাজের একটা মেয়ে আসত। সে চলে গেলে সারা সময় আমার স্ত্রী একাই থাকত। ভাবলাম অনেক রাত, বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ভুল ভাঙল হঠাৎ দরজার গায়ে হাত ঠেকতে। দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ ছিল না, কেউ নিঃশব্দে ভেজিয়ে রেখে বেরিয়ে গেছে।

বুঝতেই পারছ প্রেমা তখন আমার মানসিক অবস্থা কি রকম। কোন খুনী নিঃশব্দে এসে হয়ত ভয়ঙ্কর কিছু অঘটন ঘটিয়ে গেছে। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। হাতের ফুল পড়ে গেল মেঝেতে। আমি দৌড়ে ঢুকে গেলাম আমার শোবার ঘরে।

আলো জ্বলছিল। বেড লাইট। চারদিকে ছায়া-ছায়া একটা ভাব, শুধু বিছানার ওপর এক টুকরো হলুদ আলো একটা পেতলের থালার মত পড়ে আছে। তার তলায় এক চিলতে কাগজ। তার ওপর আমার স্ত্রীর হাতের ঘড়িটা চাপা দেওয়া আছে। আমি প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে ঐ ঘড়িটা আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরোটা হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলাম। না, কোন খুনী আমার স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলে রেখে যায় নি, আমার স্ত্রীই এক বিস্ময়কর খুনীর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে।

প্রেমা সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, কি রকম?

পিল্লাই করুণ হেসে বললেন, আমার স্ত্রী লিখেছে: এই দিনটিতে তোমার বাড়ীতে ঢুকেছিলাম, আবার ঠিক এই বিশেষ দিনটিতেই তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যার সঙ্গে যাচ্ছি, তাকে তুমি চিনবে না। পুরো একটি বছর ম্যাটিনী শোতে মানুষটা তার কাজকর্ম ফেলে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। তার নিষ্ঠার কাছে আমাকে হার মানতে হল। তোমার দেওয়া ঘড়িটার কোন পয় ছিল না, কারণ ওটা তোমাকে একটি দিনও ঠিক সময়ে ঘরে টেনে আনতে পারে নি। তাই ঐ অপয়া বস্তুটাকে আর সঙ্গে নিলাম না।

থামলেন মিঃ পিল্লাই। মদের ঝোঁকে হা-হা করে ঘর ফাটিয়ে একবার হেসে উঠেই থেমে গেলেন। গভীর নিস্তব্ধতায় ঘরটা থমথম করতে লাগল।

প্রেমা বলল, কিছু মনে করবেন না মিঃ পিল্লাই, দোষটা পুরোপুরি আপনার স্ত্রীর নয়।

পিল্লাই বললেন, সদ্য সদ্য আঘাতটা বুকে বড় বেজেছিল, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম ও আঘাত আমার স্ত্রী ইচ্ছে করে দেয় নি। আমার ঠিক ঠিক পাপ্যটুকু সে আমাকে দিয়ে গেছে।

প্রেমা কৌতূহলী হল, তাঁর খোঁজ আপনি আর করেন নি?

পিল্লাই হেসে বললেন, কত সন্ধান করে করে আমি জন্মভূমির পাতায় খবর পরিবেশন করি কিন্তু নিজেকে নিয়ে আর খবর তৈরী করতে ইচ্ছে হল না। তবে গোপনে সন্ধান নিয়েছিলাম। লোকটার অবস্থা আদপেই সচ্ছল নয়।

চিঠি দিয়ে আমার পলাতকা স্ত্রীকে জানিয়েছিলাম, সে নিশ্চিন্তে ঘর করতে পারে, আমি তাকে কোন দিক থেকেই জ্বালাব না। আর এও লিখেছিলাম, দরকার হলে সে যেন আমার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে দ্বিধা না করে।

প্রেমা বলল, আমি নিশ্চিত বলতে পারি আপনার স্ত্রী আপনার কাছ থেকে আর কোন দিন সাহায্য চান নি।

একেবারে নির্ভুল অনুমান। দেখছি মেয়েরাই মেয়েদের মনের কথা জানতে পারে।

প্রেমা বলল, সেটাই তো স্বাভাবিক।

পিল্লাই বললেন, জান প্রেমা মেয়েটিকে কষ্ট দিয়েছিলাম বলে আজও ভুলতে পারি নি।

প্রেমা হঠাৎ বলল, এখনও কি তাঁর খোঁজ রাখেন ?

মিঃ পিল্লাই কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনা হয়ে গেলেন। এক সময় বললেন, মেয়েটি স্বামীকে বড় বেশী কাছে পেতে চাইত, তাই ভদ্রলোক মারা যাবার আগে তাঁর স্ত্রীকে চার-চারটে বছর ধরে উদয়াস্ত সঙ্গ দিয়েছিলেন।

প্রেমার গলায় ঔৎসুক্য, কি রকম ?

পিল্লাই বললেন, ভদ্রলোক চার বছর প্যারালিসিসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। আর স্ত্রী সেবা করেছে রাত্রিদিন।

ওঁদের কোন ইস্যু নেই।

পিল্লাই বললেন, একটি মেয়ে। কারো জন্যেই কিছু রেখে যেতে পারেন নি ভদ্রলোক। রাখার মত রেস্ত ছিল না তাঁর। শেষের দিকে স্ত্রীই সংসার চালিয়েছে বাদাম ছাড়ানোর সামান্য কাজ করে। কখনো বা দড়ি পাকিয়ে মার্কেটে বিক্রি করে এসেছে।

প্রেমা বলল, উনি কিন্তু মহিলা হিসেবে ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

পিল্লাই যেন প্রেমাকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন, দস্তুর মত ভাল।

প্রেমা পাল্টা প্রশ্ন করে বসল, আপনি কি করে জানলেন ?

স্বামী মারা যাওয়ার বছর খানেক পরে একদিন ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওর অবস্থা দেখে দুঃখ জানিয়ে বলেছিলাম, সব ভুলে তুমি মেয়েকে নিয়ে এসো আমার সঙ্গে। ও ঘরে আজও নতুন কেউ আসেনি।

ও কথাটা শুনে অবাক হয়ে বলেছিল, সে কি কথা, এতখানি অবস্থা ফেলে আর এতদিনে বউ একটা জোটাতে পারলে না।

আমি হেসে বলেছিলাম, বোধহয় ভাগ্যে নেই। সকলের তো সবকিছু সয় না।

ও অমনি বলে উঠেছিল, তাহলে আবার আমাকে ডাক দেওয়া কেন, তার চেয়ে আমাকে আমার মত করে থাকতে দাও।

আমি ওর মেয়েটাকে মাসে মাসে কিছু দিতে চেয়েছিলাম, ও তাও নেয় নি। বলেছিল, শরীরে এখনও শক্তি আছে, কাজটাজ করে চালিয়ে নিতে পারব। আর আমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাব না, তাহলে তোমাদের মত বর পেতে চাইবে। তার পরিণতিটা তো তোমার জানা। তার চেয়ে মেয়ে মূর্খ থেকে দিন-মজুরের কাজ শিখুক—বিয়ে করুক একটা খেটে-খাওয়া মানুষকে —সুখী হবে।

আমি আর কোন কথা বলতে পারি নি প্রেমা। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। আসার সময় মা মেয়ের অগোচরে আমার স্ত্রীকে দেওয়া ঘড়িটা ওদের বাড়ীতে রেখে এসেছিলাম। প্রতিদিন ভাবতাম ঘড়িটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে ও হয়ত একবার আসবে, কিন্তু ও আর আসে নি।

অনেকক্ষণ দুজনে বসে রইল চুপচাপ। হুইস্কির বোতলটা এক সময় নিঃশেষে ঢেলে নিয়ে কয়েক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ পিল্লাই। প্রেমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, আজ তোমার ঘরে আমার প্রবেশ ও প্রস্থানের নাটকটুকুকে বেমালুম ভুলে গেলে খুশি হব প্রেমা।

প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মিঃ পিল্লাইএর দুটো হাত ধরে বলল, আপনি আমার বন্ধু মিঃ পিল্লাই। যে বন্ধুত্বে সময়ের সীমা অথবা বয়সের বেড়া নেই। শুধু প্রয়োজনের দিনে নয় অপ্রয়োজনে অসময়েও আমার দরজা খোলা থাকবে আপনার জন্যে।

মিঃ পিল্লাই প্রেমা মেননের মোমের মত নরম দুটো হাত নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে একটু চাপ দিলেন। পরে মুঠোটা হাল্কা করে দিয়ে বললেন, প্রেমা, আবেগপ্রবণতা মানুষের একটা ধর্ম কিন্তু ঐ ইমোশানকে সংযত করার ভেতরেই রয়েছে শ্রী। বিশটা বছর আগে আজকের প্রেমা মেনন যদি আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াত তাহলে দেহ আর মনের যে বিপ্লব ঘটে যেতে পারত তা আজ আর সম্ভব নয়। আমি জানি তেমন কিছু যদি এই মুহূর্তে ঘটেও যায় তাহলেও তা স্থায়ী হবে না। কারণ সেটা ঘটবে তোমার অস্থায়ী একটা ভাবপ্রবণতার ওপর।

হাতটা ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, কারণে-অকারণে

আসব তোমার কাছে, বন্ধু হয়েই আসব কিন্তু সংগী হতে নয়, সাহায্যকারী বন্ধু হিসেবে আর তাতেই আমার সুখ প্রেমা। এর বেশী কিছু ভাবনা আজ আর আমার দিক থেকে নেই।

মিঃ পিল্লাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দিন শেষের যে আলোটুকু জানালা দিয়ে এসে পড়ে সমস্ত পটভূমিকে দৃশ্যমান করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে ঘর খানিকে আবছায়ায় ভরে দিয়ে গেল। প্রেমা আলো জ্বালবার কোন চেষ্টাই করল না। কোচের ওপর সমস্ত শরীরটাকে ভেঙে হাতের পাতায় গাল রেখে চুপচাপ পড়ে রইল। চুলগুলো এলেমেলো ভাবনার মত পিঠ বেয়ে বুক উপচে লুটোতে লাগল। সংসার জীবনে ব্যর্থ একটি প্রৌঢ় মানুষের জন্য এক পুষ্পিত তরুণীর মনে কোথা থেকে বর্ষার মেঘ ঘনিয়ে উঠল।

জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের সাজানো মঞ্চে আলোর প্লাবনের ভেতর যখন সাদা নেরিয়দখানা পরে এসে দাঁড়াল প্রেমা তখন করতালি ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহের বাতাস আলোড়িত!

প্রেমা নত হয়ে দর্শকদের নমস্কার জানাতে আবার উঠল করতালি ধ্বনি।

প্রেমা ছন্দিত চরণ ফেলে এগিয়ে গেল সভা পরিচালকের হাত থেকে পুরস্কার নিতে। আশ্চর্য সদৃশ একটি ছবি ফুটে উঠছিল রসজ্ঞ দর্শকদের মনের ওপর। যেন সোয়ান লেকে বিচরণ করছে রাজহংসী আনা পাভলোভা।

ঘনঘন উত্তপ্ত করতালিতে অভিনন্দিত হতে লাগল নর্তকী প্রেমা মেনন।

কিছু বলার জন্য অনুরুদ্ধ হল প্রেমা। জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের সম্পাদক আহ্বান জানালেন। সলজ্জ একটা বিহ্বলতা খেলা করে গেল প্রেমার চোখে-মুখে। মুহূর্তমাত্র। রাজহংসী এবার তার সুন্দর গ্রীবাটি তুলে মাইকের সামনে মুখ নিয়ে দাঁড়াল।

নাচের একটা ছন্দ আছে, সে ছন্দের সঙ্গে আমার আজন্মের পরিচয়। কিন্তু কথার যে ছন্দ আছে, তার সঙ্গে পরিচয় তো আমার নিবিড় নয়। তাই সাজিয়ে সুন্দর করে কথা বলার শক্তি যদি আমি না পাই তাহলে আপনারা আমাকে এ ব্যাপারে অপটু ভেবে ক্ষমা করবেন।

সমুদ্র মন্থনের কাহিনীটি আপনাদের কারু অজানা নয়। দেবতা আর অসুরে মিলে মহাসমুদ্র মন্থন করেছিল অমৃতের আশায়। অমৃত হল সেই বস্তু যাকে লাভ করলে জীবের পার্থিব আর কিছু প্রার্থনা থাকে না। সমস্ত জীবনকে পূর্ণ আর তৃপ্ত করে দেয় একবিন্দু অমৃত।

এখন বাসুকীনাগের রজ্জু ধরে ছন্দের লীলায় মন্দার দণ্ডকে ঘোরাতে

ঘোরাতে সবশেষে দেবতা আর অসুরে মিলে তুলল অমৃত। যে অমৃত নিয়ে তারা এত শ্রম করল, তাই নিয়ে লাগল বিবাদ। শেষে মহাবিষ্ণু এলেন মোহিনীমূর্তি ধরে। সমস্ত বিবদমান দর্শকদের তাঁর নৃত্যছন্দে মোহাবিষ্ট করে হরণ করে নিয়ে গেলেন অমৃতকুম্ভ। যারা অমৃতের যথার্থ দাবীদার তারা কিন্তু পেল না অমৃতের স্বাদ।

আমার পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারটিকে আমি ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে অনুরোধ করি। আপনাদের সামনে যাঁরা নৃত্য পরিবেশন করে গেলেন, তাঁরা কিন্তু তাঁদের সাধনার ফলস্বরূপ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের পুরস্কারটি পেলেন না। আমি বিনা সাধনা আর শ্রমে দর্শকদের নাচের যাদুতে ভুলিয়ে পুরস্কারটি হরণ করে নিয়ে গেলাম।

তাই আজ সবিনয়ে আমার অগ্রজ শিল্পীদের জানাই এ মহামূল্য রত্নের অধিকারী তাঁরা সকলেই, আমি শুধু ভাণ্ডারী হয়েই রইলাম।

করতালি আর অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে প্রেমা মঞ্চের আড়ালে চলে গেল।

অ্যাসোসিয়েশানের সম্পাদক আর একটি সংবাদ ঘোষণা করলেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ এক-একজন শিল্পী আমন্ত্রিত হবেন দিল্লীর দরবারে। সেখানে তাঁরা সরকারী মহামান্য অতিথির সামনে পরিবেশন করবেন নৃত্য। সর্বভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘ আবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীকে নির্বাচন ও পুরস্কৃত করবেন। বলা বাহুল্য আমাদের কেরালার উদীয়মান তারকা মিস মেননও দিল্লীর অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তাঁর শক্তির স্বাক্ষর রাখবেন।

দিল্লীর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। একটি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে যে শিল্পী সে কত্থকগুরু অনন্ত মহারাজের শিষ্যা কনক পাণ্ডে।

মাধবী আম্মা উপস্থিত ছিলেন আসরে। গুরু পাণিকৃকর, অনন্ত মহারাজ, গোপীকান্ত দাস, গুরু শ্রীনিবাসন, সকলেই ছিলেন নিমন্ত্রিত অতিথি।

বিচারের সময় বার্তাজীবীরা ভোট দিলেন, কিন্তু সভার কাজ চালাবার দায়িত্ব দেওয়া হল মাধবী আম্মার ওপর।

আশ্চর্যভাবে অ্যাসোসিয়েশান-মেম্বারদের ভোট দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। গণনায় সমান সমান ভোট পেল প্রেমা মেনন আর কনক পাণ্ডে। এখন

সমস্যার সমাধান করবেন সভা পরিচালিকা। কাস্টিং ভোট তাঁর হাতে। মাধবী আম্মা নির্দ্বিধায় কনক পাণ্ডের অনুকূলে তাঁর ভোটটি দিয়ে দিলেন।

কনক পাণ্ডে উঠে এল আলোকিত মঞ্চে। মাধবী আম্মা নিজের হাতে তার মাথায় পরিয়ে দিলেন বিজয়িনীর রৌপ্য মুকুট।

করতালি ধ্বনি উঠল প্রেক্ষাগৃহে।

বার্তাজীবী আসোসিয়েশানের সভাপতি এবার মঞ্চে আহ্বান করলেন প্রেমা মেননকে।

প্রেমা সামনে বসেই কনক পাণ্ডের পুরস্কার নেবার সময় করতালি দিচ্ছিল। সভাপতির ডাকে একটু অবাক হল সে। আসন ছেড়ে লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ির ওপর পা ফেলে উঠে এসে দাঁড়াল মঞ্চে।

আশ্চর্য! প্রেমার মঞ্চে উপস্থিতিই একটা চাঞ্চল্য এনে দিল সারা প্রেক্ষাগৃহে। সেই গ্রীক ভাস্কর্যের একটি অবিস্মরণীয় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা। দর্শকেরা স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে অভিনন্দিত করছে সেই মূর্তিকে।

সভাপতি বললেন, বার্তাজীবী সঙ্ঘ মনে করেন কথক নৃত্যশিল্পী মিস কনক পাণ্ডে আর মোহিনী আট্টম শিল্পী মিস প্রেমা মেনন এই অনুষ্ঠানের যুগ্মবিজয়ী। কারণ তাঁরা সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছেন নির্বাচন অনুষ্ঠানে। অবশ্য সভা-পরিচালিকার কাস্টিং ভোটটি গিয়েছে মিস পাণ্ডের অনুকূলে। তাই বিজয়িনীর মুকুট তিনিই লাভ করেছেন।

আমরা এই সর্বকনিষ্ঠা অথচ অসাধারণ প্রতিশ্রুতিময়ী শিল্পীকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে চাই। আমরা শিল্পীকে আমাদের স্মারক চিহ্নরূপে রুপার নূপুর জোড়া উপহার দেবার অঙ্গীকার করছি।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করল প্রেমা। উচ্ছ্বাসে করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষামঞ্চ যেন ফেটে পড়ল।

অঝোরে কাঁদছিল প্রেমা। বুকের সবটুকু ব্যথা নিঃশেষে উজাড় করে দিচ্ছিল সে। নিঃসঙ্গ ঘরে একা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাসে ভরে তুলছিল বাতাস।

ঈর্ষা নয়, ক্ষোভ নয়, জীবনে প্রথম পরাভবের একটা ব্যথা। তিলে তিলে

সন্তানের ভাবনায় তদ্গত জননী প্রথম প্রসবে প্রাণহীন শিশুর মুখ দেখলে যেমন ভেঙে পড়ে শোকে ঠিক তেমনি এক প্রতিকারহীন শোকের ঢেউ উঠে আসছিল প্রেমার বুক ঠেলে।

বাইরে কেউ প্রেমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘরের ভেতর দু-তবার মিষ্টি আওয়াজ তুলে বেলটা বেজে উঠেছে।

প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে নিজেকে একটু স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করল।

দরজা খুলতেই ঢুকলেন মাধবী আম্মা। ঢুকেই প্রেমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। প্রেমা প্রথমে মাথাটা নীচু করল, তারপর চিরদিনের অভ্যেস মত এগিয়ে গিয়ে মাধবী আম্মার জানু স্পর্শ করল। মাধবী আম্মা প্রেমার মাথায় হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমার রুদ্ধ চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। প্রেমা নতজানু হয়ে বসে মাধবী আম্মার দুই জানুর ভেতর মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

মাধবী আম্মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, জীবনে হেরে যাবারও দরকার আছে প্রেমা। পরাজয়ের দুঃখকে না জানলে জয়ের আনন্দকে ঠিকমত বোঝা যায় না। সবে তো জীবনের শুরু হল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হতে হবে। ঐ আঘাত সইবার শক্তি যখন আসবে তখনই শুরু হবে সত্যিকার জয়যাত্রা। উঠে দাঁড়াও, তুমি তো জান, আমি হতাশাকে কখনও প্রশ্রয় দিই না।

প্রেমা উঠে দাঁড়াল। মাধবী আম্মা বললেন, কি বিচ্ছিরি মুখের চেহারা হয়েছে কেঁদে কেঁদে। চুলগুলো খড়কুটোর মত ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে। যাও, মুখে জল দিয়ে এসো। চিরুণীটা দাও আমার হাতে।

চিরগম্ভীর প্রশান্ত মুখ মাধবী আম্মার। সুখে দুঃখে অচঞ্চল মূর্তি। প্রেমা বাধ্য শিশুর মত হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসল মাধবী আম্মার সামনে। মাধবী আম্মা চুল বাঁধতে লাগলেন। ঠিক যেমনটি করতেন প্রেমার কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলিতে।

চুল বাঁধা শেষ হলে বললেন, ঘুরে বস আমার দিকে।

প্রেমা একেবারে বাধ্য মেয়েটি। মাধবী আম্মার দিকে ফিরে বসল সে। নিটোল সুন্দর মুখখানা বৃষ্টি শেষের প্রকৃতির মত শান্ত নিশ্চুপ। মাধবী আম্মা প্রেমার চাপা থুতনীতে হাত দিয়ে নীচু মুখখানা তুলে ধরতেই মেঘভাঙা একটুকরো আলো সে মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

মাধবী আম্মা বললেন, তোমার মুখে মেঘরৌদ্রের খেলা প্রেমা। তুমি জীবনে অবিমিশ্র সুখ পাবে না, অফুরন্ত ভালবাসা পাবে মানুষের।

প্রেমা বলল, আশীর্বাদ করুন যেন তাই পাই। সুখী না হতে পারলে আমার ভাগ্য বলে মেনে নেব, কিন্তু ভালবাসাটুকু আমার চাই।

মাধবী আম্মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ অনুষ্ঠানের শেষে কথকগুরু অনন্ত মহারাজ স্টেজের ওপর এসেছিলেন। এসেই বললেন, আপনি আপনার ছাত্রীর ওপর সুবিচার করেন নি। ও অনেক বড় শিল্পী। কনকের অনুশীলন প্রশংসার দাবী রাখে ঠিক কিন্তু প্রেমার আত্মপ্রকাশ বড মনোহর। এমন তদ্গত শিল্পী আমার এতখানি বয়সে আমি খুব কম দেখেছি।

পাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা একবাক্যে ওঁকে সমর্থন করলেন।

আমি বললাম, গুরু মহারাজ, আপনি কি আশা করেছিলেন আমি আমার ছাত্রীকে ভোটটা দিয়ে দেব। না আপনি যদি আমার আসনে বসতেন তাহলে কনককে ভোটটা দিয়ে দিতেন?

আমি প্রেমার ছোটখাট ত্রুটিগুলো জানি, তাই ভোট দেবার সময় সেগুলোই আমার চিন্তায় এসেছে। ওর যা গুণ সে তো ওর অধিকারে রইলই আর ওর ত্রুটির জন্যে এই হারটুকু ওকে মেনে নিতে হল। আপনার আন্তরিক আশীর্বাদের কথা প্রেমাকে আমি বলব।

একটু থেমে বললেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ গুরুরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন প্রেমা। তোমার উচিত ছিল তাঁদের চরণবন্দনা করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে নেওয়া।

প্রেমা বলল, আমি তা করেছি আম্মা। একমাত্র গুরু অনন্ত মহারাজ উঠে চলে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে আমি পাইনি।

মাধবী আম্মা বললেন, আমি আবার আশীর্বাদ করে যাচ্ছি প্রেমা, তুমি হয়ত জীবনে দুঃখ পাবে, কিন্তু তোমার মত কোন শিল্পী এত ভালবাসা পাবে কিনা সন্দেহ।

মাধবী আম্মা চলে গেলেন। একটা বিষণ্ণ বেদনার গুরুভার প্রেমার বুক থেকে নেমে গেল। প্রেমার মনে হল তার সারা শরীরটা যেন লঘু হয়ে গেছে। সে প্যাড টেনে নিয়ে খুব সরস হাল্কা ভঙ্গীতে অনুষ্ঠানের ফিরিস্তি দিয়ে সরিতাকে একখানা চিঠি লিখতে বসল।

লেখা কিন্তু কয়েক ছত্র এগিয়েই থেমে গেল। বাইরে কেউ প্রতীক্ষা করছেন। ঘরের ঘণ্টা বেজে উঠে প্রেমাকে তা জানিয়ে দিল।

প্রেমা আবার উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

হোটেলের বেয়ারা হাতে একখানা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রেমা কার্ডে চোখ বুলিয়ে দেখল, দেরাদুনের লালসিয়া স্টেটের এক কুমার বাহাদুর তার দর্শন প্রার্থী। নাম জয়কিষণ গর্গ।

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চকিতে সময়টা দেখে নিল প্রেমা। নটা বেজে সাঁইত্রিশ। এখনও অপরিচিতের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময় পেরিয়ে যায়নি।

বেয়ারাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে বলে প্রেমা সরে গেল ড্রেসিং টেবিলের কাছে। নিজের সারা শরীরটার ওপর দিয়ে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। টিপয়ের কাছে এসে ফুলদানির ফুলগুলো ঠিকঠাক করল। বুক সেলফ থেকে টেনে নিল একটি পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু, 'মোহিনী আট্যম'। সোফায় বিশেষ ভঙ্গীতে বসে ধীরে ধীরে পাতা ওল্টাতে লাগল।

দরজা খোলা, শুধু গ্লাস-ডোরটা ভেজান। বই-এর পাতার ওপর দিয়ে প্রেমার চোখ মাঝে মাঝে নাচের উল্লোকিত মুদ্রায় দরজার ওপর গিয়ে পড়ছিল আবার ফিরে আসছিল। ভোমরা একবার ফুলের ওপর বসছিল আবার উড়ে গিয়ে চারদিকে চক্কর দিয়ে যথাস্থানে ফিরে আসছিল।

জুতোর শব্দ দূর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কয়েকটি পায়ের সম্মেলক আওয়াজ বলে মনে হল। দরজার কাছে এসে থেমে গেল শব্দ। কয়েক মুহূর্ত। বইটা একহাতে ধরে উঠে দাঁড়াল প্রেমা। কি আশ্চর্য! তার সামনে কে যেন একটা গ্লাস পেইন্টিং করে রেখে গেছে।

একটি বছর দশেকের মেয়ে বুকে একটা ফুলের বাঞ্চ ধরে রেখেছে। দুধের মত সাদা একটা কন্টেনার। তার থেকে উঁকি দিচ্ছে ভায়োলেট রেড আর ইয়োলো কয়েকটা গ্ল্যাডিওলাস। তাকে সাজান হয়েছে তারার মত কটি জিপসি আর লেডি লেস দিয়ে। ইতস্ততঃ ফারের সবুজ পাতা ছড়ান।

মেয়েটি পিঙ্ক একটা ফ্রক পরে শোকেসের ভারী আকর্ষণীয় পুতুলের মত স্থির হয়ে আছে। আর ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে সুপুরুষ এক ভদ্রলোক। ধবধবে সাদা চুড়িদারের ওপর গলাবন্ধ একটা মুগা রঙের আচকান। সকলের চোখ প্রেমার ওপর।

প্রেমা হাতের বইটা রেখে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ওকে এগিয়ে যেতে দেখে বেয়ারা গ্লাস ডোরটা ওপন করে ধরে রইল।

প্রেমাকে নত করে ওরা ঢুকে এল ঘরে। মৃদু হাসিতে প্রত্যভিবাদন জানাল প্রেমা।

বেয়ারা দুটো দরজাই ভেজিয়ে রেখে চলে গেল।

মেয়েটি সুন্দর কণ্টেনারসহ ফুলের বাক্স এগিয়ে দিল প্রেমার দিকে। প্রেমা একমুখ হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে ধরে নিল উপহার। বেড সংলগ্ন বুক সেলফের ওপর রাখল যত্ন করে। হাত দেখিয়ে বসতে বলতেই ওরা সোফায় বসল।

প্রেমা কুমারবাহাদুরের দিকে চেয়ে বলল, জাস্ট আ মিনিট প্লীজ।

বলেই প্রেমা ঘরের কোণে গিয়ে নীলাভ একটা জলভরা জাগ নিয়ে এসে ফুলের কণ্টেনারের ভেতর খানিকটা জল ঢেলে দিল। মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, তোমার যাবার সময় ভাসটা আমি প্যাক করে দেব।

কিশোরী মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, ও নো নো আনটি, ওটা তোমার জন্যেই এনেছি।

কুমার বাহাদুর ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রেমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঐ ভাসটি আমার বাবা ইন্দ্রনারায়ণ জাপান থেকে এনেছিলেন। দেখুন ওর গায়ে জাপানী পেইন্টিং।

প্রেমা কাঁধটা বেঁকিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। একটা ডালে চেরিফুল আর তারই পাশের ছোট্ট একটা ভাঙা ডালে সোনালী রঙের লেজ ঝোলা একটা পাখি।

প্রেমা এক ঝলকে মুখটাকে আগন্তুকদের দিকে ফিরিয়ে বলল, ওয়াণ্ডারফুল।

এগিয়ে এসে আবার ওদের বসতে অনুরোধ করল। ওরা বসলে প্রেমা বসতে গিয়েও বসল না। উঠে দাঁড়িয়ে বেলটা বাজাল।

বলল, কফিতে আশাকরি আপত্তি থাকবে না?

কুমারবাহাদুর ঈষৎ মাথা নীচু করে হাসলেন।

আর তুমি কি খাবে বল? আচ্ছা আইসক্রিম আনাই।

কুমার জয়কিষণ বললেন, ওটা ওর খুবই প্রিয়।

বেয়ারা এল। অর্ডার নিয়ে সার্ভ করে চলে গেল। ওরা কথা বলতে লাগল।

প্রথমেই প্রেমা বলল, কি নাম তোমার?

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। বলল, শ্রাবন্তী গর্গ।

বলেই বাবার দিকে চেয়ে হাসল।

প্রেমা বলল, হাসলে যে, নিশ্চয়ই আর একটা কিছু নাম আছে তোমার?

কুমারবাহাদুর বললেন, দোলন। ওর মায়ের দেওয়া নাম। উনি বাঙালী ছিলেন।

প্রেমার একটু চমক লাগল। ও কথাটা ঠিকমত অনুধাবন করতে পারেনি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বলল, ওঁকে সঙ্গে আনলে খুশি হতাম।

জয়কিষণের কমনীয় ব্যক্তিত্বে ভরা মুখখানার ওপর হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে উঠল। নিজেকে মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললেন, উনি আজ চার বছর মারা গেছেন।

প্রেমা বলল, ও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, ক্ষমা করবেন।

কুমার জয়কিষণ বললেন, আমার মেয়ে আপনার কাছে আজ একটি অনুরোধ জানাতে এসেছে। জানি না আপনার সম্মতি পাব কিনা।

বলুন।

দোলনই কথা বলল, আপনাকে এ বছর আমাদের উৎসবে আসতে হবে আনটি। আপনার নাচ আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

প্রেমা কিশোরী দোলনের মুখে তার নাচের প্রশংসা শুনে খুশি হল। সে বুঝল নাচটা কেবল এই ছোট মেয়েটিরই ভাল লাগেনি কুমারবাহাদুরেরও ভাল লেগেছে।

প্রেমা বলল. কিসের উৎসব তোমাদের? আমি তো দেরাদুনের দিকে কথনো যাইনি।

এবার কথা বললেন কুমার জয়কিষণ, ওর মা বাংলা দেশের মেয়ে ছিলেন। বিশেষ খানদানি পরিবারের মেয়ে। ক্ল্যাসিক্যাল গান আর নাচের শিক্ষা পেয়েছিলেন নামকরা গুরুদের কাছ থেকে। আমাদের পরিবারের একটি শাখা বহুপূর্বে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বিরাট জমিদারী পত্তন করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এই পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। একসময় আমি আর আমার বাবা বাংলাদেশে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে পরিচিত হই। সেই যোগসূত্রেই একটা বৈবাহিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। কিন্তু আমার বিয়ের দু বছর পরে বাবা মারা যান আর ঠিক সাত বছর যেতে না যেতেই দোলন তার মাকে হারায়।

কুমার জয়কিষণ একটু থামলেন। সম্ভবত কুমারবাহাদুর নিজেকে একটুখানি স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করলেন। তাছাড়া অপরিচিতার সামনে অতিরিক্ত কিছু বলে ফেলে হয়ত অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি।

প্রেমা বলল, আমি আমার গুরু মাধবী আম্মার মুখে বাংলার বিখ্যাত নর্তকী

মেনকা দেবীর কথা শুনেছি। তাঁর সোলো, ডুয়েট, গ্রুপ ডান্স আর ব্যালে ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। কৃষ্ণলীলা, দেববিজয় নৃত্য, মেনকা লাস্যম, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি নাচের ভেতর দিয়ে তিনি সারা ভারত এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আলোড়ন তুলেছিলেন। শুনেছি বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইন্টার ন্যাশনাল ব্যালে অলিম্পিয়াতে সতেরটি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তিনিও তাঁর নীজের গ্রুপটি নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তিন তিনটে প্রাইজ ছিনিয়ে এনেছিলেন তিনি।

মাধবী আম্মা বলতেন, যদিও মেনকাদেবী লক্ষ্ণৌ ঘরানার কথকে স্পেশালাইজ করেছিলেন তবু তিনি ভারতনাট্যম কথাকলি আর মণিপুরী শিখেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁর ব্যালেতে নাকি সবরকম নাচের আশ্চর্য সংমিশ্রণ থাকত।

একটু থেমে প্রেমা বলল, আপনার বাঙালী স্ত্রীর কথা বললেন তাই গুণী একজন বাঙালী নর্তকীর কথা মনে পড়ে গেল।

জয়কিষণ বললেন, না না আমার স্ত্রী এত বড় কিছু ছিলেন না তবে নাচ-গান তিনি খুবই ভালবাসতেন। আমার লালসিয়া স্টেটের অরণ্য-নিবাসে একটি নাটমণ্ডপ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। তিনি সেখানে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর তাঁর পরিচিত শিল্পীদের রাস অথবা অন্য কোন সময়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন। কদিন নাচে-গানে উৎসবে মেতে থাকত আমার নির্জন অরণ্য-নিবাস।

সেই থেকে প্রতি বছর তাঁর স্মৃতিটুকু মনে রেখে আমি আর দোলন সামান্য উৎসবের আয়োজন করি। ভারতের এক একজন শ্রেষ্ঠ গুণীকে সম্মান জানাই সেই উৎসবে। তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর নৃত্য পরিবেশন করেন।

একটু থেমে বললেন কুমার জয়কিষণ, এবার দোলন আপনার নাচ দেখে বড় খুশি হয়েছে। সে আপনাকে তার মায়ের স্মৃতি-মঞ্চে নিয়ে যাবার জন্যে আমার কাছে বায়না ধরেছে। আমি বলেছি তুমি নিজে গিয়ে তাঁর সম্মতি পেলে বসন্তের মধুরাসে তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করব।

প্রেমা চোখ দুটো ওদের মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিল নিজের দিকে। একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, বসন্ত রাসের আর বাকী কতদিন?

এখনও প্রায় দেড় মাস সময় রয়েছে।

প্রেমা চেয়ে দেখল, দোলন বড় বড় দুটো উৎসুক চোখের দৃষ্টি তার মুখের ওপর পেতে রেখেছে।

প্রেমা আর কিছু ভাবল না। সামান্য পরিচয়ের দ্বিধা দোলনের সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে দূর হয়ে গেল।

এবার হাত বাড়িয়ে দোলনকে কাছে টেনে এনে বলল, তুমি তোমার মায়ের স্মৃতিমকে নাচার জন্যে ডাকতে এসেছ, কেউ কি তোমার এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে।

প্রেমার সম্মতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভরে উঠল দোলনের মুখ। সে হঠাৎ প্রেমার হাতখানা তুলে ধরে চুমু খেয়ে বলল, আনটি তুমি দারুণ ভাল।

প্রেমা তাকে তার কোচের হাতলের ওপর টেনে বসিয়ে বলল, তুমি নাচ শেখনি ?

জয়কিষণ বললেন, পাঁচ ছ'বছর যখন ওর বয়স তখন ওর মা-ই ওকে গান গেয়ে গেয়ে হাতে তালি দিয়ে নাচ শেখাতেন। সে নাচ বলতে পারেন ডল-পুতুলের হাত-পা নাড়ার মত।

প্রেমা বলল, আমি আপনার ওখানে যাবার ব্যাপারে কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে রাজী হয়ে গেলাম কেন জানেন ? দোলনের মায়ের মত আমার মাও ছিলেন নর্তকী আর প্রায় দোলনের বয়সেই আমি আমার মাকে হারিয়েছিলাম।

কুমার জয়কিষণ বললেন, দোলনের ভাগ্যে শুভ যোগাযোগ বলতে হবে। না হলে আপনার মত শিল্পীকে এক কথায় কি করে পাওয়া গেল ভাবতেই পারছি না।

প্রেমা হেসে বলল, আমি আদপেই বড় শিল্পী নই। আমি এখনও শিক্ষার্থী। কত্থক আর মণিপুরী এখনও ভালমত রপ্ত করতে পারিনি। আমার মতে যে কোন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ একজন শিল্পীর সব কটি ক্ল্যাসিক্যাল নাচের তালিম নেওয়া দরকার।

আমার স্ত্রীও কিন্তু আপনার মত একই কথা বলতেন। তিনি আরও একটি কথা বলতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু লোকনৃত্যের দল আছে। তাদের নাচও লক্ষ্য করতে হবে। দেহের অনেক স্বাভাবিক মুভমেণ্ট সেখান থেকে শেখা যায়।

প্রেমা বলল, আপনার স্ত্রী সত্যিকারের গুণী ছিলেন।

কুমারবাহাদুর অন্যমনস্ক হলেন। এক সময় ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, সাড়ে দশটা বাজে। আপনার বিশ্রামের অনেকখানি সময় নিয়ে নিলাম।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পেনটা বের করে পকেট ডায়েরীর পাতায় লিখে নিলেন প্রেমার ঠিকানা। বললেন, আপনার সহযোগীদের নিয়ে আপনি আসুন। ত্রিবান্দ্রম থেকে প্লেনে আসতে পারবেন। দিল্লীতে আমার লোকেরা

আপনাদের নিয়ে যাবার জন্তে অপেক্ষা করবে। চিঠিতে আমি আপনাকে সবকিছু জানিয়ে দেব।

এবার নমস্কার করলেন কুমারবাহাদুর। প্রেমা প্রতি নমস্কার করল। দোলনের হাত ধরে দরজা অব্দি এগিয়ে এল। ওরা বিদায় জানিয়ে চলে গেলে প্রেমা চিঠি লিখতে বসল সরিতাকে।

দুষ্টু সরিতা, কি করছিস এখন তুই? আমার কথা ভাবছিস নির্ঘাৎ। ভাবছিস নরেলটা আমার কপালেই জুটেছে। তাহলে ঐ ভেবেই বসে থাক। নারে ভাই একটুর জন্যে ফস্কে গেল। মাথার মুকুট মিলল না, বদলে পায়ের নূপুর পেলাম। বাড়ী গিয়ে বলার জন্যে সব তোলা রইল। আগামী কালের ফ্লাইটে মাদ্রাজ যাব। ওখানে যামিনী কৃষ্ণমূর্তি আর স্বধা শেখরের কুচিপুদি নাচের প্রোগ্রাম আছে। চার পাঁচদিন ওখানে কাটিয়ে ফিরব।

হাঁ আর একটা গ্রেট নিউজ আছে। একটু আগে দেরাদুনের লালসিয়া স্টেটের বিপত্নীক কুমারবাহাদুর তার দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে আমার স্থইটে এসেছিলেন। তিনি আমাকে তার স্টেটের নাটমণ্ডপে নাচার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। নাচের কাল—বসন্ত। আহ্বায়ক—বিপত্নীক রাজকুমার। স্থান—নির্জন অরণ্যনিবাসের মনোরম মঞ্চ।

এখন বল, মত না দিয়ে কি পারি? ভাবছি শেষে আবার একটা না সাউণ্ড অব মিউজিক হয়ে যায়।

এগারোটার ঘরে কাঁটা ছুঁই ছুঁই, কলম রাখছি। অনেক আদর রইল।

প্রেমা।

প্রেমা বলল, বল তুই কেন যাবি না?

সরিতা বলল, তোর সাউণ্ড অব মিউজিকের নায়িকা কি তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়েছিল?

প্রেমা অনুনয়ের স্থর গলায় তুলে বলল, প্লিজ সরিতা তুই ছাড়া সোল্লুকট্টু, স্বরযতি বর্ণম্ পদম্ ইত্যাদি কে গাইবে বল? মাধবী আম্মাকে তো আর বলা যাবে না।

সরিতা বলল, তুই ক্ষেপেছিস, আমার পরীক্ষা না? অ্যানুয়াল পরীক্ষায় অ্যাবসেন্ট থাকলে প্রমোশান দেবে ভেবেছিস? প্রিন্সিপাল বড় কঠিন ঠাঁই।

প্রেমা এবার সত্যি চিন্তায় পড়ল। হঠাৎ এক সময় একটা বুদ্ধির জোনাকী ঝিলিক দিতেই সে বিছানার ওপর উঠে বসল।

আচ্ছা দেখ সরিতা তুই যদি একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিস অসুস্থ বলে।

সরিতা বিজ্ঞের মত বলল, অত সহজ নয় মশাই। বড় রোগের সার্টিফিকেট বড় কোন ডাক্তার দিতে চাইবেন না। দু-চার দিনের পেট কামড়ানো অথবা দাঁতে ব্যথার সার্টিফিকেট মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু তোমার যাওয়া আসা থাকা সব মিলিয়ে আমার তো মনে হয় খুব কম হলেও পনেরো দিনের এদিকে নয়। তারপর যদি কোন নাটক দৈবাৎ শুরু হয়ে যায় তাহলে তো সময়ের সীমা থাকবে না।

প্রেমা শুয়ে পড়ল। একটা চাদর গায়ের ওপর টেনে নিতে নিতে বলল, তুই একটা ওয়ার্থলেস সরিতা। ঘটে যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকে। একটা সামান্য উপায় বের করতে পারলি না।

সরিতা প্রেমার কথার ধারকাছ দিয়েও গেল না। সে হঠাৎ বলল, হাঁরে দিদি, কুমারবাহাদুরের স্ত্রী বাঙালী ছিলেন বললি না?

হাঁ দারুণ গুণী মহিলা ছিলেন। নাচে-গানে ওস্তাদ।

সরিতা বলল, বাঙালীরা বড় গুণী হয় তাই নারে দিদি?

প্রেমা বলল, টেগোর নেতাজী স্বামীজী উদয়শঙ্কর রবিশঙ্কর এঁরা তো সব বাঙালী।

সরিতা বলল, বাস্তবিক একটা গুণীর জায়গা বটে। যদি কোনদিন বিয়ে করি তাহলে বুঝলি দিদি একটা বাঙালী দেখেই করব, কি বল?

প্রেমা বলল, তেমন তেমন পেলে করিস।

সরিতা অমনি বলল, তুই খুব ভাল দিদি।

প্রেমা এবার বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, কি ব্যাপার বলত? নতুন একটা জায়গায় ভি আই পি ট্যুর দেবার জন্যে ডাকলাম তোকে, রুচি হল না। পড়াশোনা ছেড়ে দেবার জন্যে রোজ যার বায়নাক্কা সে হঠাৎ অ্যানুয়াল পরীক্ষার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। তারপর বাঙালী বিয়ের জন্যে আর্জি পেশ। সব ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে ঠেকছে। হাঁরে সরিতা সত্যি করে বল, প্রেমে পড়েছিস? কোন দারুণ ট্যালেন্টেড বাঙালী কি আমাদের কেরালায় এসেছেন? তোর সঙ্গে আলাপপরিচয় হয়েছে নাকি রে?

মুষড়ে পড়ল সরিতা। তার ইন্দু এমন কিছু ট্যালেন্টেড নয়। সে তবু

গলায় জোর এনে বলল, দেখ দিদি, সঙ্গী নির্বাচনে আমি ট্যালেন্টের চেয়ে সিনসিয়ারিটিতে বিশ্বাসী। প্রতিভা খুব বড় জিনিস, কিন্তু প্রতিভাবানের বউ হওয়া দারুণ একটা সুখের ব্যাপার নয়। লোকটাকে কোনদিনই একান্তে নিজের মত করে পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে বউ-এর ওপর টান আর কর্তব্যবোধ আছে এমন মানুষ আমার অনেক বেশী পছন্দ।

প্রেমা বলল, আমার নয়।

কেন ?

চিরদিন প্রতিভার পূজা করে এসেছি বলে।

তোর কথাই আলাদা। হাজারটা মেয়ে তো আর তোর মত নয়।

প্রেমা বলল, তা না, কথাটা হল, আমি কি নিয়ে থাকব। আমার নাচের শেষে যদি আমার স্বামী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আমার পাপ্য টাকা পয়সা বুঝে নিতে ব্যস্ত থাকে কিম্বা আমার সাজপোশাক গোছগাছের কাজে লেগে যায় তাহলে কি রকম লাগবে বল তো ? সাহায্যকারী হিসেবে হয়ত তাকে তারিফ করা যায় কিন্তু স্বামী হিসেবে পুরোপুরি তাকে মেনে নেওয়া যায় কি ?

সরিতা বলল, আমি অতি সাধারণ তাই আমার সাদামাটা একটা স্বামী হলেই চলবে। দুজনের মন বুঝে চলতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু অনেক উঁচু কিছু হলে তার দিকে তাকাতে গিয়ে পায়ে পায়ে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা।

প্রেমা বলল, রাত অনেক হয়েছে, এদিকে আমাদের আজই বিয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, অতএব স্বামী চিন্তা ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়।

তথাস্তু।

মুখে কথাটা বললেও মনে মনে বলল, নামেই শুধু প্রেমা, প্রেমে তো পড়নি বাছা, পড়লে বুঝতে এ ভাবনার জ্বালা কত! যদি ঘুম এসেও যায় তাহলে স্বপ্নেও সারারাত জাগিয়ে রাখবে।

পরের দিন প্রেমা গাড়ী করে বেরুতে যাচ্ছে সরিতা বলল, যাচ্ছিস কোথায় ?

এই একটুখানি ঘুরে আসছি হোটেলের দিক থেকে।

সরিতা বলল, এত সকালে হোটেলে গিয়ে করবি কি ? জলখাবার তৈরী করছি, খেতে হবে না ?

প্রেমা গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ম্যানেজারটিকে তো সৎ আর এফিসিয়েন্ট বলে মনে হয় তবু সব দিকে নজর না রাখলে ব্যবসা চলে না, সকালে একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দেবার ইচ্ছে ছিল।

সরিতা মনে মনে বলল, তোমার মুণ্ডু। ইন্দ্র কাজ পাগলা। সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে তুমি তার ঘেঁচু করবে।

মুখে বলল, ঠিক বলেছিস, ম্যানেজারদের সব সময় নজরে রাখা ভাল।

প্রেমা বলল, ইন্দ্রকে আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে। ও বেশ সমঝদার বলে মনে হয়।

সরিতা বলল, ভদ্রলোককে আমার তেমন কিছু একটা কেউকেটা বলে মনে হয় না। কেমন যেন ফিলজফার ফিলজফার গোছের মুখের ভাবখানা।

মনে মনে সরিতা বলল ওদিকে দয়া করে আর নজর দিও না। ও আমার একেবারে বশংবদ গোবেচারা। তুমি দিদি প্রতিভাবানদের নিয়ে থাক।

প্রেমা বলল, তোর বড় নাক উঁচু দেখছি সরিতা। মনের মত মানুষ না পেলে তখন দুঃখ পাবি।

দুঃখ কপালে লেখা থাকলে খণ্ডায় কে বল? এই যে দেখ না, কাল রাতে তোকে যাবনা বলে দিলাম আজ সকালে উঠে দেখি, মনটা ভার হয়ে আছে। তাই মনের দুঃখ দূর করতে ঠিক করলাম, তোর সঙ্গেই যাব।

প্রেমা বলল, পাগলামি রাখ, তোর না পরীক্ষা সামনে। পরীক্ষা ফাঁকি দিয়ে সঙ্গে যাবি ভেবেছিস?

তুইও কি ভেবেছিস ঐ বিপত্নীক লোকটার খপ্পরে তোকে একা ফেলে দিয়ে আমি শান্তি পাব।

প্রেমা খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, খেতে দিবি তো চল, মুরুব্বিয়ানা রাখ।

খেতে বসে প্রেমা বলল, গানের লোকের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

কি রকম?

লীলাবতী অনেক দিন থেকে আমার সঙ্গে যেতে চাইছিল। বেচারাকে সব সময়েই অ্যাভয়েড করেছি। এখন নিজের গরজেই ওকে ডাক দিয়েছি।

সরিতা বলল, ইতিমধ্যেই ডাক-হাঁক হয়ে গেছে। রাজী আছে লীলাবতী?

এক পায়ে খাড়া।

সরিতা বলল, দুর্ভাবনা একটা গেল। ওর কজ্জিতে জোর আছে, বুদ্ধিতেও লীলা আছে।

প্রেমা বলল, প্রফেসাররা তোর কথা শুনে নম্বর দেয় না?

সরিতা অমনি বলল, যেমন তোর সুন্দর মুখ দেখে প্রফেসাররা নম্বর দিত।

প্রেমা হেসে ফেলে বলল, তোর মুখখানা কিন্তু অনেক সুন্দর সরিতা। আমার চেয়েও সুন্দর।

সরিতা গম্ভীর হয়ে বলল, বিশ্বকর্মা তোকে গোল্ড প্লেটিং করে ছেড়েছে আর আমি ছটপটে বলে এক পোঁচ কালো রঙ মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নইলে মুখখানা এমন কিছু একটা খারাপ ছিল না।

নীচেব থেকে কাজের মেয়েটি ওপরে উঠে এসে বলল, হোটেল থেকে ম্যানেজার সাহেব এসেছেন। বড মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রেমা অমনি বলল, ওপরে নিয়ে এসো।

মেয়েটি চলে যেতেই সরিতা ফোঁস করে উঠল, তোর আর কাজ নেই ওকে অমনি ওপরে এনে ফেললি। প্রাইভেসি বলতে কিছু রাখলি না।

প্রেমা বলল, সারা রাত বাঙালী বন্দনা করলি এখন আবার হল কি রে?

উত্তর দেবার আর সুযোগ পেল না সরিতা। ইন্দ্রের জুতোর আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

ইন্দ্র ঘরে ঢুকতেই সরিতা সরে গেল।

প্রেমা বলল, আসুন, আমিই হোটেলে যাব ভেবেছিলাম।

ইন্দ্র একখানা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আপনি পরশু এসেছেন তাই না?

পরশু ওপরের ফ্লাইটে।

ইন্দ্র বলল, আপনার সঙ্গে যে আইরিশ নভেলিস্ট এসেছিলেন তিনি এখন আমাদেরই হোটেলের সুইট নাম্বার নাইনে আছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রেমা বলল, একই প্লেনে আসাব সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে আমার হোটেলের কথাও জেনেছিলেন। কিন্তু তাঁর তো প্যালেস হোটেলে ওঠার কথা ছিল।

ইন্দ্র বলল, প্রথমে তিনি প্যালেস হোটেলে গিয়েছিলেন, কারণ ওখানে ওঁর ঘর বুক করা ছিল। তারপর একরাত কাটিয়ে কাল এসে উঠেছেন আমাদের হোটেলে।

প্রেমা বলল, লেখক মানুষ, একটু নজর রাখবেন ওঁর সুখ সুবিধের ওপর। আমাদের কেরালার ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা নভেল লিখতে চান।

ইন্দ্র বলল, লেখক মানুষ, একটু নজর দেবার চেষ্টা করব বৈকি। বিশেষ করে বিদেশীদের সুখ-সুবিধের ওপর হোটেলের সকলেরই সজাগ দৃষ্টি থাকে।

প্রেমা বলল, আমি খানিক পরেই যাচ্ছি হোটেলে, ওঁকে বলে দেবেন।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াতেই প্রেমা বলল, আরে বসুন, উঠছেন কেন! আপনার কাছে গেলে কত ভাল কফি খাওয়ান, আমাদের এখান থেকে না হয় একটু চলনসই কফিই খেয়ে গেলেন।

ইন্দ্র আবার বসল। হেসে বলল, দুটো ঘরই আপনার। এক জায়গায় অনেক দিন থাকলে মুখেরও স্বাদ থাকে না, তখন ঘর বদলালে স্বাদও বদলে যায়।

সরিতা ঘরে ঢুকল ট্রেতে কফি আর কেক নিয়ে।

টিপয়ের ওপর ট্রে রেখে কফির কাপ ইন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে বলল, নিন, আমরা এখুনি ব্রেকফাস্ট করেছি।

সরিতা একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

প্রেমা বলল, জানেন মিঃ রায় সরিতা আপনাদের খুব প্রশংসা করছিল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ইন্দ্র বলল, আমাদের মানে?

বাঙ্গালীদের প্রতিভার।

ইন্দ্র দরাজ হাসি হেসে বলল, তাই বলুন। আমি ভাবলাম বুঝি আমার মত অভাজনের প্রশংসা করেছেন।

প্রেমা বলল, নিজেকে এমন লুকিয়ে রাখছেনই বা কেন। কে বলতে পারে আপনার ভেতর সে প্রতিভা নেই।

ইন্দ্র বলল, আমি কি আপনাদের কাজে কোন গাফিলতি করেছি মিস মেনন?

প্রেমা চমকে উঠল, এ কথা কেন?

ইন্দ্র বলল, এই যে আপনি সকাল বেলা আমাকে নিয়ে মজা শুরু করলেন।

বিশ্বাস করুন, আমি কৌতুক করার জন্যে বলিনি। একেবারে সহজ সরলভাবে বলেছি।

ইন্দ্র খালি খালি কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে দেখে সরিতা বলল, কেকটা টেস্ট করে দেখুন, একধারে সরিয়ে রাখলেন যে।

প্রেমা বলল, ও আপনাকে এমন করে সাধছে কেন বলুন তো?

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, নিজের হাতের তৈরী বলে।

প্রেমা সরিতার দিকে চেয়ে বলল, দেখলি তো জিনিয়াস কাকে বলে।

ইন্দ্র কেকটা হাতে তুলে বলল, এমন করে প্রশংসা শুরু করলেন, যাতে কেকটাকে ভাল বলতেই হয়।

সরিতা ফোঁস করে উঠল, তা কেন, ভাল না লাগলে মুখের ওপর বলবেন।

ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলল, জিনিয়াসের কুলুপ যে আগেই এঁটে দিয়েছেন মুখে। খারাপ সমালোচনার পথই বন্ধ।

প্রেমা বলল, কথাটা আমি উইথড্র করছি। আপনার কোন রকম প্রতিভাই নেই। এখন আশা করি খুশি হয়ে আমার বোনের তৈরী কেকটা খেয়ে যথাযথ মন্তব্যই করবেন।

ইন্দ্র কেকে কামড দিয়ে টেস্ট করল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, সত্যি সুন্দর হয়েছে। বিশ্বাস করুন একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

প্রেমা সরিতার দিকে চেয়ে বলল, তাহলে মিঃ রায়কে একদিন ইনভাইট করে তোর পাকা হাতের রান্নাব পরিচয় দিযে দে।

সরিতা বলল, থাম বাপু, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর যত খুশি রান্না করে তোমাদের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট চালাব।

ইন্দ্র আর প্রেমা সরিতার কথায় এক সঙ্গে হেসে উঠল।

নীল শাড়ির ওপর হীরে সেট করা একটা কণ্ঠহার। ঝিকমিক ঝলমল করে উঠছে। আরব সাগরেব নীল জলে তেমনি সূর্যের হীরে ঝলকাচ্ছে। যদ্দুর দেখা যায় তার জুড়ে সবুজ নারকেল গাছেব সারি। খানিকটা হাঁসুলী-বাঁক নিয়েছে বেলাভূমি। ঢেউএর পরিত্যক্ত ফেনাগুলো ধবধবে রূপোর মত মনে হচ্ছে। একটু আগে পাল তোলা কটা ভাল্লম সমুদ্র চষে কূলে এসে ভিড়েছিল। জেলেরা সেগুলো ডাঙায় তুলে বালির জমানে কাৎ করে রেখে গেছে। কালো কালো জাল ঝেড়ে অনেক রূপোলী মাছ কুড়িয়েছিল ওরা, এখন কোথাও কোন চাঞ্চল্য নেই। কয়েকটা নারকেল গাছেব গুটলার ছায়ায় বড় বড় পাথবের স্তূপ। নির্জন। বেশ খানিকটা উঁচুতে জায়গাটার অবস্থান। তাই নীচ থেকে নারকেল কুঞ্জে ঘেরা জায়গাটা কারো চোখে পডলেও ওপর থেকে নীচের সব কিছুই দেখা যায়।

ওরা সেই সকাল থেকে সমুদ্রের জীবনপ্রবাহ দেখছিল। ডেভিড প্রেমার কোলের ওপব ম্যাসনাইটের একটা টুকরো পেলে লেখার টেবিল বানিয়ে ছোট ছোট কথার স্কেচ বানাচ্ছিল। ধারে ধারে খেয়ালখুশির পেন-স্কেচও চলছিল। কতকটা সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের মত। ঘটনার কথাচিত্রের পাশে গতিশীল ভাবোদ্যোতক সব রেখাচিত্র। বড় উপন্যাসের জন্য উপাদান সঞ্চয়। লেখকের রেখাচিত্রের হাতটিও বেশ সচ্ছন্দ।

আজ চারদিন প্রেমার গাড়ী ঔপন্যাসিক ডেভিড জোনসের তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত। আশ্চর্য একটা খেলার নেশায় মেতে উঠেছে প্রেমা। ডেভিড নিমন্ত্রিত হয়ে গেছে প্রেমার কেটেজমে। সেখানে হল ঘরে সন্ধ্যায় সম্বিতার গানের সঙ্গে নেচেছে প্রেমা। অবাক হয়ে ডেভিড দেখেছে প্রেমার নাচ। কি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা আর মাধুর্য। দেহ সঞ্চালনে দুর্বার এক আমন্ত্রণ ডেভিডকে নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশের জন্য বারবার প্রলুব্ধ করেছে।

ডেভিড বলেছে, প্রেমা, তুমি আমার নায়িকা। ঐ ঢেউয়ের ওপর ট্রপিক্যাল কান্ট্রির সূর্যের তীব্র তীক্ষ্ণ খেলার মত তোমার নাচের ছন্দ। এখানে প্রকৃতি সমুদ্র, নদী, নারিকেল অরণ্য, মানুষ সবার ভেতর আশ্চর্য নাচের লীলা। তুমি এই অবাক পৃথিবীর মধ্যমণি হয়ে থাকবে আমার নভেলে।

প্রেমা কোন কথা বলেনি। সে মোহিনী মুদ্রায় ঘন পল্লবিত চোখের দৃষ্টি হেনে সুন্দর হাসি উপহার দিয়েছে ডেভিডকে।

চারটি দিনের নিবিড় সান্নিধ্যে সময়ের সীমা হারিয়েছে ওরা।

এখন একটা। প্রেমার কোলে ফেলে রাখা ম্যাসনাইটের ওপর সাদা খাতার পাতায় ডেভিডের লেখা চলেছে। হাতের কনুই ছুঁয়ে আছে প্রেমার নিটোল জানুদেশ। একটি বলিষ্ঠ তদ্গত পুরুষের স্পর্শ প্রেমাকে কখনো চঞ্চল করে তুলছে, কখনো বা এলোমেলো স্বপ্ন রচনার প্রেরণা এনে দিচ্ছে। মগ্ন লেখকের মুখের প্রতিটি ভাবান্তর মুগ্ধ আগ্রহে লক্ষ্য করছে প্রেমা।

ডেভিডের লেখা এক সময় থেমে গেল। খাতাখানা তুলে নিয়ে ডেভিড তার ব্যাগে যত্ন করে ভরে নিল। প্রেমার কোল থেকে ম্যাসনাইটের ছোট্ট বোর্ডটা তুলে নিয়ে ডেভিড বলল, এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার প্রেমা।

প্রেমা বলল, কিসের আবিষ্কার ডেভিড?

মানুষের আর তার চারদিকের প্রকৃতির। কত যুগ ধরে কত মানুষ নতুন জনপদ আবিষ্কার করছে, কত লুপ্ত নগরীর রহস্যময় অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করছে, কিন্তু আমার মনে হয় এই সরল সবুজ নারিকেল গাছের নির্জনে এই যে প্রেমা নামের তরুণীটি বসে আছে, তাকে আবিষ্কার করার মত বিস্ময় আর কিছুতে নেই।

প্রেমা ঝর্ণার মত হাসি ঝরিয়ে বলল, আমি এতক্ষণ আমার কোলের ওপর তোমার লেখার সরঞ্জাম রেখেছিলাম, তাই এ পুরস্কার?

ডেভিড বলল, লেখক যদি মালটিমিলিওনীয়ার হত তাহলে তার তৈরী প্রতিটি চরিত্রকে সোনার মুকুট পরিয়ে পুরস্কৃত করত।

প্রেমা বলল, কেন তা হবে, তারা তো লেখকেরই সৃষ্টি। পুরস্কার যদি কারু প্রাপ্য হয় তাহলে তা একমাত্র লেখকের।

তুমি ভুল করছ প্রেমা, তদ্গত ডেভিড বলে উঠল। মা বাবার সম্ভোগ থেকে জন্ম নিল যারা, তাদের স্বভাব, তাদের সৌন্দর্য, তাদের চঞ্চল লীলাখেলার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান তাদের স্রষ্টা। লেখকের অনুভূতিও ঠিক তাই। তার চিন্তার থেকে যে চরিত্রেরা ভূমিষ্ট হল তারা একসময় লেখকের ভাবনার রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। তাই লেখক যখন একান্তে বসে তাঁর নিজের লেখা পড়তে থাকেন, তখন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে আবিষ্ট করে তোলে। মা বাবার অন্তরে আনন্দ দেবার জন্যে সন্তান যেমন পুরস্কৃত হয়, ঠিক তেমনি লেখকের চরিত্রাবলী লেখকের অন্তরের পুরস্কার বার বার পেয়ে থাকে।

প্রেমা বলল, তোমার এ নতুন উপন্যাসে আমাকে নায়িকার চরিত্রে চিত্রিত করে যদি তুমি সফল হও ডেভিড তাহলে তোমার সৃষ্টি হিসেবে নিশ্চিত আমার একটা পুরস্কার জুটবে।

ডেভিড বলল, নিশ্চিত, কিন্তু কি পুরস্কার তুমি চাও প্রেমা ?

প্রেমা বলল, তোমার নিভৃত অবসরে যখন তুমি সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পাঠকের মন নিয়ে পড়বে তখন যদি এই মালাবার উপকূলের মেয়েটিকে তোমার ভাল লাগে, তাহলে তাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

শুধু এই প্রেমা, আর কিছু চাইবার নেই তোমার লেখকের কাছে ! তোমার সামনেই লেখক। আগাম পুরস্কার তার হিরোইনের হাতে তুলে দেবার জন্যে সে তৈরী।

প্রেমা দুষ্টুমির চোখে ডেভিডের দিকে চেয়ে বলল, পুরস্কার তো চাইতে নেই ডেভিড। ওটা হল দাতার খুশির দান। আর তাছাড়া বই-এর চরিত্রেরা রক্তমাংসের জীব নয় যে তারা ইচ্ছে মত চেয়ে নেবে।

ডেভিড বলল, এখানেই তোমার ভুল প্রেমা। শক্তিমান স্রষ্টার হাতে যে চরিত্র জন্ম নেয় তারা রক্তমাংসে গড়া মানুষের চেয়েও জীবন্ত আর উজ্জ্বল। সাধারণ মুখের লাবণ্য যেমন বাড়িয়ে দেয় পরিমিত প্রসাধন, তেমনি সাধারণ চরিত্রকে আরও সুন্দর করে তোলে লেখকের সজীব ভাবনার ছোঁয়া।

প্রেমা বলল, তুমি লেখক ডেভিড, আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে কথায় এঁটে উঠতে পারব।

ডেভিড অমনি বলল, এসো তাহলে চুপচাপ বসে থাকি দুজনে। নারিকেল

পাতার ঝালরের ঝিলমিল আর সমুদ্রের নীলে রোদের সোনার ঝিকমিক খেলা দেখি।

ডেভিড প্রেমার একখানা হাত নিজের দুহাতের পাতায় চেপে ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

প্রেমা বাধা দিল না। একসময় সমুদ্রে হাওয়া দিল। হাওয়ার বেগ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। বেলাভূমির রূপালী বালি উড়তে লাগল। ঢেউগুলো আছড়াতে লাগল গদাম গদাম আওয়াজ তুলে। নারকেল গাছের পাতায় তবলার বোলের মত চড়বড়িয়ে উঠল শব্দ তরঙ্গ। প্রেমার চূর্ণ চুল বার বার উড়ে এসে পড়তে লাগল মুখের ওপর। প্রেমা বাঁ হাতখানা দিয়ে সে চুল সরিয়ে দিল কিন্তু ডেভিডের হাতের মুঠোয় ধরে থাকা ডান হাতটা টেনে নিল না।

প্রেমা হঠাৎ বলল, আচ্ছা ডেভিড সাহিত্যে তুমি নগ্নতাকে স্বীকার কর?

নিশ্চয় করি, বলল ডেভিড।

প্রেমা অবাক হয়ে বলল, নগ্নতা অশ্লীলতা নয়?

ডেভিড জোরের সঙ্গে বলল, একটুও না। এই মুহূর্তে এই নির্জন পরিবেশে একটি তরুণী ধীবর কন্যা যদি সমুদ্র স্নান সেরে নগ্নদেহে বেলাভূমিতে উঠে এসে দাঁড়ায় আর তার যুগল বাহু তুলে ভেজা চুলের রাশ সংস্কার করতে থাকে, তাহলে তার সেই নগ্ন রূপকে তুমি কি অশ্লীল বলবে প্রেমা? তার প্রসারিত বাহুতে রোদের সোনা মেখে সে যদি আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গীতে দেহটাকে দোলাতে থাকে তাহলে কি তোমার মালাবার উপকূলের সবুজ ঋজু ফলবান নারিকেল বৃক্ষের দোলায়িত ছন্দের চেয়ে তাকে অসুন্দর মনে হবে? এর পরেও কথা আছে প্রেমা। নগ্নতা পরিস্থিতি আর পরিবেশ মেনে চলে। সুসজ্জিত মানুষের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে আবার এ নগ্নতা মানায় না।

প্রেমা বলল, তোমার যুক্তিকে মেনে নিয়েও বলব ডেভিড, বহু আধুনিক উপন্যাসকার মন্ত্রের মত জপ করে চলেছেন এই নগ্নতাকে। নগ্নতার যথার্থ সৌন্দর্য কিভাবে ফোটান যায় সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না।

ডেভিড বলল, উদ্দেশ্য নিয়ে নগ্নতাকে ছড়ানোর ভেতর সুস্থ পাঠকের সমর্থন কোনদিনই থাকে না। সাধারণ পাঠক উত্তেজনার খোরাক হিসেবে ওগুলোকে গিলতে থাকে। কিছুদিন ওসব বই বেস্ট সেলার হয়ে লেখক আর প্রকাশকদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফাঁপিয়ে তোলে, তারপর একদিন ফানুসের মত ওড়ার খেলা দেখাতে দেখাতে কোথায় উড়ে যায়।

প্রেমা বলল, দেহধর্মের ব্যাপারে আমার কোন গোঁড়ামী নেই ডেভিড। কিন্তু তাকে হাজার চোখের সামনে বিসদৃশ করে তুলতেই আমার আপত্তি। আমরা নাচের মুদ্রায় আমন্ত্রণ জানাই দর্শকদের কিন্তু তা আভাসে, ইঙ্গিতে, ইসারায়। ক্যাবারে নাচের নগ্নতার চেয়ে সে আমন্ত্রণ কম প্রলুব্ধ করে না। তবু বলব, তার ভেতর শিল্পের একটা শ্রী আছে।

ডেভিড বলল, ঠিক তোমাদের ইণ্ডিয়ার মন্দিরে খোদাই মূর্তির মত। আমি খাজুরাহো আর কোণারকের মন্দির দেখে এসেছি। সেখানে দেহভঙ্গীমায় চূড়ান্ত নগ্নতা চোখে পড়েছে, কিন্তু মনের ওপর বিকারের কোন খেলা চলে নি, ভাস্করের সৃষ্টিকে বার বার সাধুবাদ জানিয়েছি।

প্রেমা তার দুহাত দিয়ে ডেভিডের দুটো হাত ধরে বলল, কি আশ্চর্য মিল হয়ে গেল তোমার আর আমার ভেতর।

ডেভিড প্রেমার হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে প্রেমার কটি বেষ্টন করে বলল, আইরিশ সাগরের সঙ্গে মিলল আরব সাগরের ঢেউ, কি বল?

প্রেমা অর্থভরা চোখে তাকাল ডেভিডের মুখের দিকে। সে মুখের পাঠ পড়তে ডেভিডের একটুও দেরী হল না। সে গভীর আলিঙ্গনে প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে আদরে অশ্লেষ ভরে দিতে লাগল।

যেখানে ডেভিড সেখানে প্রেমা। প্রেমার প্রিমিয়ার প্রেসিডেণ্টের চালক কখনো ডেভিড কখনো বা প্রেমা নিজে।

গাড়ী এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল কোন এক নারকেল বাগানের সামনে। মেয়েরা ছোবড়া পিটিয়ে চলেছে। কাঠের কটুপিড়ি তালে তালে পড়ছে ছোবড়ার ওপর। গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল ডেভিড। সবকিছুর ওপর তার ঔৎসুক্য। ডেভিডের প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে, প্রেমার জবাবও সঙ্গে সঙ্গে।

কি করছে এরা প্রেমা?

নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে ফাইবার সংগ্রহ করছে।

মেয়েদের পেছনে নারকেল গাছের বেষ্টনীর ভেতর একটা পুকুর। জলটা ঘন কালো হয়ে আছে। ডেভিড আঙুল দেখিয়ে বলল, ওখানে কি?

প্রেমা বলল, ওটা সমুদ্রের ব্যাকওয়াটার। ওকে আমাদের ভাষায় বলে কায়েল। ওর খানিক অংশ ঘিরে একটা নেট জলের ভেতর নামান হয়।

ডেভিড অমনি বলে, ঐ নেটকে তোমরা কি বল?

কায়ার ভালম।

হাঁ তারপর? প্রশ্ন করে ডেভিড।

প্রেমা বলে, ঐ কায়ার ডাম্মের ওপর নারকেল পাতার ওলা বুনে তাতে নারকেলের ছোবড়া ফেলে দেওয়া হয়।

আবার প্রশ্ন, ঐ নারকেলের ছোবড়াকে তোমরা কি বল ?

তোণ্ড।

তোমাদের ঐ তোণ্ড কতদিন জলের ভেতর থাকে ?

প্রায় তিন মাস।

তিন মাস ! জলের রং এজন্যেই বোধকরি পচে কাল হয়ে গেছে প্রেমা।

ঠিক তাই।

ডেভিড বলে, জল থেকে তুলে পেটাইএর পর এর ফাইবারগুলো কোথায় যাবে।

তাট্টু মেশিনে। ওখানে ফাইবারগুলোকে রিফাইন করে নেওয়া হবে। ঐ রিফাইন নারকেল ছোবড়াকে বলে চাকিরি ভুম্বু।

ছোট্ট ডায়েরীর পাতায় ডট পেন্সিলে ডেভিড নোট করতে থাকে শব্দগুলো। নোট করা শেষ হলে বলে, তারপর ?

প্রেমা বলে, ঐ রিফাইন ফাইবারগুলো মেয়েরা পাট করে পেটের কাছে চেপে ধরে। তারপর খানিক অংশ একটা মেশিনে ধরিয়ে দেয়। মেশিন ঘুরতে থাকে। ঐ মেশিনের চাকাকে বলে রাট। যদি দুটো সরু দড়িকে পাক দিয়ে মোটা করতে হয় তাহলে একটা কাঠের ছোট যন্ত্রের ভেতর ঐ দুটো দড়ি ভরে দিতে হয়। কখনো বা তিনটে দড়ি ভরে আরও মোটা করা হয়। ঐ যন্ত্রটাকে বলে চোং। মেয়েরা ঐ চোং হাতে ধরে পেছন দিকে পিছিয়ে যেতে থাকে। এরকম করেই দড়ি তৈরী হয়।

নোট নেওয়া হলে গাড়ীতে ফিরে যায় ওরা।

ডেভিড গাড়ী চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করে, এই মেয়েদের দেখে ওদের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল বলে তো মনে হল না প্রেমা।

প্রেমা বলল, একটা নারকেলের ছোবড়াকে চার ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে বলে পলা। এমনি পঁচিশটা নারকেলে হয় একশো পলা। ঐ একশো পলা পিটিয়ে ফাইবার বের করলে মজুরী পায় এক টাকা। সারাদিনে আড়াই থেকে তিন টাকার বেশী রোজগার হয় না ওদের।

ডেভিড বলল, এত ইল পেইড এরা।

প্রেমা বলল, আমাদের দেশে আর্থিক সমৃদ্ধি কম, তাই সংগ্রাম বেশী। আমরা কঠিন পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে দেশটাকে গড়তে চাইছি।

ডেভিড বলল, বিচিত্র দেশ তোমাদের প্রেমা। এক হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছ, অন্য হাতে উৎসবের রোশনাই জ্বালছ।

প্রেমা বলল, আমি আশা করব তোমাদের শ্বেতকায় বহু লেখকের মত আমাদের দেশকে তুমি ভুল বুঝবে না। আর তোমার লেখার ভেতরেও সে ভুলের ছাপ থাকবে না।

ডেভিড বলল, সাহিত্যিকের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। সত্য যেমন দারিদ্র্যের ছবি দেখায় তেমনি ভেতরের ঐশ্বর্যকেও প্রকাশ করে প্রেমা। তোমার দেশের বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

পনের দিনের অবস্থান ডেভিডের ভারতের এই দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের ছোট্ট দেশটিতে। উল্কার মত সে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। সঙ্গ দিয়েছে তাকে তার আগামী উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রেমা মেনন। আয়োজন করেছে নাচের। দেখিয়েছে কথাকলি, মোহিনীআট্যম, কালিআট্যম, পুল্লয়ারকলি, ওটাম তুল্লাল, কোইকোট্টিকলি, সারি আরও কত বিচিত্র নাচ। ঠেকাডির অরণ্যভূমি থেকে লেকের জলে নেমে আসা হাতির দলের শুঁড় উঁচিয়ে মুক্তোর মত জল ছড়ানোর দৃশ্য ওরা দেখেছে মোটর বোটের ডেকে পাশাপাশি বসে। দেখে এসেছে শবরীমালাই পাহাড়। যেতে পারেনি আয়আপ্‌পানের মন্দিরে, সেখানে যুবতী নারীর নিষিদ্ধ যাত্রা। তাই পম্বার তীরে বসে ডেভিড শুনেছে প্রেমার মুখে মোহিনী আর শঙ্করের মিলন জাত সন্তান আয়আপ্‌পান বা সাস্তার কাহিনী।

সেই সাস্তার মন্দিরে দলে দলে ভক্ত চলে 'মকর ভিলাক্কু'র দিনটিতে পূজো দিতে। তিনটি নদী এসে মিলেছে পম্বায়। তার পরেই দুর্গম শবরীমালাই। পম্বায় স্নান সেরে কালো মুণ্ডি পরে ভক্তেরা নারকেলের মালায় ঘি রেখে মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। সাস্তার যজ্ঞ বেদীতে দিতে হবে এই ইরুমুদির আহুতি।

পৌষের শেষ সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে শত শত ভক্ত। আয়আপ্‌পানের কথা তো মিথ্যে হবার নয়। তিনি যে কথা দিয়েছেন এই মকর ভিলাক্কু তিথিতে ভক্তদের দেখা দিতে আসবেন।

গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে আকাশের উত্তর পূর্ব কোণে আশ্চর্য এক জ্যোতির আবির্ভাব ঘটে। ভক্তেরা আকুল হয়ে প্রণাম জানায় সেই জ্যোতির্ময়- আয়আপ্‌পানের উদ্দেশ্যে।

ডেভিড বলে, বড় বিশ্বাসপ্রবণ তোমাদের ভারতীয়েরা।

প্রেমা বলে সবেতেই বিশ্বাস আমাদের, দেবতায় যেমন মানুষেও তেমনি।

একটু থেমে ডেভিডের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে, দূর দেশের মানুষের ওপরেও আমাদের বিশ্বাস কম নয়।

ডেভিডের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল প্রেমা। ডেভিড প্রেমার মুখে আঙুলের আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল, বিশ্বাস রেখ প্রেমা, তোমার কাছ থেকে যা পেলাম তা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল। তোমার চরিত্রের যা আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে তা হল তোমার অকৃত্রিমতা। আর তোমার স্বভাবের একমাত্র তুলনা ঐ নদী পদ্মা। তুমি শিল্পীর হৃদয় নিয়ে জন্মেছ। তোমাকে চিরদিন বুকে ধরে রাখার মত মানুষ জন্মায় নি। সম্ভোগের সময় তুমি যেমন একান্ত করে নিজেকে বিলিয়ে দাও তেমনি কোন কিছু সৃষ্টির ভেতরে মত্ত হলে সব ভুলে তারই গভীরে ডুব দাও। তুমি এই নদীর মত গভীর আর বেগবতী। নদীর ওপর যেমন বাইরের আঘাতে আলোড়ন উঠলেও চিরস্থায়ী দাগ পড়ে না, তোমার স্বভাবের ধর্মও ঠিক তেমনি!

প্রেমা বলল, সুন্দরকে আমি ভালবাসি ডেভিড। তুমি বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষ, তোমার সাহিত্য চিন্তায় কোন সংস্কার নেই তাই প্রেমা তোমাকে তার সবকিছু উজাড় করে দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু আজ যে মেয়েটি তোমার কোলে অসংকোচে তার মাথা রেখে শুয়ে আছে সে জানে এমনি করে চিরদিন কাউকে ধরে রাখা যায় না। তুমি ঠিকই বলেছ, জীবন বয়ে চলা নদী। তার গতিতে বাধা পড়লেই বিপত্তি। এ তোমার আমার সবার মনের কথা। আমি তোমাকে যতই ধরে রাখতে চাইব ততই তোমার মনের থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাকে। তাই অনেক দূরে দুজনে সরে গিয়ে মনের অনেক কাছে দুজনকে পেতে চাই।

ডেভিড বলল, তুমি বয়েসে অনেক ছোট প্রেমা কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তোমার এসব ধারণা আমাকে সত্যি বিস্মিত করেছে।

জ্যোৎস্না রাত। ঢেউ ভাঙার শব্দ। সবুজে ছায়ায় মিশে যাওয়া নারিকেল বীথি। বালির ফরাসে পাশাপাশি বসে প্রেমা আর ডেভিড। ওরা আজ সারারাত জেগে কাটাবে। কথা বলবে, যে কথার কোনদিন শেষ হয় না। গল্প বলবে, জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প। তারপর একসময় ভোর হবে। হোটেলে

ফিরে যাবে ওরা। প্রেমা গোছগাছ করে দেবে ডেভিডের ছড়ান জিনিসপত্র। ওকে গাড়ী করে পৌছে দিয়ে আসবে ত্রিবান্দ্রম এয়ার পোর্টে। ওরা দুজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে। মনটা ভারী হয়ে উঠবে। কিন্তু পুনর্মিলনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কেউ কাউকে দেবে না।

প্রেমা সামনে আছড়ে পড়া ঢেউ-এর দিকে চেয়ে বলল, মনটা কেন জানি না আজ ঐ ঢেউগুলোর মত কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

ডেভিড বলল, আজ সন্ধ্যায় তোমায় এমন অশান্ত ভাবনায় পেয়ে বসল কেন প্রেমা! সারাদিন তুমিই তো আমার পাশে পাশে থেকে বিচ্ছেদের শক্তি যুগিয়েছ।

অন্যমনস্ক প্রেমা বলল, দিনে রাতে কত তফাৎ। রাতগুলো যেন মনের ওপর অদ্ভুত এক চাপ সৃষ্টি করে ডেভিড।

ডেভিড প্রেমাকে আরও নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমাদের মনের এ উত্তাপ অনেক দূরে গেলেও নিভে যাবে না প্রেমা।

প্রেমা কোন কথা বলল না। ডেভিডের উষ্ণ নিশ্বাসের ছোঁয়ায় সে আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

কতক্ষণ পরে ডেভিড বলল, তোমার কথা যখনই মনে পড়বে তোমার নাচের আশ্চর্য মূর্তি ফুটে উঠবে আমার চোখের ওপর। অবিস্মরণীয় সে ছবি প্রেমা! আমি আমার লেখায় তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করব। আমার মনে সেই নর্তকী যে উত্তাপের সৃষ্টি করেছে আমার লেখার ভেতরেও সেই উত্তাপ আমি ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব।

প্রেমা বলল, তোমাকে আমি কি দিয়েছি জানি না তবে তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি তা কোনদিন কারু কাছ থেকে পাইনি।

ডেভিড প্রেমার একরাশ ছড়ান চুলে ভরা মাথা বুকের কাছে টেনে এনে বলল, এমন কি আমি তোমাকে দিতে পেরেছি প্রেমা?

প্রেমা ডেভিডের বুকে মাথা রেখে বলল, এক বুক কান্না।

প্রেমাকে বুকে চেপে চুপচাপ বসে রইল ডেভিড।

প্রেমা বলল, আচ্ছা ডেভিড তোমার মালাবার উপকূলের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসের শুরু কিভাবে করবে কিছু ভেবেছ?

ডেভিড সঙ্গে সঙ্গে বলল, কিছু ভাবিনি এখনও। তবে তোমার ঐ এক বুক কান্না দিয়েই শুরু করা যেতে পারে।

ডেভিডের বুকের ভেতর প্রেমা মাথায় ঝাঁকুনি তুলে বলল, না না ডেভিড

কান্না দিয়ে নয়। রোদ্দুরে ভরে আছে আমাদের দেশ, এখানে খুশি দিয়ে শুরু হোক তোমার লেখা।

ডেভিড বলল, দুজনের কথা থাক। শোন, যদি এমন করে শুরু হয় উপন্যাস :

কোভালম বীচে পাহাড়টা যেখানে সমুদ্রে এসে নেমেছে সেখানে কালো জলের ধাক্কায় সাদা সাদা ফেণাগুলো ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। পাহাড়ের ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশমুখী কটা নারকেল গাছ। দক্ষিণের আকাশে উষ্ণ দেশের থম থমে কালো দুটো মেঘ। তারা ক্রমশ তাদের আয়তন বৃদ্ধি করে চলেছে।

ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। পাহাড়ের ওপর প্যালেস হোটেল থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল ওরা। ডেভিডের হাতে লাল সুটকেশ, প্রেমার পিঠে ডেভিডের হলুদ স্লিপিং ব্যাগ। ধবধবে সাদা পোশাকে প্রেমাকে শিল্পীর হাতে গড়া মার্বেল ফিগারের মত মনে হচ্ছে।

ওরা নীচে নেমে এল। সারকুলার কিয়স্ক দুটোর পাশ কাটিয়ে ওরা এসে গেল মেন রোডের ওপর। বাঁ দিকে স্বাস্থ্যে ভরপুর কোকোনাট গ্রোভ। হাল্কা গ্রে আর সাদায় মেশা ঋজু কাণ্ডের মাথায় ঘন সবুজ পাতার ঝালর। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বীচ-কটেজগুলো উঁকি দিচ্ছে।

ওরা কালো পীচের রাস্তাটা ধরে হেঁটে চলল। খানিক পরেই ওরা পেরিয়ে এল কোভালম গ্রোভ। ছোট্ট এক চিলতে ফাঁকা জমি। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে প্রেমার প্রিমিয়ার প্রেসিডেণ্টখানা। কালো হয়ে আসছে চরাচর। তার মাঝখানে সাদা গাড়ীখানা আরও ধবধবে মনে হচ্ছে।

গাড়ীতে ঢোকার আগেই তেড়ে এল হাওয়া। বালি উড়ল। সমুদ্রের ওপর থেকে হাওয়া তীব্র স্রোতের মত টেনে ভাসিয়ে নি.য় গেল এক ঝাঁক সী-গালকে।

ওরা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

এই আব্দি বলেই ডেভিড থামল দেখে প্রেমা বলল, তারপর ?

ডেভিড প্রেমাকে একটা মিষ্টি ঝাকুনি দিয়ে বলল, আমি কি আমার লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ছি বলে মনে করলে নাকি ? না কোন জানা গল্প বলছি।

প্রেমা বলল, তুমি এমন করে বলতে শুরু করলে যে মনে হল একটা ছবি দেখছি।

তারপর শোন, ডেভিড আবার শুরু করল :

প্রেমা গাড়ীতে স্টার্ট দিল। ওয়াইপার দুটো জলের কুয়াশাকে ঘন ঘন অর্ধবৃত্ত এঁকে সরিয়ে দিচ্ছিল। প্রেমা সামনের আঁকা বাঁকা উঁচু রাস্তার দিকে স্থির চোখ রেখে গাড়ী চালাচ্ছিল। ডেভিড চোখের কোণে চেয়ে দেখছিল প্রেমাকে। কত গভীর এই মালাবার উপকূলের মেয়েটি। প্রেমার চোখে মুখে, স্টিয়ারিং ধরে থাকা হাতে, বসার ভঙ্গীতে একটা সজাগ কর্তব্য সম্পাদনের ছবি ফুটে উঠছিল। সে যে একটি বিদেশী ভ্রাম্যমানকে পুরো দুটি সপ্তাহের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরঙ্গ উত্তাপে ভরে রেখে আজ এয়ারপোর্টে বিদায় দিতে চলেছে তার কোন প্রকাশ ছিল না তার এই মুহূর্তের আচরণে।

যে কোন কাজের গভীরে, অনেক গভীরে পারিপার্শ্বিক ভুলে ডুবে যেতে জানে মেয়েটি।

অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। সামনের পথ দেখা কঠিন হয়ে উঠছে। দু'পাশের পাহাড়ী টিলার ওপর সারি সারি নারকেল গাছ দিগন্তে মিশে গেছে। এখন আর ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। গাছের সবুজ মেঘের ছায়া বৃষ্টির রঙ একাকার হয়ে গেছে। জল গাড়িয়ে আসছে। সহস্র সহস্র গাছের গা বেয়ে লম্বা পাতার প্রান্ত দিয়ে জল নামছে। উঁচু টিলার নিম্নগামী পথ ধরে সে জলস্রোত দু'দিক থেকে বেগে নেমে আসছে পথের ওপর। সে স্রোত উজিয়ে জল ছিটিয়ে চলেছে প্রেমার গাড়ী। ষোলটি মাইল পথ এমনি করে পার হয়ে যেতে হবে। ত্রিবান্দ্রম এয়ার পোর্টে সময় মত পৌঁছে দেবার পুরো দায়িত্ব নিয়েছে প্রেমা। মেয়েটি তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। তার মুখে ডেভিড দেখতে পাচ্ছে কয়েকটা রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। এই বৃষ্টির অস্বচ্ছ পর্দাকে ভেদ করে প্লেন টেক অফের বেশ কিছু সময় আগে সে ডেভিডকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে পারবে তো।

প্রেমার দিকে চেয়ে ডেভিডের কি জানি কি মনে হল। তখন দু' সারি নিবিড় নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে পথ চিরে গাড়ী ছুটছিল। ধারে কাছে বসতির চিহ্ন নেই। ডেভিড প্রেমার স্টিয়ারিং ধরে থাকা বাঁ হাতখানা ওর ডান হাতের আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে বলল, গাড়ীটা একটু থামাবে প্রেমা ?

যেন একটা ঘোরের ভেতর ডুবেছিল মেয়েটি। আস্তে আস্তে গাড়ীখানা ব্রেক কষে দাঁড় করাল পথের ধার ঘেঁষে। দুটো নাতিদীর্ঘ নারকেল গাছ পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে আলুথালু।

ডেভিড গায়ের জামা খুলে ফেলল। অবাক প্রেমা তার দিকে চেয়ে।

খালি গায়ে দরজা খুলে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল বাইরে। আকাশের দিকে মুখ তুলে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পাগলের মত গায়ে মাথায় মাখতে লাগল।

কি করছ ডেভিড! চেঁচিয়ে উঠল প্রেমা। অসুখ করবে যে। উঠে এস, একটুও আর সময় নেই।

আশ্চর্য! ডেভিডের কানে পৌঁছেও পৌঁছল না সে চীৎকার। সে দু' হাত বাড়িয়ে প্রেমাকে কাছে ডাকতে লাগল।

কি করে প্রেমা। এক দুরন্ত খেয়ালীর খেলার পুতুল হয়েছে সে। গাড়ী থেকে বৃষ্টিতে ভিজে বেরিয়ে আসতে হল তাকে।

মুহূর্তে অঝোর বর্ষায় ভিজে গেল তার সারা শরীর। সে ছুটে এসে দাঁড়াল ডেভিডের কাছে। ডেভিড দেখল, শ্বেতপাথরের একটি মূর্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে। বর্ষার ধারায় একেবারে সিক্ত প্লাবিত। সে দেখল বর্ষাধোয়া একটি মূর্তির নিতম্ব জঙ্ঘা স্তনযুগল নিখুঁত খোদাই-এর পর মসৃণ পালিশ দিয়ে এই নির্জন বনভূমির মাঝখানে রেখে গেছে শিল্পী।

ডেভিড জড়িয়ে ধরল সে মূর্তিকে। দূর দিগন্তের দিকে একেবারে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ডেভিড প্রেমাকে বুকের কাছে টেনে এনে গভীর আবেগে বেঁধে ফেলল। প্রেমা ডেভিডের খোলা বুকের বাসায় একটা ভীরু পাখি হয়ে গেল।

এক বুক কান্না উজাড় করে দিয়ে এক সময় থামল বৃষ্টি। প্রেমা কান্না ভেজা চোখ দুটো ডেভিডের নত মুখের ওপর ফেলে বলল, টিকিটটা বাতিল হয়ে গেল তোমার ডেভিড।

ডেভিড বলল, ফ্লাইটটা হয়ত আজকে বাতিল হয়ে গেছে। আর যদি প্লেন আজকের মত ছেড়ে চলে যায় তাহলে কাল পরশুর প্লেন পাব কিন্তু এই বৃষ্টির ভেতর শ্রেষ্ঠ এক ভাস্করের তৈরী মূর্তিকে জীবনে আর কোনদিনও এমন করে পাব না।

আকাশ নীল হয়ে গেছে। সূর্যের শেষ সোনা ভেজা নারকেল গাছের পাতায় কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে পড়া বর্ষার ফোঁটাকে সোনালী করে এসে পড়ল প্রেমার মুখের ওপর। সোনালী রোদে ঝিকমিক করে উঠল প্রেমার মুখ।

গল্প বন্ধ করে ডেভিড বলল, তোমার বুকভরা কান্না আর মুখভরা আলো দিয়ে যে গল্প শুরু করলাম তাতে তোমার সম্মতি পাব কি প্রেমা?

প্রেমা কোন কথা না বলে ডেভিডের বুকের ভেতর থেকে ওর মসৃণ দাড়িতে

তর্জনীর আলতো টোকা দিতে লাগল। সে যে ডেভিডের রচনার প্রারম্ভ পর্বটিতে দারুণ খুশি হয়েছে তারই নীরব সমর্থন।

হাওয়া দিচ্ছে সমুদ্রে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়মে চলেছে এই বায়ুপ্রবাহ। সমুদ্র সরে গিয়েছিল দূরে। এখন আকাশের বুকে জেগে থাকা চাঁদের টানে সে আস্তে আস্তে ফুলে ফুলে উঠছে। ক্রমেই ঢেউগুলো সবে সরে আসছে প্রেমা আর ডেভিডের দিকে। এক সময় ওরা উঠে দাঁড়াল। ওদের ভাবনার ওপর দিয়েও একটা হাওয়ার প্রবাহ চলেছে। টুকরো টুকরো চিন্তাগুলো এলোমেলো হাওয়ায় মনের আনাচে কানাচে উড়ে ফিরছে।

পেছনে ফেলে আসা দু' দুটো সপ্তাহের টুকরো কথা—অবাক করে দেওয়া বন পাহাড় নদী কায়েলের ছবি—নাচের আসর মন্দির মানুষজন—সব কিছু মিলে সে যেন এক আকুল করা উৎসবের সমারোহ। মন আর চোখকে টেনে রাখা কোন এক আকর্ষণীয় উপভোগ্য চলচ্চিত্রের পর্দার ওপর দিয়ে সরে সরে যাওয়া।

ওরা হাতে হাত বেঁধে হাঁটতে লাগল। ঢেউ এসে ওদের পায়ের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ওরা কোন কথা না বলে ধনুকের বাঁকের মত কোভালম বীচটা হেঁটে হেঁটে পার হচ্ছিল।

এক সময় হোটেল ছেড়ে ওরা অনেক দূরে এসে পড়ল। ডান দিকে নারকেল গাছের সারির মাঝখানে একটা বালির খাদ দেখা গেল। ডেভিডকে ওদিকে চেয়ে থাকতে দেখে প্রেমা বলল, নারকেল গাছগুলোর ওপারে একটা কায়েল রয়েছে। এককালে এই বালির খাদ দিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। এখন শুধু শুকনো বালির রেখায় অতীতের স্মৃতিচিহ্নটুকু জেগে আছে।

ডেভিড শুধু প্রেমার হাতে চাপ দিয়ে বলল, কাল তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে হবে প্রেমা।

প্রেমা বলল, তারপর অনেক অনেক দিন চলে যাবে। আমরা দুজনে থাকব পৃথিবীর দু' প্রান্তে। কোন একদিন যে আমরা একই সঙ্গে ছিলাম, এমনি করে হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, দু'জনের দেহের উত্তাপ দু'জনে নিবিড় আলিঙ্গনে অনুভব করেছি তার কোন পরিচয় আর এই চলমান পৃথিবী ধরে রাখবে না। সত্যি কি অসীম দুঃখে মনটা ভরে ওঠে যখন ভাবি আমাদের সব ভাবনা সব কাজ একদিন কোথায় হারিয়ে যাবে।

ডেভিড বলল, দুঃখ করো না প্রেমা, কিছুই হারায় না পাত্র-পাত্রী বদলে যায় শুধু। আমরা যখন থাকব না তখন অন্যকোন নেলসন কি সুরবেক তোমারই মত কোন সুদর্শনা সুপ্রিয়াকে নিয়ে এমনি কোন সমুদ্র তীরে ঘুরে বেড়াবে।

আবার কখনো তাদের কানে এসে হয়ত আজকের মত বাজবে হাওয়ার হাহাকার। আসন্ন বিচ্ছেদের মুহূর্তে তাদের মনও এমনি ভারি হয়ে উঠবে।

প্রেমা বলল, সান্ত্বনা কোথায় ডেভিড ?

ডেভিড বলল, সান্ত্বনার জন্ম নিজের ভাবনার ভেতর প্রেমা। তুমি শিল্পী তাই তোমার সান্ত্বনা শিল্পের মধ্যে। আবার শিল্পের ভেতর থেকে আমিটাকে সরিয়ে না রাখলেই দুঃখ পেতে হবে। পরিণত নায়ক সময় হলে তরুণ নায়কের হাতে তাঁর কাজ তুলে দিয়ে সরে যাবেন। গায়ক সাহিত্যিক সকলকেই এই অলিখিত নিয়মের পথ ধরে হাঁটতে হবে। প্রসন্ন মনে একে মেনে নিতে না পারলেই অশান্তি, দুঃখের ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে প্রতিদিন। সেখানে হার ছাড়া জিৎ নেই প্রেমা। আমার কলম একদিন থামাতে হবে। নতুন লেখক নতুনভাবে জীবনকে দেখবে। তার রচনার ফর্ম যাবে পাল্টে। জীবনের ধর্ম পরিবর্তনশীল। প্রকৃতির নিয়ম বলে তাকে মেনে নিতে হবে তবেই শান্তি। আমি আমার লেখায় প্রেমা নামের যে মেয়েটিকে আমার সমস্ত অনুভূতি উজাড় করে আঁকলাম, আমি জানি আমার এ চেষ্টা বিফল হবে না। আমার পাঠকদের কারু কারু মনে সে দোলা দেবে। তাদের ভেতর থেকে যদি কোন তরুণ লেখকের আবির্ভাব ঘটে আর সে যদি নতুন দিনের উপযোগী করে তার নায়িকাকে রচনা করে তাহলে আমি নিশ্চিত জানি আমার চরিত্র তার ভেতর থেকে নতুনভাবে জন্ম নেবে।

একটু থেমে আবার বলতে লাগল ডেভিড, সেদিন প্যালেস হোটেলের অডিটোরিয়ামে তোমার নাচ দেখেছিলাম। তুমি নাচের আগে তোমার গুরু মাধবী আম্মার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। তোমার নাচের সময় মাধবী আম্মা আমার পাশের আসনেই বসেছিলেন। আমি বারে বারে তাঁর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তন্ময় হয়ে দেখছিলেন তোমার নাচ। আর ঠিক তোমার মুখের কতকগুলো একস্‌প্রেশান তাঁর প্রবীণ মুখের ওপর মুহূর্তে মুহূর্তে খেলা করে যাচ্ছিল।

আমার ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি নতুন করে তোমার ভেতর জন্ম নিচ্ছেন। জরা মাধবী আম্মার ভেতরের শিল্পীকে স্পর্শ করতে পারছে না। মাধবী আম্মা আশ্চর্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছেন প্রেমা মেননে।

থামল ডেভিড। প্রেমা ওর হাতটা শক্ত করে ধরে রইল। ওর কথা যে প্রেমার অন্তর ছুঁয়েছে তার স্বীকৃতি।

ডেভিডের চোখ গিয়ে পড়েছিল দৃশ্যটার ওপর। চলতে চলতে সে হঠাৎ

থেমে দাঁড়াল। ওকে থামতে দেখে প্রেমা দাঁড়িয়ে গেল। এখন প্রেমার চোখেও এসে পড়েছে দৃশ্যটা।

কয়েকটা নৌকো কাৎ হয়ে পড়ে আছে। চাঁদের আলোয় তাদের ছায়াগুলো আঁকা হয়ে আছে বালির জমিনে। একটা নৌকোর ছায়ার চাদরে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে দুটি নারী পুরুষ। তারা অচেতন এখন। অর্ধ নগ্ন যুবক-যুবতী। কোন ধীবর পল্লী থেকে ওরা হয়ত বেরিয়ে এসেছে এখানে। নির্জন সাগর কূলে ঘুমন্ত নৌকোগুলোর আড়ালে একান্ত নিশ্চিন্ত নিভৃতি খুঁজে নিয়েছে ওরা।

চাঁদের চেয়ে থাকার মত ওরা উজ্জ্বল মাদক চাউনি মেলে চেয়ে থেকেছে কতক্ষণ পরস্পরের দিকে। পাশের নারকেল বনের পাতার অস্ফুট-প্রায় ধ্বনির মত ওরা টুকরো টুকরো ভালবাসার কথা বলেছে। তারপর রক্তে উঠেছে তুফান। সমুদ্রের ঢেউএর মত উত্তাল ওঠা-নামার খেলা খেলতে খেলতে ওরা এক সময় বেলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়া ফেনপুঞ্জের মত উচ্ছ্বাসে আবেগে আবেশে ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে। এক সময় যৌবনের দেবতার লীলা মৃগয়া যখন শেষ হয়েছে তখনও ওরা পরস্পরকে ছেড়ে দেয় নি। এক হয়ে অসীম তৃপ্তি বুকে নিয়ে রাতের ঐ শান্ত আকাশের মত স্থির হয়ে শুয়ে আছে।

প্রেমা বলল, এই বিরাট প্রকৃতির স্টেজের ওপর ওরা ওদের অভিনয় শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডেভিড বলল, আমরা কৌতূহলী ট্রেসপাসার্সের মত গ্রীণ রুমে ঢুকে পড়ে ওদের অসম্বৃত অবস্থায় দেখে ফেলেছি।

রাত শেষের বড় একটা দেরী নেই। ঝলকে ঝলকে ভোরের বাতাস বয়ে আসছে। দু' একটা অতি ভোরে জেগে ওঠা পাখি মাঝে মাঝে ডাক দিয়ে উঠছে।

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। কেউ কাউকে কোন কথা বলল না। ওরা জেনেছে ওদের এখন ফিরে যেতে হবে। সকালের ফ্লাইটেই ডেভিডের যাত্রা।

ওরা হোটেলের কাছাকাছি এসে সামনে তাকাল। পাহাড়ের ওপর নারকেল গাছের ফাঁকে ভোরের আয়োজন চলেছে।

ডেভিড চলে যাবার পর কয়েকটা দিন অশান্ত হয়ে উঠেছিল প্রেমা। গাড়ী চালাতে চালাতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল পাশে যেন কেউ বসে আছে। নারকেল বাগানের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে সে থমকে দাঁড়াচ্ছিল বার বার। মনে হচ্ছিল, পাশ থেকে কেউ তাকে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসবে, আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে হবে তার প্রশ্নের।

পুরো দু-তিনটে সপ্তাহ এমনি করে পার হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘোর কাটল প্রেমার। এখন সে দেরাদুনের লালসিয়া স্টেটের আমন্ত্রণ রক্ষায় সাড়া দেবার জন্যে নাচের অনুশীলনে মেতে উঠল।

কুমার জয়কিষণ আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছেন। শোভন কিন্তু প্রতিটি ছত্র উত্তাপে ভরা। শেষে দোলনও পাদপূরণ করে লিখেছে, আন্টি আসা চাই। এলে তোমাকে আবার দেখব।

চিঠির সঙ্গে এসেছে একটি চেক। বড় রকমের একটা অঙ্কের। দল নিয়ে যাবার প্রাথমিক খরচ।

প্রেমা মাধবী আম্মার বাড়ী অনুশীলনের জন্যে বেরিয়ে গেলে সরিতা বিছানার বালিশে কনুই গুঁজে ইন্দ্রকে ফোন করতে বসল।

মিঃ রায়?

ওপার থেকে ইন্দ্র বলল, বলছি।

সরিতা বলল, শোন, তোমার শেখান গানটা গেয়ে শোনাই। ভুল হলে শুধরে দিও।

‘আমি তোমারি সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরেরি বাঁধনে।
তুমি জান নাই আমি পেয়েছি তোমারে অজানা সাধনে।’

ইন্দ্র বলল, চমৎকার।

চমৎকার কি? গানের ভাব না আমার গলা?

ইন্দ্র বলল, দুটোই। যে হৃদয় থেকে একথা উচ্চারিত হচ্ছে আর যে কণ্ঠ থেকে এ স্বর ঝরছে।

সরিতা বলল, আমি টেগোরের গান শিখব। তুমি আমাকে অনেক অনেক গান শিখিয়ে দেবে।

চমৎকার।

তার মানে?

মানে খুব সোজা। আপন মনে যখন গেয়ে উঠবে বাংলা গান তখন তারিফ করার আগে দিদি বলবে, শিখলে কোথায়? তখন কি উত্তর দেবে?

ওর সামনে গাইবই না।

ইন্দ্র বলল, নিশ্বাস আর টেগোরের গান দুটোকে চেপে রাখা যায় না। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসবেই।

সরিতা বলল, কলেজে একটি বাঙালী মেয়ে এসেছে, সেই আমাকে শিখিয়েছে বলব।

মিথ্যে কথার ফুলঝুরি ছড়াতে তুমি অদ্বিতীয়া।

সরিতা বলল, প্রেমের ব্যাপারে মিথ্যেটা হল আত্মরক্ষার কবচ।

দিদি কোথায়?

সরিতা বলল, লালসিয়ার কুমারবাহাদুরের মাথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে মোহিনী লীলায় মেতেছে।

আর একটু সহজ করে বল।

মাধবী আম্মার কাছে রোজ যাচ্ছে নাচের তালিম নিতে। লালসিয়া থেকে আমন্ত্রণ আর অর্থ দুটোই এসে গেছে।

অসাধারণ ক্ষমতা তোমার দিদির!

লোভ হচ্ছে?

লোভ হয়েও লাভ নেই।

কেন?

অতি সাধারণ আমি।

আক্ষেপ হচ্ছে?

আক্ষেপ হবে কেন? অসাধারণের বোনকে পেয়েছি, তাই বা কম কি। আমার কাছে দু'জনেই সমান দুষ্প্রাপ্য।

সরিতা বলল, বাজে কথা ছেড়ে এখন বলতো দেখি, প্রেমার লালসিয়া প্রস্থানের পর আমাদের প্রোগ্রাম কি ভেবেছ?

কিছুই ভাবিনি।

তোমার খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি।

কি রকম?

এরই ভেতর এতখানি নিরাসক্ত হয়ে পড়লে!

ইন্দ্র বলল, অপবাদ দিলে তাকে হজম করা ছাড়া উপায় কি বল। কিন্তু কোন প্রোগ্রাম যে দুজন ছাড়া হবে না, তাও কি মনে করিয়ে দিতে হবে।

সরিতা বলল, কোথাও গিয়ে কাজ নেই। রোজ সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে নির্জনে নারকেল গাছের তলায় তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুতে দিও, ব্যস। আমি আর কিছু চাই না।

ইন্দ্র বলল, এইটুকুতেই তুষ্ট?

সরিতা বলল, তোমার একটুখানি ছোঁয়াতেই যে আর একজনের বসন্ত। তখন জমে থাকা বরফ কোথায় যে গলে ঝরে যায় তার ঠিক ঠিকানা নেই। তুমি সত্যি যাদু জান।

আশ্চর্য মিল তোমার কথার সঙ্গে পারসিয়ান পোয়েট ওমর খৈয়ামের।

সরিতা বলল, কি রকম?

ইন্দ্র বলল, আসল ওমর খৈয়ামের রুবায়েৎ বলতে পারব না ফিটজেরাল্ডের অনুবাদটুকু শোনাতে পারি।

Come, fill the cup,
and in the fire of spring
The winter garment of
repentance fling.

সরিতা বলল, চমৎকার। একজন আস্তিক আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জীবন সম্বন্ধে কি অপূর্ব ভাবনা।

ইন্দ্র বলল, তোমার বসন্ত-ভাবনার রূপটি টেগোরের একটি গানে ভারী সুন্দর ফুটে উঠেছে।

ওপার থেকে সরিতার গলায় ঔৎসুক্য, বল বল।

ইন্দ্র আগে মালায়ালমে ব্যাখ্যা করল। তারপর বাংলা গানটি গেয়ে শোনাল।

একটুকু ছোঁয়া লাগে
একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে
রচি মম ফাল্গুনী।

সরিতা বলল, তুমি গাইতে থাক আমি সুরটা তুলেনি।

তাহলেই হয়েছে। আমার খদ্দের ফোন করে করে কানেকশান না পেয়ে অন্য হোটেল বুক করবে।

প্লীজ গানটা শিখিয়ে দাও ইন্দ্র। দু-চারটে খদ্দের চলে গেলে আবার আসবে, কিন্তু এই মুহূর্তের মুডটা চলে গেলে আর মাথা খুঁড়লেও সে লগ্ন ফিরে আসবে না।

অগত্যা ফোনের মাধ্যমে চলল গানের তালিম।

আপাতত শেখা আর শেখানর পালা চুকলে ইন্দ্র মনে মনে বলল, অপরাধ নিওনা গুরুদেব। গাইতে সাধ কিন্তু কি গাইছি সে তো আমিই জানি। তবু আমার এই গলা কারু মনে যদি পুলক জাগায় তাহলে ক্ষমা করে নিও তুমি নিজ গুণে। সুরের বিশুদ্ধি নিয়ে বিবাদ করুন গুণীজনে। আমরা যারা শুদ্ধ করে গাইতে জানি না, অথচ না গেয়ে পারি না, তাদের তুমি অবুঝ ভক্ত বলে

একটুখানি প্রশ্রয় দিও। তুমিই তো বলেছ ঠাকুর, 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করুক লয়ে তারিখ সাল।' তোমার ঐ কথার সাহসেই বলি, 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করুন লয়ে সুর আর তাল।' আমরা প্রাণের তাগিদে গেয়ে যাই।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বেলা তখন প্রায় এগারোটার কাছাকাছি। হোটেলের টুরিস্টরা সমুদ্র স্নানে গেছে। ইন্দ্র তার রুমে বসে তাকিয়ে আছে স্নানার্থীদের দিকে। জার্মাণ এক পরিবার উঠেছে ওদের হোটেলে। মা-বাবা স্নান করছে। দুটি শিশু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করছে ঢেউ-এর ওপর। স্বামী-স্ত্রী স্নানের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েদের সামলাচ্ছে। কি দুরন্ত আর প্রাণবন্ত এই বিদেশী বাচ্চাগুলো। ভয়ডর বলে যে কোন একটা ব্যাপার আছে তা ওরা জন্ম অবধি জানে না। কি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী দুটি ছেলেমেয়ে। মহিলাটি ঢেউ-এর ঘায়ে বেসামাল হয়ে পড়তেই পুরুষটি তাকে জড়িয়ে ধরল। দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠল এসে ভেজা বালির ওপর। প্রায় নগ্ন দুটি মূর্তি পাশাপাশি শুয়ে আছে। রোদ এসে পিছলে পড়ছে ওদের ধবধবে সাদা গায়ের ওপর থেকে। ছেলেমেয়ে দুটো মা বাবার দেখাদেখি শুয়ে পড়ল পাশাপাশি। একটি উজ্জ্বল সুখী পরিবারের ছবি। প্রলুব্ধ করে।

পেছন থেকে কে যেন চোখ দুটো চেপে ধরল ইন্দ্রের। ইন্দ্র অন্ধ হয়ে গেছে। সে হাত দুটো পেছন দিকে তুলে অনুভব করতে লাগল আক্রমণ-কারীকে। হাতে লাগল কাঁচের কয়েকখানা চুড়ি। মনে মনে বলল ইন্দ্র, চিনতে না পেরে উপায় আছে। তুমি তোমার সমস্ত উপস্থিতি দিয়ে চেনাবেই চেনাবে। তোমার চুলের গন্ধ, তোমার লম্বা লম্বা আঙুলের ছোঁয়া, তোমার নিঃশ্বাস সব যেন আমার চেনা।

মুখে বলল ইন্দ্র, এই অবেলায় দুষ্টুমি শুরু করে দিলে তো?

কথা বলে না কেউ।

ইন্দ্র বলল, চোখ থেকে হাত সরাও। বিশ্বাস কর, আমি চোখ চাইব না। বস আমার মুখোমুখি। আমি নির্ঘাৎ তোমার ঠিকানা বলে দেব।

চোখ থেকে হাত সরে গেল। একটা মিষ্টি পোশাকের খসখস আওয়াজ আর গন্ধ পেছনের থেকে সামনে এল। অদেখা মেয়েটির মৃদু নিঃশ্বাস এসে পড়ছে ইন্দ্রের মুখের ওপর।

ইন্দ্র বলল, তোমাকে চিনতে পারলে কিন্তু ইন্দ্র রায়ের হাত থেকে আজ রেহাই নেই।

কোন কথা বলল না পার্শ্ববর্তিনী। আর কথা বললেই তো অচেনার অন্ধকার থেকে চেনার আলোতে বেরিয়ে আসতে হবে।

ইন্দ্র চোখ বন্ধ করে দুটো হাত বাড়িয়ে মুখখানা টেনে এনে বুকে চেপে ধরে বলল, সরিতা আমার সরিতা।

ইন্দ্রের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটি।

ইন্দ্র চোখ মেলে বিস্ময়ে অবাক। ইন্দ্রের বুকে একরাশ চুল ছড়িয়ে মুখ লুকিয়ে যে কাঁদছে সে সরিতা নয়।

মুখখানা নিজের হাতের পাতায় জোর করে তুলে ধরল ইন্দ্র। চোখ উপচে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। কটি চূর্ণ চুল গালে ভিজে লেপ্টে আছে।

ললিতা!

ললিতা কথা বলতে পারছে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কি হয়েছে ললিতা, লক্ষ্মীটি বল আমাকে।

কিছুক্ষণের ভেতর ললিতা স্থির হল। সে এখন লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল। নিজের চুল, বেশবাস ঠিক করে নিল।

ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, চলে যাচ্ছি।

সে কি!

ললিতা বলল, তোমাকে দেখতে এসেছিলাম, দেখা হল, চলে যাচ্ছি। তুমি তো আমাকে চিনতে পারনি।

ইন্দ্র বলল, কোন কথা বলবে না?

মাথা ঝাঁকাল ললিতা। তার কিছু বলার নেই।

ইন্দ্র বলল, তুমি আমাকে অবাক করে দিয়ে এমনি করে চলে যাবে?

একদিকে ঘাড় কাৎ করে মাথা নেড়ে ললিতা জানাল, সে চলে যাবে।

ইন্দ্র দরজার কাছে গিয়ে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে বলল, তোমার বাবা অন্ধ হয়েও রাতে খাবার আগে অভুক্ত মানুষদের ডাক দিয়ে তবে খেতে যান, আর তাঁর মেয়েকে আমি দুপুরে স্নান আহার না করিয়ে ছেড়ে দেব ভেবেছ।

ললিতা এবার চোখ নামাল মেঝের ওপর। টপ টপ করে চোখের জলের কয়েকটা বকুল ঝরে পড়ল মেঝেতে। ইন্দ্র ললিতার কাছে এসে তার হাতখানা ধরে বলল, এমন করে যদি কাঁদবে ললিতা তাহলে আমার ঘরে না আসাই বুঝি তোমার ভাল ছিল।

ললিতা মুখ তুলে তাকাল ইন্দ্রের দিকে। বলল, মাস খানেক আগে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

বিস্মিত ইন্দ্র বলল, সেকি! তিনি তো বেশ সুস্থই ছিলেন।

ললিতা বলল, অসুখ-বিসুখ কিছুই ছিল না। রাতে খাবার আগে নিয়মিত অভুক্ত মানুষদের ডেকেছেন। একটি দুঃখী মানুষ এসেছিল, তাকে খাইয়েছেন পাশে বসে। লোকটি তৃপ্ত হয়ে চলে গেলে নিজে খেয়ে নিয়ে তুল্লিকে আদর করেছেন। আমাকে ডেকে নানা রকম গল্প করেছেন। শুতে যাবার আগে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, জীবনে যা সত্য বুঝবে তাই করবে। কারু কথায় হটে আসবে না।

আমি কিছুই বুঝিনি তখন। ভোর বেলা উঠে দেখি বাবা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। পাশের টেবিলে রাখা মহাদেবের ছবিখানা বুকের ওপর চেপে ধরে রয়েছেন।

ঘুম ভাঙাতে গিয়ে দেখি বাবা চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ইন্দ্র ললিতাকে ধরে এনে নিজের বিছানার ওপর বসাল। ললিতা এবার আর চলে যাবার জন্য বায়না ধরল না।

ইন্দ্র ললিতার পাশে বসে বলল, এখন তুমি কোথা থেকে এলে ললিতা?

ললিতা বলল, বাবা মারা যাবার পর বাড়ীটা খাঁ-খাঁ করছিল। একটুও ভাল লাগছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল কোথাও পালাই পালাই। কিন্তু সাংসারিক কতকগুলো ঝামেলা মেটাবার জন্যে কয়েকটা দিন থেকে যেতে হল। অবশ্য বিশেষ কিছু ঝামেলা ছিল না। ব্যাঙ্ক কিংবা বাড়ীর ব্যাপারে অনেক আগেই বাবা ফয়সালা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সামান্য যা কিছু কাজ কর্ম ছিল তা মিটিয়ে নিয়ে একটা টুরিস্ট বাসে বেরিয়ে পড়েছি। কন্যাকুমারী অব্দি যাব। এখন বাস এসে রয়েছে কোভালম প্যালেস হোটেলের সামনে। নাওয়া খাওয়ার পর তিনটের সময় আবার বাস ছাড়বে। সেই সময়টুকুর জন্যে তোমার কাছে চলে এসেছি।

কিন্তু তুল্লি কোথায়?

তুল্লি অন্য যাত্রীদের সঙ্গে এমন ভাব জমিয়েছে যে তারাই ওকে ছাড়ছে না।

ইন্দ্র বলল, বেলা হয়েছে, এখন ঢুকে পড় আমার স্নানের ঘরে। সব কিছুই ভেতরে আছে। কাচান ধুতি তোয়ালে আলনায় রয়েছে নিয়ে নাও।

ললিতা বলল, তুমি তাহলে আমাকে না খাইয়ে ছাড়বে না?

ইন্দ্র বলল, চলে যেতে পার, তবে জানবে আজ আর একটা মানুষ সারা দিনরাত্রি অভুক্ত থাকবে।

ললিতা বলল, ভীষণ জেদ তোমার। সরিতা সহ্য করে কি করে?

ইন্দ্র বলল, জানি না। বোধহয় এখনও ওর কাছে ততটা অসহ্য হয়ে উঠেনি।

ললিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি স্নানের ঘরে যাচ্ছি, নইলে তোমার আবার খাওয়াই হবে না।

কিছু সময়ের ভেতর বেরিয়ে এল ললিতা। ইন্দ্রের ধুতি পরেই স্নান সেরেছে। তারপর নিজের পোশাক পরে নিয়েছে। মাথা ভিজিয়েছে, তাই তোয়ালেতে মাথার চুল ঘষে ঘষে মুছে নিচ্ছে।

ইন্দ্র বলল, ড্রেসিং টেবল নেই। ঐ দেয়ালে ঝুলছে বড় একখানা আয়না, চিরুনীও রয়েছে। কোন রকমে কাজ সেরে নিতে হবে।

ললিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে বলল, এতে আমার তো কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু তোমার সবিতা এতে কাজ চালায় কি করে?

ইন্দ্র বলল, আমার এ আস্তানায় সবিতার আবির্ভাব এখনও হয়নি। মালিক প্রেমা যেমন একবার কিছু সময়ের জন্যে এসেছিলেন মাত্র।

ললিতা আয়না থেকে মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, সত্যি! সবিতা কোনদিন আসে নি তোমার এখানে?

না।

সে তোমার এ ঘরে ঢুকলে আর বেরুতে চাইত না। এত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছ তোমার ঘর।

ইন্দ্র বলল, সত্যি বলছ?

ললিতা বলল, বিশ্বাস কর, এত সুন্দর সাজান ঘর আমি দেখিনি। এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া বড় কষ্টকর।

তোমার পক্ষেও?

ললিতা আবার ইন্দ্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখতে লাগল। হাতের চিরুনী চলতে লাগল মাথার চুল চিরে চিরে।

ইন্দ্র বলল, তুমি তৈরী হয়ে নিলেই আমি খাবারের অর্ডার দেব।

আমি তৈরী। তুমি খাবার আনিয়ে নিতে পার।

ইন্দ্র ফোন তুলে নিয়ে দুটো খাবার দিয়ে যেতে বলল।

খেতে খেতে ইন্দ্র বলল, এত অল্প সময়ের জন্যে আসার কোন মানে হয়?

ললিতা বলল, তবু তো তোমাকে দেখতে পেলাম।

আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না। তুমি চলে গেলে মনে হবে, সত্যিই কি ললিতা এসেছিল আমার ঘরে।

ললিতা বলল, বিধাতা তোমার কাছে আমাকে ক্ষণিকের অতিথি করেই পাঠিয়েছেন। চিরদিনের সঙ্গী করে পাঠান নি।

ইন্দ্র একথার কোন জবাব দিতে পারল না। সে অন্যমনস্কভাবে খেয়ে যেতে লাগল।

ললিতা এবার খাওয়া থামিয়ে বলল, কথা বলছ না যে? তুমি সেই চলে এসেছ, আর তো কোন খোঁজই নাও নি। আমি না এলে আর কি দেখা হত কোনদিন। এই তো চলে যাব, আর কি কোনদিন তোমার মুখের কথা শুনতে পাব।

ইন্দ্র বলল, এমন করে বললে তোমার মুখের দিকে শুধু চেয়েই থাকতে হবে আমাকে, কোন কথা আর মুখ দিয়ে বেরুবে না।

খাওয়া শেষ হলে ওরা বিছানার ওপর পাশাপাশি বসল।

ললিতা বলল, সরিতাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় নেই, এখুনি চলে যেতে হবে। আচ্ছা, সরিতাকে দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, তাই না?

ইন্দ্র বলল, তুমি যেমন দেখেছ তেমনি।

ললিতা আধশোয়ার ভঙ্গীতে বসে আছে। বিছানার ওপর কনুই-এর ভর দিয়ে হাতের তেলোয় থুতনী রেখে চেয়ে আছে ইন্দ্রের মুখের দিকে।

ললিতা বলল, এড়িয়ে যাচ্ছ কেন বাবা। তোমার সুন্দরী বউটির ওপর তো আমি আর ভাগ বসাতে যাচ্ছি না।

ললিতা জানতে চাইছে সরিতার ব্যাপারে ইন্দ্রের আগ্রহ কতখানি। কোন ঈর্ষা নয়, শুধু কৌতূহল। যেখানে সে বঞ্চিত সেখানে অন্যের লাভ কতখানি তাই খতিয়ে দেখার লোভ। সরিতার সুখে নিজের গোপন মনের গভীরে একটুখানি দীর্ঘশ্বাস, রাতের নিঃসঙ্গ শয্যায় দু ফোঁটা চোখের জল। এতে নিজের মনের ভেতর দুঃখটুকুকে জিইয়ে রেখে এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া। কারু কোন সুখ কেড়ে নেওয়া নয়, শুধু একটুখানি দুঃখবোধ আর তাই নিয়ে বেঁচে থাকা।

ইন্দ্র হঠাৎ বলে বসল, ললিতা আর ইন্দ্র প্রসঙ্গ সরিতার অজানা নয়।

ললিতা চমকে উঠে বলল, সত্যি, তুমি সরিতার কাছে সব বলে দিয়েছ, কি লজ্জা!

ইন্দ্র বলল, বিশ্বাস কর, এক বর্ণ আমার মুখ দিয়ে বেরোয় নি।

তবে সে জানল কি করে?

তীক্ষ্ণ অনুমান শক্তি তার। সে তোমার স্বামীর ফটো সরিয়ে নেবার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। ছড়ান গোলাপ দেখেছে ঘরের মেঝেতে। বাইরের ঘরে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় তোমার চোখে দেখেছে লালের আভা। এর পর তার ঘটনাটুকু বুঝে নিতে বেগ পেতে হয় নি। আমাকে জিজ্ঞেস করতে আমি সবই স্বীকার করে গেছি। বলেছি দোষ ললিতার নয়, আমার। ও কিন্তু সব ঘটনাটাকেই খুব সহজ আর স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে।

ললিতা মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, আমি আর কোনদিন সরিতাকে মুখ দেখাতে পারব না ইন্দ্র। আমি তার কাছে অনেক ছোট হয়ে গেছি।

ইন্দ্র বলল, একটুও না। ও যদি তোমার সম্বন্ধে বিরূপ কিছু মন্তব্য করত তাহলে আমি কথাটা আদপেই তোমার কাছে তুলতাম না।

ললিতা সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ। এক সময় বলল, জান ইন্দ্র, আমি আর গাছ থেকে গোলাপ তুলি না।

ইন্দ্র প্রশ্নের ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকাল।

ললিতা বলল, গোলাপের শ্রেষ্ঠ উপহার আমার দেওয়া হয়ে গেছে তাই এ জীবনে গোলাপ তোলার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। গাছের ফুল গাছে ফোটে, গাছের তলাতেই ঝরে পড়ে।

ইন্দ্র বলল, আমি তোমাকে যদি কিছু দিয়ে থাকি তাহলে শুধু দুঃখই দিয়েছি, সামান্যতম তৃপ্তি দিতে পারি নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ললিতা বলল, যাবার সময় আর স্মৃতি নয়, দুঃখ নয়। শুধু তুমি আমার একান্ত প্রিয়জন, এইটুকু ভেবে যাব। আমাদের আর কোনদিনও দেখা হবে না, এই সত্য মেনে নিতে হবে। তারপর যদি দেখা হয়ে যায় তা হবে একান্ত আকস্মিক। আর শোন, সরিতাকে আমি ভালবাসব। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত তাকে ভালবাসতে বাসতে, তাকে বুকের ভেতর অনুভব করতে করতে আমি সরিতা হয়ে যাব। তখন যত দূরেই থাকি না কেন সরিতার ভেতর দিয়ে তোমাকে নিবিড় করে পাব।

ইন্দ্র চেয়ে আছে ললিতার মুখের দিকে। কোন কথা বলছে না। এ যেন অন্য ললিতা। যে ভালবাসার তপস্যায় হার মানতে জানে না। চোখের দেখায় হারলেও মনের অলক্ষ্য লোকে জিতে যায়।

ইন্দ্রের মনে হল, ললিতা জয়ের কৌটাটি কপালে নিয়েই জন্মেছে। সে হার মানবে না, কোনদিনও না। দুঃখ পেতে পারে কিন্তু দুঃখ জয়ের মন্ত্রও তার জানা।

আশ্চর্য, ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরল ইন্দ্র। সরিতা ওপারে কথা বলছে।

কি করছ তুমি ?

ইন্দ্র বলল, মিথ্যে বলব না সত্যি বলব ?

তার মানে ?

মানে খুব সোজা। মিথ্যে বললে বলব, শুয়ে শুয়ে তোমার কথা ভাবছি। আর সত্যি বললে বলতে হবে একটি মেয়ে আমার কাছে বসে আছে, তার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলছি।

ললিতা তাড়াতাড়ি ফোনের মুখে হাত চেপে রেখে বলল, তুমি এমন করলে আমি কিন্তু এখুনি পালাব।

ইন্দ্র মাথা নেড়ে জানাল, তার কোন ভয় নেই।

সরিতা ওপার থেকে বলল, মেয়েটি দেখতে কেমন ?

ঠিক তোমার মত।

নাম কি ?

ললিতা।

পেছন থেকে আবার ধাক্কা দিল ললিতা।

ইন্দ্র ফোনের মুখে হাত চেপে রেখে বলল, কোন ভয় নেই তোমার সবটুকুই সরিতা রসিকতা বলে ধরে নিচ্ছে।

সরিতা বলল, এখনও মনে হচ্ছে ভুলতে পারনি মেয়েটিকে ?

ললিতাকে কি ভোলা যায়, তুমিই বল না ?

খুব যে।

ইন্দ্র বলল, তোমারই তো বান্ধবী। বলতে পার তুমি আর ললিতা অভিন্ন হৃদয়। সেখানে একজনকে মনে রেখে আর একজনকে ভুলে যাই কি করে ?

মনে হচ্ছে মুডে রয়েছ ?

দুটো বাজতে চলল, দিদি কি এখনও ফেরে নি ?

ফোন করেছে, ফিরতে রাত হবে। মাধবী আম্মাকে কে যেন জানিয়েছে জন্মভূমির রিপোর্টার মিঃ পিল্লাই অ্যাকসিডেণ্টে বুকে আঘাত পেয়েছেন। তাই শুনে প্রেমা ত্রিবান্দ্রমের হাসপাতালে ছুটেছে।

খুব খারাপ লাগছে। ভদ্রলোক সত্যিকারের একজন গুণগ্রাহী। যেভাবে তোমার দিদির পাবলিশিটি দিয়েছেন তা মনে রাখার মত।

আমি আসছি তোমার ওখানে।

ইন্দ্র বলল, ললিতার সঙ্গে দেখা করতে চাও তো চলে এসো।

আবার পেছন থেকে ধাক্কা দিল ললিতা। ইন্দ্র সমানে মাথা নেড়ে নেড়ে তাকে আশ্বাস দিল।

সরিতা বলল, তাহলে আর যাব না।

সে কি, বান্ধবার সঙ্গে দেখা করবে না?

এ্যাই শোন, লক্ষ্মীটি তুমি একটু কষ্ট করে চলে এস। দুজনে সমুদ্রতীরে পালাব।

আসছি।

রাখছি তাহলে।

সরিতা আর ইন্দ্র ফোন ছেড়ে দিল।

ললিতা বলল, তুমি কি বেরুবে?

ইন্দ্র বলল, দুটো বাজল। তোমারও যাবার সময় হয়ে এল। চল তোমাকে এগিয়ে দিই। ঐ পথে বাস ধরে সরিতার কাছে একবার যেতে হবে।

ললিতা হেসে বলল, আমাকে এগিয়ে দেবার বদান্যতা না সরিতাকে চোখের সামনে পাবার তাড়া?

ইন্দ্র বলল, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই চল। তুলিকে নিয়ে নেব ওখান থেকে। সরিতা দারুণ খুশী হবে।

ললিতা বলল, থাক আমি কাউকে খুশী করতে আসি নি এ দুনিয়ায়। একা এসেছি একাই যাব। তুমি দয়া করে যদি কোভালম প্যালেস হোটেল অব্দি যাও সেই আমার লাভ।

ইন্দ্র বলল, দাঁড়ালে কেন ললিতা, বস খানিক সময়। দশ মিনিটে প্যালেস হোটেলের সামনে পৌছে যাব। এখন ঠিক ঠিক একটা বেজে সাতান্ন।

ললিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল, আর বসল না। ঘরের ভেতর টুকিটাকি জিনিস-গুলো দেখে পায়চারি করতে লাগল।

একটা অ্যালবাম টিপয়ের ওপর রাখা ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ছবি দেখতে লাগল। একটা ছবির ওপর চোখ আটকে গেল ললিতার।

আড় চোখে তাকিয়ে ওর কাণ্ডজলো লক্ষ্য করছিল ইন্দ্র।

ললিতা বলল, এ ছবিখানা কার? বলেই ইন্দ্রের দিকে তুলে ধরল ছবিটা।

ইন্দ্র বলল, ক্রিকেট খেলছে যে ছেলেটি?

ললিতা মাথা নাড়ল।

ইন্দ্র বলল, আজ থেকে ছ-সাত বছর আগে এই তরুণটির সঙ্গে ইন্দ্র রায় অভিন্ন দেহ, অভিন্ন হৃদয় ছিল।

দেবে আমাকে ছবিখানা?

এ ছবি নিয়ে তুমি কি করবে?

আচ্ছা থাক।

ইন্দ্র উঠে গেল ললিতার পাশে। বলল, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন ললিতা! নিজেকে বারে বারে সরিয়ে নিচ্ছ। এতটুকুতেই অভিমান উপচে উঠছে তোমার দুটি ঠোটে।

ললিতা বলল, নিঃসঙ্গতার দুঃখ তুমি বুঝবে না ইন্দ্র। না, কথাটা ঠিক বলা হল না। আমার মত নিঃসঙ্গ যেন কোথাও কেউ না থাকে, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে যাব মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত।

ললিতার বড় বড় দুটি চোখে জলভরা ঝিনুকের ছায়া।

ইন্দ্র ললিতাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, বাইরে সঙ্গ দিতে পারলাম না বলে কি তুমি আমাকে এমন করে দুঃখ দেবে ললিতা। আমার বুক জুড়ে যে মেয়েটি গোলাপ ছড়িয়ে দিল তার গন্ধ যে মৃত্যুর শেষে নিঃশ্বাসের সঙ্গেও মিলিয়ে যাবে না, সে কথা তোমাকে কেমন করে বোঝাই।

ললিতা বলল, মানুষের দেহ আর মন একযোগে যদি চলত তাহলে কত সমস্যারই না সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় না কেন ইন্দ্র? এই মুহূর্তে সারতার কথা ভেবে আমার যে মন তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে, সেই মনই আবার অসহায় হয়ে পড়ছে রাতের অন্ধকারে। তখন দেহ চাইছে তোমার উত্তপ্ত আলিঙ্গনে নিজেকে নিবিড় করে বাঁধতে। এ বোধহয় মানুষের চিরদিনের সমস্যা ইন্দ্র, যার কোন সমাধান নেই।

ইন্দ্র বলল, এমনি অন্তহীন, সান্ত্বনাহীন সমস্যার দোলায় মানুষকে দুলতে হবে। তবু মনে রেখ, ঈশ্বর আমাদের মন বলে একটি আশ্চর্য বস্তু দিয়েছেন। যাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। আর তাই জগতের অনেক দুঃখ অনেক বিপর্যয়ের হাত থেকে মানুষ বেঁচেছে।

আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, তাই বলে আমার মন অতীতের স্মৃতির পাতা উল্টে কোন প্রেমিকার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না, এ তো হতে পারে না। অনুরূপভাবে আমার স্ত্রী যদি তার কুমারী জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের

কথা ভেবে গোপনে চোখের জল ফেলে তাহলেও আমার কিছু বলার নেই। আশ্চর্য এই দেহ, আশ্চর্য এই মন। আমার মনে হয়, যার মন বলে কোন বস্তু আছে তার এমনি ব্যভিচারের হাত এড়াবার কোন উপায় নেই। এটাই সত্য ললিতা। বাকী যাঁরা নীতি শাস্ত্র রচনা করেন তাঁরা সত্যকেই এড়িয়ে যান। তাই বলছি, সরিতাকে বুকে নিয়ে ললিতার কথা যদি মনে পড়ে যায় তাহলে ইন্দ্র রায়কে আমি ব্যভিচারের দোষে অভিযুক্ত করব না। সেদিন ললিতা সরিতা একাকার হয়ে যাবে। সমান মর্যাদায় তারা থাকবে আমার বুক জুড়ে।

ললিতা ধীরে ধীরে ইন্দ্রের বাহুর বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। চোখের জলের শুকনো দাগগুলো রুমালে মুছে নিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, অভয় পেলাম তোমার কাছ থেকে। তোমার কথা ভাবতে গিয়ে বার বার মনে হত, আমি এ কি অন্যায় করছি। কিন্তু আজ খোদ মালিকের কাছ থেকেই অভয় পেয়ে গেলাম।

বেরিয়ে এল ওরা দুজনে হোটেল থেকে। ললিতার মনে হল, তার আর কোন খেদ নেই, না পাওয়ার কোন দুঃখ নেই।

ওরা হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। নারকেল গাছের আলোছায়ার ভেতর দিয়ে ওরা চলতে লাগল প্যালেস হোটেলের দিকে। ইন্দ্র দেখল, ললিতার সাদা মুণ্ডি আর নেরিয়দের ওপর দিয়ে সোনালী আলো আর ছায়ার কালো ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছে। এ যেন ললিতা নামের মেয়েটির আশ্চর্য মনের ছবি।

ওরা প্যালেস হোটেলের একটু দূরে থমকে দাঁড়াল। দুজন দুজনকে আলিঙ্গন আর চুম্বনে বেঁধে রাখল। কিছু পরে যে যার পথে চলে গেল।

ওয়ার্ড মাস্টারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে দোতলার সাত নম্বর রুমে ঢুকল প্রেমা। অনেকগুলি পেয়িং বেড পাশাপাশি রয়েছে। বাইশ নম্বর বেড ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তের এক কোণায়। বাইরে পুরোপুরি সন্ধ্যা না নামলেও রুমের ভেতর কোন কোন বেডের পাশে টেবল ল্যাম্প জ্বলছে। ভিজিটাররা ভীড় করে আছে এখনও।

প্রেমা প্রশস্ত ঘরখানা পেরিয়ে গিয়ে দক্ষিণ প্রান্তে বাইশ নম্বর বেডের কাছে পৌঁছল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন মিঃ পিল্লাই। বুক আর ডান হাত প্ল্যাস্টারে মোড়া। এ বেডে আলো জ্বলেনি। দক্ষিণের জানালা খোলা। গোধূলির ম্লান খানিকটা আলো তখনও ঘরের ভেতর থেকে সরে যায়নি।

একটি অসহায় নিঃসঙ্গতার ছায়া। সিলিংএর দিকে চোখ মেলে স্থির হয়ে কিছু যেন ভাবছেন মিঃ পিল্লাই। ঐ সামান্য কয়েক ইঞ্চ পুরু সিলিং আবৃত করে রেখেছে সারা নক্ষত্রখচিত আকাশটা। সামান্য একটুখানি আবরণ তবু কি অসামান্য তার বাধা দেবার ক্ষমতা। মিঃ পিল্লাই কি ভাবছেন তাঁর জীবনের কথা? এক টুকরো আকাশ আর কটি তারা নিয়ে সুখী একটি সংসার তিনি পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঐ একটুখানি ভাগ্যের বাধা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারলেন না। সুখের জন্যে ব্যাকুল হলেন, কিন্তু ঐ তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের কাছে একবিন্দু অমৃত নিয়ে একটি কোমল বাহু এগিয়ে এলনা। শুধু পথ চাইতে চাইতে, আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে দিনগুলো কোথা দিয়ে পার হয়ে যেতে লাগল। শুধু পার হয়ে যাওয়া নয়, দেহের সবত্র রেখাচিত্র এঁকে এঁকে চলে যাওয়া। এবারের মত বসন্ত গত জীবনে—একটা সুতীব্র হাহাকার দূরাগত ধ্বনির মত বাজতে বাজতে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রেমা মন্ত্রচালিতের মত কখন হাত রাখল মিঃ পিল্লাই এর মাথার একরাশ চুলের ওপর। পিল্লাই ঘাড় কাৎ করে দেখার চেষ্টা করতেই প্রেমা পাশে এগিয়ে এল।

মিঃ পিল্লাই যেন ভাবতেই পারছেন না ব্যাপারটা। সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে উঠেছে ঘরের এই কোণে। তিনি ভুল দেখছেন না তো! কোন মমতাময়ী নার্সকে কি তিনি তাঁর এক বিশেষ পরিচিত মেয়ে বলে ভুল করলেন!

প্রেমা আস্তে বলল, সুইচটা অন করে দেব?

বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরলেন মেয়েটিকে মিঃ পিল্লাই। গলা দিয়ে ক্ষীণ একটা আওয়াজ বেরুল, তুমি প্রেমা! আমি ভুল কিছু বলছি না তো সিস্টার?

প্রেমা সুইচটা অন করে দিল। মৃদু একটুকরো আলো ছড়িয়ে পড়ল বিছানায়। প্রেমা একপাশে বসে বলল, কেমন মনে হচ্ছে এখন?

মিঃ পিল্লাই অভিভূত হয়েছেন বলে মনে হল। ভাঙা গলায় বললেন, আমি ভাবতেও পারিনি প্রেমা, এখানে তোমাকে দেখব।

প্রেমা বলল, মাধবী আম্মার কাছে খবরটা পেয়েই চলে এসেছি সিধে।

আবেগে গলাটা বন্ধ হয়ে গেল মিঃ পিল্লাই এর। তিনি শুধু প্রেমার হাতটা চেপে ধরে রইলেন। তার দিকে তাকালেন না। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে উদ্গত আবেগকে চাপতে লাগলেন।

প্রেমা মিঃ পিল্লাইএর অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। সে বলল, আপনি

এসেছি।

এবার কথা বললেন মিঃ পিল্লাই প্রেমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, এখন মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে এই বিছানায় পড়ে থাকলেও কোন দুঃখ নেই।

প্রেমা বলল, কোন কষ্ট হচ্ছে না আপনার?

ম্লান হাসলেন মিঃ পিল্লাই। বললেন, শরীরের কষ্ট তো খানিকটা আছেই। তবে তা একরকম করে সইতে পারছি, কিন্তু নিঃসঙ্গতার ভার তো বওয়া যায় না।

প্রেমা কিছু না বলে মিঃ পিল্লাই এর অনাবৃত হাতখানার ওপর তাব নরম আঙুলগুলো বোলাতে লাগল। এই মুহূর্তে কোথা থেকে একটা মমতার ঢেউ বয়ে গেল তার বুক ভাসিয়ে দিয়ে। সে মিঃ পিল্লাইএর চুলের ভেতর দিয়ে তার আঙুলগুলো এবার চালাতে লাগল।

কেউ কোন কথা বলতে পারল না সেই মুহূর্তগুলোতে। এ যেন শুধু কর্তব্য নয়, কর্তব্যের অতিরিক্ত কিছু। একজন পেয়ে চলেছে, অন্যজন দিয়ে যাচ্ছে।

ভিজিটারদের হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার ঘণ্টা কখন বেজে গেছে; এখন সারা ওয়ার্ড শূন্য। ওরা সময়ের সীমা পেরিয়ে কোথায় চলে গেছে, যেখানে শব্দের ধ্বনি পৌছয় না।

একটি নার্স এসে পাশে দাঁড়াতেই উঠে দাঁড়াল প্রেমা। বলল, সরি, ভেরী সরি।

নার্সের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা। এরকম ছবি সে বহু দেখেছে। প্রিয়জনকে ছেড়ে যেতে চায় না কেউ সহজে।

প্রেমা বলল, আমি আবার আসব। একটু সময় পেলেই চলে আসব।

মিঃ পিল্লাই মাথা নাড়লেন। প্রেমা চলে এল সাত নম্বর রুম থেকে। করিডোর পেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিতে যাচ্ছে, পেছন থেকে মেয়েলি গলায় ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল।

মুখ ফিরিয়ে দেখে রুম নাম্বার সেভেনের সেই নার্সটি।

হাসিখুশি মুখখানা করে নার্সটি বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

নিশ্চয়, বলুন।

আপনি কি সেই বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মিস মেনন?

প্রেমা হেসে বলল, আদপেই বিখ্যাত নই, তবে আমি প্রেমা মেনন, মোহিনী আট্যমের শিল্পী।

নার্সটি বলল, আমি আপনার নাচ দেখেছি, পেপারে ছবিও দেখেছি। আপনাকে দেখেই আমি অনুমান করেছিলাম। আপনি চলে আসার পর পেসেণ্টকে জিজ্ঞেস করে আমার অনুমান যে সত্যি তা বুঝতে পারলাম।

প্রেমা বলল, উনি জন্মভূমি পত্রিকার রিপোর্টার মিঃ পিল্লাই।

নার্সটি বলল, আমি তা জানি। আর ভদ্রলোক ভীষণ ভাল। চুপচাপ থাকেন। চেঁচামেচি করে নার্সদের ডাকহাঁক করেন না। প্রকৃতিতে বড় শান্ত। দু' একটা কথা বললে উনি বেশ খুশী হয়ে ওঠেন। কাগজের দু'একজন লোক ছাড়া ওঁর ফ্যামিলির কাউকে আসতে দেখিনি আমরা। আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আর একটা প্রশ্ন করব।

বলুন।

আপনি কি ওঁর ফ্যামিলির কেউ ?

বলতে পারেন, আবার নাও বলতে পারেন।

ফিক্ করে হেসে ফেলল মেয়েটি। বলল, কি রকম ?

রক্তের সম্পর্ক নেই তবে ওঁকে আমি আত্মীয় বলেই ভাবি।

একটু থেমে প্রেমা বলল, উনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

নার্সটি তরুণী। মুখের ভেতর এখনও নিছক কর্তব্যের কঠিন রেখাগুলো আঁকা হয়নি। হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে এসে গেল।

আপনার নাচ হলে একটু খবর যেন পাই। বড ভাল লাগে আপনার নাচ।

প্রেমা বলল, আপনাকে ফোনে কোথায় পাব বলুন ?

নার্সটি বলল, কখন ডিউটি, কখন নেই। আপনি হস্পিট্যালের ফোনে পাবেন না। আর আমার নিজের ফোনও নেই।

প্রেমা বলল, আমার ফোন নাম্বারটা নিয়ে রাখতে পারেন।

মেয়েটি প্যাড নিয়ে এসে বলল, লিখে দিন আপনার নাম ঠিকানা আর ফোন নাম্বার। আপনার অটোগ্রাফটাও পেয়ে যাব।

প্রেমা একটুখানি হেসে প্যাডের পাতায় নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার লিখে দিয়ে বলল, এখন আমার যে একটু উপকার করতে হবে ভাই।

কি বলুন ?

একটা কেবিনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

নার্সটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে মাথা নাড়ল। বলল, একটিও খালি নেই।

প্রেমা বলল, সে তো আমি নীচ থেকে উঠে আসার সময় জেনে এসেছি।

তরুণী নার্সটি বলল, ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি খালি হবার সম্ভাবনাও কম।

প্রেমা পরিস্থিতিকে সহজ করে দেবার জন্যে বলল, না থাকলে আর পাওয়া যাবে কি করে। আপনি বরং পেসেন্টের দিকে একটুখানি নজর রাখবেন ভাই, তাহলেই হবে।

নার্সটি হঠাৎ কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, ভি আই পিদের জন্যে একটি এয়ারকণ্ডিশণ্ড কেবিন রয়েছে। ওটি দেবার অধিকার প্রিন্সিপাল ছাড়া কারু নেই। আসুন, আমি কথা বলে দেখছি। মুড ভাল থাকলে পেয়ে যাবেন।

প্রেমা নার্সটির সঙ্গে নীচে নেমে প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারের দিকে চলল।

প্রিন্সিপাল তাঁর বসার ঘরে ছিলেন। মৃদু আলোতে ড্রিঙ্ক করছিলেন সম্ভবত। দারোয়ান নার্সটিকে চেনে তাই বাধা দিল না। প্রেমাকে ইঙ্গিতে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে ঢুকল মেয়েটি।

ভেতরে কিছু কথা হচ্ছিল। বাইরে স্পষ্ট কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। এক সময় হা হা করে হেসে উঠেই থেমে গেলেন প্রিন্সিপাল।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল নার্সটি। বলল, চলুন, আপাতত একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু ভি আই পি এলেই খালি করে দিতে হবে, এই কণ্ডিশন। চার্জ প্রায় দেড়গুণ।

প্রেমা বলল, টাকার জন্যে ভাবছি না, পাওয়া নিয়ে কথা।

নার্সটি বলল, ক্রাইস্টের কাছে প্রার্থনা, অন্তত দিন পাঁচেক যেন রাজ্যের ভি আই পিরা সুস্থ দেহে থাকেন।

প্রেমা হেসে বলল, পাঁচদিন কেন?

তরুণী নার্সটি বলল, বুঝলেন না, পাঁচদিন পরে আর একখানা কেবিন খালি হয়ে যাচ্ছে। তখন দরকার হলে ওটাতেই সিফট করে নেব।

পরের দিন প্রেমা এল। কেবিনের অগ্রিম দেয় টাকা সে আগেই দিয়ে গিয়েছিল। বিকেলের দিকে কিছু ফল নিয়ে ঢুকল সে। মিঃ পিল্লাই যাতে সাড়া না পান সেজন্যে জুতোয় আওয়াজ না তুলে অতি ধীরে দরজা ঠেলে ঢুকল। কিন্তু ঢুকেই দেখল মিঃ পিল্লাই তার দিকেই চেয়ে আছেন।

প্রেমা মিটসেফের পাল্লা খুলে ফলগুলো একটা প্লেটে রাখল। চায়ের একটা কাপ আর প্লেট ধুয়ে নিল বেসিনে। কতকগুলো আঙুর ধুয়ে কাপে ভরে নিয়ে এল।

বাধ্য ছেলের মত শুয়ে রইলেন মিঃ পিল্লাই। আঙুরগুলো সুন্দর নরম আঙুলে তুলে তুলে খাইয়ে দিতে লাগল প্রেমা।

খাওয়া শেষ হলে প্রেমা কাপ প্লেট পরিষ্কার করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে এল।

বিছানার পাশে বসে মুখ নীচু করে বলল প্রেমা, কেমন বোধ করছেন এখন ?

খুব খারাপ।

খারাপ! কেন ? নীচের এনকোয়ারির রিপোর্ট তো খুবই ভাল।

মিঃ পিল্লাই বললেন, শরীর ভাল থাকলেই কি সব ?

প্রেমা বলল, কেন মনের আবার কি হল ?

মিঃ পিল্লাই বললেন, আমি তো ত্রিবান্দ্রমের মহারাজ নই যে এয়ারকণ্ডিশণ্ড কেবিনে থাকব। এমনি পেইং বেডের চার্জের জন্য বন্ধুদের কাছে ঋণী হয়ে রয়েছি। আবার তুমি আমার সবচেয়ে বড় মহাজন হয়ে বসলে। ডান হাত প্লাস্টারে বাঁধা। আমি যে সামান্য একখানা চেকে সই করব তারও উপায় নেই।

প্রেমা বলল, বিজনেস ম্যানের মেয়ে আমি, এমন সুযোগ ছাড়া যায় কখনো! এখন দাদন দেব তারপর চক্রবৃদ্ধি সুদে উসুল করে নেব।

মিঃ পিল্লাই কি যেন বলতে চাইলেন, সত্যি প্রেমা আমি আশ্চর্য···।

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না মিঃ পিল্লাই। প্রেমা বলল, কাজ নেই আর একটা নতুন আশ্চর্যে। এমনিতেই পৃথিবী জুড়ে সাত সাতটা আশ্চর্য বিরাজ করছে।

মিঃ পিল্লাই করুণ গলায় বললেন, একটা কথাও কি তুমি আমাকে বলতে দেবে না ?

সুস্থ হয়ে নিন আগে, তারপর আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে মুখোমুখি বসে এক বাণ্ডিল কথা শুনব।

মিঃ পিল্লাই নিষ্পলক চেয়ে রইলেন প্রেমার মুখের দিকে। একটুখানি হাসির রেখা শুধু ফুটে রইল।

প্রেমা বলল, সুস্থ হওয়া নিয়ে কথা। টাকা কোথা থেকে আসছে সে খোঁজ রোগীর রাখার কথা নয়।

মিঃ পিল্লাই ওদিক দিয়ে গেলেন না। বললেন, এই কেবিনের নার্সটি তোমাকে দেখবে বলে সারাদিন অস্থির হয়ে আছে।

প্রেমা ঝর্ণার মত নুড়ি গড়ানো হাসি হেসে বলল, আমি কি এতই দর্শনীয়, বলুন না মিঃ পিল্লাই ?

মিঃ পিল্লাই বললেন, তুমি শুধু দর্শনীয়ই নও আকর্ষণীয়।

আচ্ছা, কেবিনের নার্সটি কি ঐ পেয়িং বেডের সেই নার্স ?

না। তবে তার বান্ধবী। তার মুখ থেকেই তোমার কথা শুনেছে বলে মনে হয়। সারাদিন দুজনে এখানে ওখানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে লাটুর মত ঘুরছে, গল্প করছে।

প্রেমা বলল, আপনি ভাল হয়ে জন্মভূমির পাতায় আমার একটা পাবলিসিটি দিয়ে দেবেন।

কি ধরনের পাবলিসিটি চাই বল ?

এই ধরুন লিখলেন,—যেখানে যেখানে আলোক শিখার মত নাচতে নাচতে চলেছে নর্তকী প্রেমা, সেখানে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে প্রেমাকে দেখবে বলে।

মিঃ পিল্লাই বললেন, তুমি বিশ্বজয়ে বেরুবে প্রেমা ?

প্রেমা বলল, আপাতত বিশ্ববিজয় থাক, আমি প্রাচীন ভারতের রাজাদের মত দিগ্বিজয়ে বেরুতে পারলেই খুশী।

মিঃ পিল্লাই বললেন, একটা ব্যালে গ্রুপ তৈরী কর প্রেমা। তাদের নিয়ে তোমার পরিকল্পনা মত নতুন নতুন নাচ কম্পোজ কর। সারা দেশের মানুষকে উপহার দাও। আশ্চর্য একটা উন্মাদনায় কাটবে তোমার দিন। তাছাড়া দেশকে মহৎ একটা কিছু তুমি দিয়েও যেতে পারবে।

প্রেমা গালে আঙুল ঠেকিয়ে চুপচাপ কি যেন ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তলিয়ে গেল চিন্তার গভীরে। কথাটা নাড়া দিয়েছে তার সমস্ত মনটাকে। এ কাজে একটি মানুষকে চাই তার পাশে। সে হবে তার প্রেরণা, তার সাথী, তার গুরু। দেবন! দেবন কি সাড়া দেবে তার ডাকে ? দেবন তার গ্রুপের সারথী হলে সে যে বিশ্বজয়েও বেরুতে পারে।

কি ভাবছ ?

প্রেমার ধ্যান ভাঙল। বলল, আপনার কথাই ভাবছি। দারুণ একটা পরিকল্পনা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন আপনি।

মিঃ পিল্লাই বললেন, তোমার প্রতিভা আছে তাই এ কথা মনে এল।

প্রেমা বলল, যদি পরিকল্পনা মত কাজে এগোই তাহলে আপনার পুরোপুরি সাহায্য আমার দরকার হয়ে পড়বে।

যদি পঙ্গু হয়ে না পড়ি প্রেমা, তাহলে সারা ভারত তোমার ট্রুপের সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। যেখানে যেভাবে পাবলিসিটি দেওয়া দরকার তার সব দায়িত্ব আমি নিজের ওপর তুলে নেব।

প্রেমা বলল, আপনাকে পঙ্গু হতে দিচ্ছে কে? সারা ভারত আপনি একটি স্বর্ণ ঈগলের মত ডানা মেলে ঘুরে বেড়াবেন।

মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, অন্তত তোমার জন্যে আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে।

একটি নার্স ঘরে ঢুকল। প্রেমার দিকে দারুণ রকম কৌতূহলী চোখে তাকাল। তারপর এগিয়ে এসে টেম্পারেচার নিল। চার্টে নোট করল। যাবার সময় প্রেমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। আলাপ করতে চায় অথচ কিভাবে করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

প্রেমা হেসে বলল, আপনার রোগী শান্ত হয়ে আপনার নির্দেশ মেনে চলছেন তো, না আপনাকে মাঝে মাঝে ধমক দিতে হচ্ছে?

মেয়েটি আগের নার্সটির মতই ছেলে মানুষ। সে প্রেমার কথা শুনে খিল খিল করে হেসেই ফেলল।

হাসি থামলে বলল, খুব বেশী রকমের শান্ত। ওঁর দিকে না তাকালে বোঝাই যায় না উনি ঘরে আছেন কি নেই।

প্রেমা বলল, ওঁকে কিন্তু একটুও বিশ্বাস করবেন না। উনি চুপচাপ থাকলে কি হয় মনে মনে সব নোট করছেন। একবার বেরুতে পারলে হয় মেডিকেল কলেজ কম্পাউণ্ড ছেড়ে। তারপর আপনাদের সম্বন্ধে ওঁদের বিখ্যাত পত্রিকায় রিপোর্ট করে দেবেন।

মিঃ পিল্লাই বললেন, রিপোর্টাররা খুব বদ লোক হয় বুঝি?

প্রেমা হেসে বলল, মোটেও না, তবে আপনার কথা আলাদা।

আমি বুঝি খুব খারাপ লোক?

যদি খারাপ বলি তাহলে আমার নামে উল্টো রিপোর্ট করে দেবেন তো?

মিঃ পিল্লাই বললেন, তোমার নামে উল্টোপাল্টা রিপোর্ট করলে তোমার ফ্যানেরা আমাকে আস্ত রাখবে ভেবেছ? বুক ভেঙেছে, এরপর মাথাটাও ভাঙবে।

নার্সটি হেসে বলল, আপনি দারুণ কথা বলতে পারেন।

কি রকম?

এই যে বললেন, বুক ভেঙেছে।

হো হো করে হেসে উঠতে গিয়ে বুকে একটা ব্যথা পেয়ে থেমে গেলেন মিঃ পিল্লাই।

নার্সটির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মিঃ পিল্লাই-এর খুব কাছে সরে এসে বলল, মনে হচ্ছে আপনার বুকে লাগল?

মিঃ পিল্লাই এবার আস্তে বললেন, এর চেয়ে অনেক বেশী আঘাতই পেয়েছি, সুতরাং এইটুকু সইবার শক্তি আমার আছে।

নার্সটি এবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল। পরে মুখখানা গম্ভীর করে বলল, এমন আচমকা হেসে উঠবেন না।

প্রেমা বলল, এই তো সিস্টারের মত কথা।

নার্সটি বলল, আপনি নিশ্চয়ই মিস মেনন।

প্রেমা বলল, আপনার অনুমানের ক্ষমতা প্রশংসা করার মত।

আমি আপনার নাচ দেখেছি, পদ্মনাভপুরম প্যালেসে। কিন্তু অনেক দিনের পর দেখছি, তাই একবার যাচাই করে নিতে হল।

আপনার বান্ধবী আমার কথা কি বলেন?

ও। আপনি লতা আয়েঙ্গারের কথা বলছেন? সারা দিন আপনার কথাই ও আমাকে বলছিল। ওতো আপনার একজন ফ্যান হয়ে গেছে।

তাই নাকি?

ডিউটি পড়েছে, তাই আসতে পারছে না। নইলে এখুনি এখানে চলে আসত।

প্রেমা বলল, আমার কাজ আছে, আজ আমি উঠব ভাই। লতাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

দু দিন পরে আবার এল প্রেমা। কেবিনে ঢুকেই কিন্তু সে চমকে উঠল। একটি মহিলা বসে আছেন মিঃ পিল্লাই-এর বিছানায়, প্রায় তাঁর গা ঘেঁষে। মহিলাটির মুখ পেছন থেকে বোঝা যাচ্ছে না। মিঃ পিল্লাই-এর মুখখানাও আড়াল পড়েছে। ভদ্রমহিলা মিঃ পিল্লাই-এর বাঁ হাতখানা নিজের হাতে ধরে বসে আছেন।

প্রেমা ঘরের ভেতর নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু বেরিয়ে যাবে কি বিছানার পাশে এগিয়ে যাবে তা ভেবে পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করল। সরে যাওয়া যেন গা ঢাকা দেবার ব্যাপার বলে মনে হল তার।

বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মহিলাটির নজর পড়ল। তিনি একটুখানি

অপ্রস্তুত হয়েই যেন মিঃ পিল্লাই-এর হাতখানা বিছানার ওপর রেখে দিলেন। মিঃ পিল্লাই চোখ বুজে ছিলেন। হাতখানা নামিয়ে রাখতে চোখ চাইলেন।

প্রেমা দেখল দুজনের চোখই ভেজা। ভদ্রমহিলা রুমালে চোখ মুছে নিলেন। মিঃ পিল্লাই মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, ইনিই সেই বিখ্যাত নর্তকী প্রেমা মেনন। যার কথা কাল তোমাকে বলেছিলাম।

একটু থেমে প্রেমার দিকে চেয়ে বললেন, বলতো ইনি কে ?

প্রেমা ভদ্রমহিলাব দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে বলল, ভুল হলে মনে কিছু করবেন না। আপনি কি মিসেস পিল্লাই ?

ভদ্রমহিলা হাসলেন, কিন্তু কেমন যেন একটুখানি অপ্রস্তুত চোখে তাকালেন মিঃ পিল্লাই-এর দিকে।

মিঃ পিল্লাই বললেন, একশো নম্বর পেয়ে গেলে প্রেমা। অসাধারণ তোমার মানুষ চেনার ক্ষমতা।

ভদ্রমহিলা একটু সরে বসে প্রেমাকে বিছানায় বসতে বললেন। প্রেমা চেয়ার টেনে এনে বিছানার পাশে বসে বলল, ও জায়গাটা আপনার। ওখানে বসার অধিকার কেবল আপনারই।

ভদ্রমহিলা বললেন, ও রকম বলছেন কেন ভাই। আপনি যে ওর কতখানি উপকার করেছেন তা কাল সারাদিন ধরেই উনি বলে গেছেন।

প্রেমা হেসে বলল, আর আপনি এমনি সব বিশ্বাস করে নিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, অবিশ্বাসের কিছু নেই। উপকার না পেলে কেউ কি কোনদিন এতখানি করে বলে।

প্রেমা বলল, বিশ্বাস করুন, উনি মানুষের জন্যে যা করেন তার তুলনায় আমাদের করা কিছুই না।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, খুব খারাপ লাগছে ভাই আপনাকে ছেড়ে এখুনি উঠে যেতে হচ্ছে বলে। আমি উঠছিলাম, আর আপনি এসে ঢুকলেন।

প্রেমাও উঠে দাঁডিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে বসে যাকে বলে আলাপ তার একটুও কিছু হল না। তবে আপনার প্রশংসা এত শুনেছি ওঁর মুখে যে আপনি আমার একান্ত পরিচিতই হয়ে আছেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, উনি নিজে ভাল মানুষ তাই সকলের ভালটাই দেখে বেড়ান। আর মানুষ চিনতে পারেন না বলে ঠকেনও পদে পদে।

একটু থেমে বললেন, আমার মেয়ে জানে না যে আমি এখানে এসেছি। প্রতি শনিবার সে বাড়ী আসে।

প্রেমা বলল, উনি কি কোথাও কাজ করেন ?

ভদ্রমহিলা বললেন, সম্মান করে কথা বলার বয়েস ওর নয়। সবে ষোলতে পড়েছে। মেয়েদের একটা স্কুলে টিচারদের চা জলখাবার এনে দেবার কাজ করে। ওখানেই হোস্টেলে থাকে। ফাই ফরমাস খাটে। শনিবার হলেই বাড়ী চলে আসে।

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

প্রেমা এখন মিঃ পিল্লাই-এর মুখোমুখি।

প্রেমা বলল, উনি আপনার অ্যাকসিডেন্টের খবর পেলেন কি করে ?

জন্মভূমি পত্রিকায় খবরটা বেরিয়েছিল। উনি জন্মভূমি পড়েন না কিন্তু ওঁর এক বান্ধবী গল্পের ছলে একদিন ওঁকে খবরটা জানায়। আর সঙ্গে সঙ্গে উনি চলে আসেন মেডিকেল কলেজ হসপিটালে।

প্রেমা বলল, বড় ভাল হল মিঃ পিল্লাই। পরিস্থিতিই আপনাদের বিচ্ছেদে ফাটলে জোড়া লাগিয়ে দিলে। আমার তো ওঁকে দারুণ ভাল লাগল।

তুমি সত্যি বলছ প্রেমা ?

প্রেমা বলল, যে মেয়ে তাঁর দুঃখের দিনে আপনার সাহায্য নিলেন না আর আজ আপনার দুঃখের সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে ভাল লাগবে না তো কি পথের মেয়েদের ভাল লাগবে ?

মিঃ পিল্লাই বললেন, জান প্রেমা তুমি আজ আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তোমাকে তাই আজ কথাটা বলতে চাই। দুদিন তুমি আসনি কিন্তু উত্তরা এসেছে। অনেক কথা হয়েছে ওর সঙ্গে। অনেক দুঃখ মান-অভিমানের পর ও রাজী হয়েছে আমার ঘরে আসতে। বড় আত্মাভিমানী মেয়েটা।

প্রেমা টেনে টেনে বলল, আমি দা-রু-ণ খুশী হয়েছি মিঃ পিল্লাই। যত দেরীই হোক এই মিলনটা দরকার ছিল। আপনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না! কিন্তু…!

কিন্তু কি প্রেমা ?

কিন্তু আর কিছু নয়, ওঁর মেয়েটি সম্বন্ধে কি ভেবেছেন ?

মিঃ পিল্লাই বললেন, আমি দুটো প্রস্তাব উত্তরাকে দিয়েছি। আমার বাড়ীতে মেয়ের মর্যাদায় সে থাকবে। নয়তো মেয়েদের কোন হোস্টেলে রেখে ওকে পড়াব। তারপর সময় হলে ভাল বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দেব।

কোনটাতে ওঁর সম্মতি রয়েছে ?

মিঃ পিল্লাই বললেন, উত্তরার ইচ্ছে মেয়ে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা

ওকে আর আনা নয়।

প্রেমা বলল, পড়াশোনা করাটা ভাল কিন্তু আপনার সান্নিধ্যে মেয়েকে উনি আনতে চাইছেন না কেন?

মিঃ পিল্লাই বললেন, মেয়ে উত্তরার সুতরাং মেয়ে সম্বন্ধে ফাইনাল ডিসিসান তাঁর। তবে আমার মনে হয় মেয়ে বড় হয়েছে। মৃত বাবার ওপর তার একটা শ্রদ্ধা আর দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। তার পক্ষে আমার সঙ্গে নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার অসুবিধে হতে পারে। এইসব ভেবেই বোধকরি উত্তরা মেয়েকে দূরে রাখতে চাইছে।

প্রেমা বলল, ওঁর ডিসিসান আমার তো বেশ ভালই লাগছে। মিসেস পিল্লাই যা কিছু করেন বেশ বিবেচনা করেই করেন।

মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, ওঁর এক সময় চলে যাওয়াটাও কি তাই?

প্রেমা বলল, নিশ্চয়ই। আপনাকে ছেড়ে চলে যাবার আগে বহুবার নিজের সঙ্গে উনি তর্কে বসেছিলেন বলেই মনে হয়। কোন একটা কাজ উনি স্থির চিন্তা করেই করেন।

মিঃ পিল্লাই বললেন, এখন ওঁর ফিরে আসাটাও কি অনেক চিন্তার ফল বলে তুমি মনে কর?

প্রেমা বলল, প্রথম দিনেই কি আপনার কাছে ফিরে আসার প্রসঙ্গটা উঠেছিল?

হ্যাঁ। অনেক কথার পরে আমার ওপর ওর দুর্বলতাটুকু লক্ষ্য করে আমি প্রস্তাবটা এনেছিলাম।

উনি কি সঙ্গে সঙ্গেই আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিলেন?

মিঃ পিল্লাই বললেন, না। পরের দিন এসে বলল, এ সময়ে তোমার কাছে না আসি এমন শক্তি আমার কই। তোমার ঘরে আসি আর না আসি তোমার সেবার ভার তো আমাকে নিতে হবে।

প্রেমা বলল, আপনাকে দারুণ রকম ভালবাসেন মিসেস পিল্লাই তাই অভিমানটাও ওঁর তীব্র।

মিঃ পিল্লাই বললেন, আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম জানো? আমি বলেছিলাম যদি সেবার লোভই দেখালে তাহলে তোমাকে কাছে পাবার ইচ্ছা থেকে আমাকে বঞ্চিত করনা। এবারেও না বলে বুকখানা আমার আর ভেঙে দিও না।

মিঃ পিল্লাই বললেন, তা বলতে পার। উত্তরা শুধু আমার হাতটা তার ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলেছিল এত দুঃখও তুমি দিতে পার। সতেরটা বছরের একটি দিনও গেছে কিনা জানি না যেদিন তোমার কথা আমি ভাবিনি। মহাদেবের মন্দিরে তোমার সুখ কামনা করে পাগলের মত প্রার্থনা করেছি। তোমার কাছে না এসেও আমার কাছে তোমাকে চিরদিন রেখেছিলাম।

বলতে বলতে ওর চোখ দুটো ছল-ছলিয়ে উঠেছিল। আমি মুখখানা তুলে ধরতেই টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছিল ধারা। আর তখনই আমি বুঝেছিলাম প্রেমা, সতেরো বছর ধরে যে ঘরখানা শূন্য পড়ে আছে সে ঘরে উত্তরা আসছে।

প্রেমা বলল, আপনাদের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলনটা সারাজীবন অটুট থাক, অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে এই কামনাই আমি জানাব।

প্রেমার হাতখানা ধরলেন মিঃ পিল্লাই। বললেন, অসম বন্ধুত্ব তোমার সঙ্গে আমার প্রেমা, কিন্তু আমার প্রৌঢ় প্রেমের দর্শক একমাত্র তুমি। তোমার কাছে মনের কথা যেমন করে উজাড় করে দিলাম আর কারো কাছে সম্ভব হবে না তেমন করে বলা। তুমি সারা জীবন আমাকে শুধু একটি অনুমতি দিও প্রেমা—সুখ দুঃখের কথাগুলো যেন তোমার কাছে অসঙ্কোচে উজাড় করে দিতে পারি। আমি মনে করি বন্ধু স্ত্রীর চেয়েও অনেক বিষয়ে আরও অন্তরঙ্গ। স্ত্রীর কাছে যা বলা যায় না বন্ধুর কাছে তাও বলা চলে অসঙ্কোচে।

প্রেমা বলল, আপনার এ ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছারও আশ্চর্য মিল আছে জানবেন। দুঃখ সুখ জীবনে যা আসুক না কেন, আমিও ছুটে আসব বন্ধুর কাছে পরামর্শ অথবা সান্ত্বনার আশায়।

মিঃ পিল্লাই অভিভূত হলেন। তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। শুধু প্রেমার হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

সরিতার ফোন এল—ললিতার চিঠি এসেছে।

বুকখানা কেঁপে উঠল ইন্দ্রের। সে স্বাভাবিক গলায় ঔৎসুক্য না দেখিয়ে বলল, কি খবর, বিয়ের চিঠি নাকি?

সরিতা বলল, আশ্চর্য! তুমি জানলে কি করে? তোমার কাছেও খবর দিয়ে চিঠি লিখেছে নাকি?

অথবা ইন্দ্র কেমন [illegible]
কৌতুকের জালটা বুনছে না ঘটনাটা নির্ভেজাল।

সে ভাঙা ভাঙা গলায় কৌতুক করার চেষ্টা করে বলল, সরিতা না হয়ে তুমি যদি সরিৎশেখর হতে তাহলে ললিতা তোমাকেই পতিত্বে বরণ করত।

ও! কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি? অন গড. চিঠি এসেছে ওর বিয়ের খবর নিয়ে।

প্রাণপণ শক্তিতে রিসিভারটা মুঠো করে ধরে আত্মগোপনের চেষ্টায় জোরে কথা বলতে লাগল ইন্দ্র, যা হোক এতদিনে ঠিক ঠিক একটা পথ পেল তোমার বান্ধবী। এইটুকু বলতে পারি, ওর দিক থেকে ভালই হল।

সরিতা ওপার থেকে বলল, বুকে লাগছে না তোমাব?

অস্বাভাবিক গলায় হো হো করে হেসে উঠল ইন্দ্র, দারুণ লাগছে।

বলতে বলতেই কিন্তু উত্তেজনায় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল। বুকে অদ্ভুত এক অনুভূতি পাকে পাকে মোচড় দিতে লাগল।

সরিতা বলল, আমাকে যেতে লিখেছে।

ইন্দ্র বলল, খালি বান্ধবীকেই নেমন্তন্ন করেছে, তার প্রেমিকটিকে নয়?

সরিতা বলল, পাছে তার পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে হবু সঙ্গীটির ডুয়েল হয়ে যায় সেই ভয়ে বোধহয় তোমাকে নেমন্তন্ন করতে সাহস করেনি।

ইন্দ্র বলল, কবে যাচ্ছ?

তোমার মত কি?

কি বিষয়ে?

আমার যাবার ব্যাপারে?

ওটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার।

সরিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল, একেবারে নিজস্ব ব্যাপার হলে তোমার মতামত নেবার দরকার হত না। এ ব্যাপারটার সঙ্গে ক্ষীণ হলেও কিছুটা যোগ তোমারও আছে।

ইন্দ্র বলল, দেখে এসো তোমার বান্ধবীর চোখে এখনও কারু জন্যে জলের সঞ্চয় আছে কিনা।

সরিতা বলল, রসিকতা নয় মশাই, বরের হাত ধরে বাসর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েরা পূর্ব প্রণয়ীর জন্যে চোখের জল ফেলে।

ইন্দ্র বলল, সেটা খুব স্বাভাবিক।

আসরে আমার হাত ধরে ভাববে না তো ললিতার হাত ধরে আছি ?

ইন্দ্র ভাবল, সরিতার একস-রে আই আছে নাকি !

বলল, ওটা মেয়েদের রাজ্যের খবর। ভালমানুষ ছেলেদের ওর ভেতর টানা কেন।

সরিতা বলল, আহা, মুখখানা ফোনের ভেতর দিয়ে যে দেখতে পাচ্ছি না। ভাল মানুষ ছেলের মুখ দেখলেও পুণ্যি।

ইন্দ্র অন্য প্রসঙ্গে এল, দিদির খবর কি? বিদেশী লেখকটি চলে যাবার পর ব্যথার আলোড়িত সাগর কি এখন একটু শান্ত ?

সরিতা বলল, প্রেমা এখন রিপোর্টার মিঃ পিল্লাই-এর সেবায় নিবেদিত প্রাণ। রোজ বিকেলে বেরিয়ে যাচ্ছে হসপিটালে।

ইন্দ্র বলল, যে বিষয়ে মন দেবে তার শেষ দেখে ছাড়বে। আশ্চর্য চরিত্র।

আমি এমন একটি বোনের জন্যে গর্বিত ইন্দ্র।

আমিও এমন একটি মেয়ের সহোদরার সান্নিধ্য পাবার জন্যে ধন্য।

সরিতা ধমকে উঠল, বাজে কথা রাখ। সত্যি করে বল দেখি বাপু, বুকের ভেতরটা ললিতার কথা শুনে কতখানি ফাঁকা হয়ে গেল ?

ইন্দ্র বলল, বিশ্বাস কর সরিতা, এই মুহূর্তে তোমার বান্ধবীর সুখী ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে প্রার্থনা করতে প্রাণ চাইছে।

সরিতা বলল, মানুষ আহত হলে অনেক সময় উদারতার আশ্রয় নিয়ে আঘাতটাকে ভোলার চেষ্টা করে।

তুমি দেখছি সর্বজ্ঞ। এ বয়েসে এতখানি অভিজ্ঞতা হলে আশি বছরে না জানি আরব সাগরের মত অতল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে বসবে।

তুমি তো আমার খুব শুভানুধ্যায়ী দেখছি। আশি বছর অব্দি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও।

ইন্দ্র বলল, শতায়ু হতে বলাই উচিত ছিল।

সরিতা বলল, তুমি নিজের জন্যে শতায়ু প্রার্থনা কর। আমার কোন বাসনাই নেই। ফোকলা মুখে পঞ্চাশতম পত্নীর কানে প্রেমের বাণী বলে যেও, দারুণ আনন্দ পাবে। কিন্তু জেনে রেখ, সরিতা মেনন তার যৌবনের দীপ ধীরে ধীরে নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এ সংসার থেকে সরে যাবে।

ঘটনা দুঃখজনক।

কারু কাছে বা পরম শান্তির।

থেমে গেল সরিতা ওধারে। একটু পরে চাপা গলায় বলল, প্রেমা আসছে ওপরে। নর্তকীর পায়ের ধ্বনি সিঁড়িতে বেজে উঠেছে।

ইন্দ্র বলল, ছাড়ছি।

সরিতা বলল, ভীতু, ভীতু কোথাকার।

সেই বিকেলেই বেয়ারা ইন্দ্রের ঘরে খামের একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

ইন্দ্র খামখানা না খুলেই বুঝল ললিতার চিঠি। কারুনাগপল্লীর ছাপ দেওয়া।

সামনে সমুদ্র। শেষবেলায় উতরোল কান্নাটা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। বাতাস ক্লান্ত হয়ে এখন কোথায় যেন উধাও।

খামখানা হাতে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ইন্দ্র। ললিতা যেন চেয়ে আছে তার দিকে। কি বলতে চায় ললিতা! কেন সে হঠাৎ বিয়ের সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল তার কৈফিয়ৎ ?

ইন্দ্রের মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল। কি দরকার ছিল এ চিঠির। নতুন জীবন চায় ললিতা, তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে। প্রত্যেকেরই নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরির অধিকার আছে। ইন্দ্র যখন কোনরকমেই নিজের জীবনকে জড়াতে পারবে না ললিতার সঙ্গে তখন ললিতা তার জীবন নিয়ে নিজের ইচ্ছামত খেলা খেলবে এইটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু বিবেকের বিচারে ললিতার জয় হলেও কোথায় যেন সূক্ষ্ম একটা পরাজয়ের গ্লানি মনটাকে বিষণ্ণ করে তুলল। ললিতাদের কারুনাগপল্লীর বাড়ী থেকে চলে আসার আগের রাতে ছড়ান গোলাপের করুণ কান্না আজও যেন বুকের গভীরে কান পাতলে শুনতে পায় ইন্দ্র। এই তো সেদিন টুরিস্ট বাসে চলে যাবার আগের মুহূর্তে নারকেল বীথির নিভৃত নির্জনে তার ঠোঁটে উত্তপ্ত কেঁপে ওঠা ঠোঁট দুটো মিলিয়েছিল ললিতা। দুটো পিপাসাকাতর বাহু দিয়ে জড়িয়েছিল তার কটিদেশ। কিন্তু সে যেন মুহূর্তের নেমে আসা ঝড়। প্রচণ্ড আক্ষেপে হঠাৎ ভেঙে পড়ে পরক্ষণেই স্থির নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

চিঠিখানা খুলল ইন্দ্র। এতক্ষণ চিঠি হাতে নিয়ে এলোমেলো ভাবনার দোলায় দুলছিল সে। কিন্তু চিঠি খোলার সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক দুটো চোখের তারা আটকে গেল চিঠির অক্ষরগুলোর ওপর।

ইংরাজীতে লেখা। সহজ স্পষ্ট। তর্জমায় দাঁড়াল :

ইন্দ্র,

আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে এমনি একটা খবর শোনার পর থেকে আমি প্রতিটি রাত কি নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় কাটিয়েছি তা আমার মত একটি মেয়ে ছাড়া কেউ বুঝবে না। এ অবস্থায় আমি স্বামীর ধ্যানে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে সকলের কাছ থেকে মৌখিক বাহবা পেতাম ঠিক কিন্তু নিজের এই দেহটাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে নিঃশেষ হয়ে যেতে হত।

আমার ঐ নিভৃত কান্নার একটি রাত্রে তুমি হঠাৎ এসে দাঁড়ালে আমার জানালার ওপারে। আমি তোমার বিছানার ধারে সেদিন গোলাপ রেখে এসেছিলাম। সে শুধু যে ঘর সাজানোর তাগিদে নয় তা বুঝতে তোমার একটুও দেরী হয়নি। একটি যুবতী মেয়ের বাইরের সপ্রতিভ আচরণের আড়ালে তার প্রচ্ছন্ন মনের দীর্ঘশ্বাস তুমি শুনতে পেয়েছিলে। তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে জানালার ওপারে আমার মুখোমুখি। একটি রক্ত মাংসে গড়া যুবকের কাছে যা একেবারে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বিশ্বাস কর ইন্দ্র, সেদিন ঐ জানালার বাধাটা কোন বাধা ছিল না। ওটাকে অতিক্রম করতে পারিনি শুধু সরিতার কথা ভেবে। সরিতাকে স্পষ্ট দেখেছিলাম সেদিন আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে।

তোমার সঙ্গে শেষ দেখা আমার প্যালেস হোটেলের খানিক দূরে। সেদিন তোমার হোটেল থেকে ফেরার সময় বুঝেছিলাম, ললিতা নামের মেয়েটি তোমার মনের ভেতর তখনও বেঁচে আছে। তারপর বিদায়ের সময় এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম একটি মুখ। সে মুখ বান্ধবী সরিতার। তাই প্রথম রাতের এমন অবিশ্বাস্য সংযমের পর দ্বিতীয় সাক্ষাতে তোমার বুকের ভেতর নিজেকে সঁপে দিতে একটুও দ্বিধা জাগে নি মনে।

কিন্তু ফেরার সময় টুরিস্ট বাসে বসেই আমি সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলি। বুভুক্ষু দেহকে মিথ্যা শাসনে বেঁধে অভুক্ত রাখা পাপ। তবে আর যেখানে যাই না কেন তোমার কাছে যে ফেরা আমার চলবে না তা প্রথমেই স্থির করে নিয়েছিলাম। ইন্দ্র, তোমাকে আজও ভালবাসি একথাটা এই মুহূর্তে তোমার কাছে যত হাস্যকরই মনে হোক, আমার কাছে কিন্তু দূর নক্ষত্রের মত সত্য। আমার নতুন জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তুমি স্মৃতি হয়ে যাবে। কিন্তু আকাশের তারকাপুঞ্জের মত তুমি অধরা থেকেও সকরুণ একটা স্মৃতির কোমল ছোঁয়ায় কাঁদাবে আমার সারা দেহমন।

আজ এই মুহূর্তে অনেক কিছু লিখে তোমাকে অসহিষ্ণু করে তুলতে চাই

না। শুধু তোমাকে আমার নতুন জীবন প্রসঙ্গে একটি কথা জানাই। ভদ্রলোক অতি সাদামাঠা। চলতি হাওয়ার পন্থী আদপেই নয়। পুরোনো ভাবনা পুরোনো বিশ্বাস আজও ধরে আছে। কাজকর্ম করে সাধারণ। তুল্লির সঙ্গে ছেলেমানুষের মত খেলাধুলো করে। তুল্লি ওকে নিয়ে দারুণ রকম মেতে থাকে। আমার দিক থেকে তুল্লিকে নিয়ে অনেক বড় একটা সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে বলে প্রতি মুহূর্তে ধারণা জন্মাচ্ছে।

সরিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু দয়া করে ওর পীড়াপীড়িতেও তুমি ওর সঙ্গী হয়ো না এ যাত্রায়। তোমাকে চোখের সামনে দেখলে অতীত আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলবে।

তোমার বন্ধু ললিতা।

চিঠি পড়া শেষ করে ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল। আর একবার পড়তে গিয়েও পড়ল না। ললিতা সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের শেষ হোক হয়ত এমনি একটা কিছু মনে হল ইন্দ্রের। সে ধীরে ধীরে ঘরে পায়চারি করতে করতে এসে দাঁড়াল জানালার ধারে। তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। শেষ আলো সমুদ্রের জলে খেলা করতে করতে সরে যাচ্ছে। ঢেউগুলো যেন সেই আলোর তপ্ত ছোঁয়াটুকু ভুলতে পারছে না। তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে বার বার ধরার চেষ্টা করছে।

কতক্ষণ চেয়ে থাকল ইন্দ্র অন্যমনে। কারা যেন অনেক দূর থেকে কোভালম বীচের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দৃষ্টির বৃত্তে একসময় এল ওরা। ইন্দ্র দেখল উত্তর চল্লিশের একটি দম্পতি। হাত ধরাধরি করে হেঁটে আসছেন। ভদ্রলোকের দেহচালনায় বেশ কর্মপটুতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। মহিলাটি কিন্তু দার্শনিক গোছের। আকাশ আর সমুদ্রের দিকে প্রায় ক্ষণই চোখ রেখে চলাছলেন। হাতে কিন্তু ধরা ছিল হাত।

ওঁরা হয়ত সংসারের ঝামেলায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম জীবনের ভালবাসার অলঙ্কারে ধীরে ধীরে মালিন্য জমতে জমতে সোনার আসল রংটুকু কখন বিবর্ণ হয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ সংসারের বহু পরিচিত, বহু ব্যবহৃত জীবনের কাছ থেকে ওরা কয়েকটি দিনের জন্যে এখানে পালিয়ে এসেছেন। এই অপরিচিত পরিবেশের ভেতরে থেকে পরস্পরকে যেন নতুন করে চিনছেন, বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করছেন পরস্পরকে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো যেন নতুন করে জন্ম নিচ্ছে ওঁদের মনের ভেতর।

ইন্দ্র হঠাৎ সূর্যাস্তের মুহূর্তটিতে উদার হয়ে উঠল। ললিতা সুখী হোক।

স্বামীর হৃদয়ের বঞ্চনামুক্ত নির্মল ভালবাসা লাভ করুক সে। সংসারের মূল্যবান মুহূর্তগুলো যেন সে স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করে।

ভাবতে যাচ্ছিল, ললিতা আর যেন তার স্মৃতির যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত না হয়। কিন্তু বুকের কাছে কি এক অস্ফুট যন্ত্রণার ঢেউ উঠে সে ভাবনাটাকে ঘিরে ফেলল। সন্ধ্যার প্রসারিত আকাশে তা আর মুক্তি পেল না।

বাঁচার কি দুর্বার ইচ্ছা মানুষের মনে। আর একটি হৃদয় থেকে কোনদিন যেন হারিয়ে না যাই। পরিপূর্ণ সুখী জীবনের মাঝখানে একটুখানি শূন্যতা থাক। সেখান থেকে উঠে আসুক অতীত জীবনের জন্যে সামান্য একটুখানি দীর্ঘশ্বাস।

ইন্দ্র দেখল হৃৎপিণ্ডের মত রক্তাক্ত সূর্যটা আরব সাগরের বুকে উচ্ছ্বাস তুলে ডুবে গেল।

কুমারবাহাদুর নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। পেছনের সিটে বসে দোলন আর প্রেমা। দোলন তার সুন্দর আঙুলগুলো প্রেমার পাঁচটি আঙুলের ভেতর চালিয়ে দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে। সে যেন আঙুল দিয়ে অনুভব করছে সত্যি প্রেমা এসেছে কিনা। মাঝে মাঝে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। মুখে ভোরের নরম আলোর মত একটা তৃপ্তি খেলা করছে।

গাড়ীটা বাঁক নিতেই কিশোরী দোলন কলকলিয়ে উঠল, ঐ যে স্টেশান ওয়াগনে তোমার বন্ধুরা আসছেন আন্টি।

নীচের পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠে আসছিল স্টেশান ওয়াগনখানা। গায়িকা আর বাদকের দল ছিল ওর ভেতর। প্রেমা দোলনের বুক ছুঁয়ে মুখখানা বাড়িয়ে দেখতে লাগল নীচের গাড়ীর লোকজনদের। যদিও কুমারবাহাদুর বেশ সন্তর্পণেই চালাচ্ছিলেন গাড়ীখানা তবু পাহাড়ী পথে বাঁকের মুখে টাল খাচ্ছিল প্রেমার তন্বী দেহটা। দোলনের গায়ে চাপ পড়লেই প্রেমাকে ধরে খিল খিল করে হেসে উঠছিল সে।

বেশ খানিক পাহাড়ের ওপর উঠে এসে একটা পাইন গাছের ধারে কুমার জয়কিষণ ব্রেক করলেন।

দোলন গাড়ী থেকে নামতে নামতে বলল, এসো আন্টি, তোমাকে আমাদের লালসিয়া স্টেটের এলাকাটা দেখাই।

প্রেমা গাড়ী থেকে নামতেই দূর হিমালয়ের একটা ঠাণ্ডা হাওয়া তার গায়ে এসে লাগল। অনেক পথযাত্রার পর শরীরে ঐ হাওয়াটুকুর ছোঁয়ায় একটা শিহরণ জাগল।

দোলন আশ্চর্য সুন্দর একটি মডেলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতখানা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে লালসিয়ার দিক নির্দেশ করল।

প্রেমা তার পাশে এসে দাঁড়াল। কুমার জয়কিষণ গাড়ীর গায়ে ঈষৎ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। পৌরুষ আর প্রশান্তির ছবি সারা অবয়বে। মধ্য যৌবনের দীপ্তি চোখের তারায় মুখের রেখায়।

সামনে একটি পাহাড় দাঁড়িয়ে। তার পাশ দিয়ে চোখ গিয়ে পড়ে নীচের একটি উপত্যকায়। ভ্যালিটি এক দৃষ্টিতে অবাক করে দেবার মত। খুব ছোট আকার। প্রায় চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। একদিকে শুধু দুটি পাহাড়ের মাঝে নিষ্ক্রমণ পথ। ভ্যালির মাঝখান দিয়ে একটি জলধারা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। শেষবেলার রোদ্দুরের ঝিলিক তার নাচের অঙ্গে। চারদিকে সবুজ সবুজ সবুজ। জলধারার দুই তীরে ক্ষেতি। ভ্যালির পশ্চিমে একটি পাহাড়ের দেহ জুড়ে থাঁজে থাঁজে বাড়ী-ঘর নেমে এসেছে। সবুজ আর লালের সমারোহ পাহাড়ী কুঠিগুলোর রঙে। পাহাড়ের ঠিক নীচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মনে হচ্ছে পাইনের অরণ্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে মডার্ণ আরকিটেকচারের চিহ্ন বাড়ী-ঘরে।

দোলন বলল, ঐ আমাদের নাচমহল আণ্টি।

দোলনের আঙুল অনুসরণ করে একটি গোলাকার সাদা ঘরে প্রেমার চোখ আটকে গেল। ঘরের সামনে প্রসারিত পথ। দুদিকে এভিনিউ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে গাছের সারি। সমস্ত ঘরখানার আকৃতি বৌদ্ধ স্তূপের মত। স্তূপের চূড়ায় কোন একটি ধাতব বস্তুতে শেষ সূর্যের সোনা প্রতিফলিত হচ্ছিল। সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল না। তাই একটা আকর্ষণীয় রহস্য রোমাঞ্চের পটভূমি তৈরী হচ্ছিল।

প্রেমা বলল, দারুণ এনচেনটিং।

কুমার জয়কিষণ বললেন, এখান থেকে লালসিয়া স্টেট অনেক কাছে বলে মনে হলেও সোজাসুজি নেমে যাবার কোন রাস্তা নেই। দুটি পাহাড় বেষ্টন করে তবে ওখানে পৌঁছতে পারা যাবে। তাই এখন আমাদের থামলে চলবে না। লালসিয়া পৌঁছবার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে উঠবে।

সবাই গাড়ীতে উঠে বসল। জয়কিষণ স্টার্ট দিলেন। পেছনের গাড়ীটাও আর দূরে নেই। বাঁকের মুখে হর্ণ শোনা যাচ্ছিল।

দূর থেকে আলোগুলো ঝাঁক ঝাঁক তারাবাতির মত দেখাচ্ছে। দোলনের কাছ থেকে প্রেমা জেনেছে ওরা এখন লালসিয়া স্টেটের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

আগে লালসিয়ার বাজারহাট অফিস কাছারী সবই স্টেটের পরিচালনায় চলত, কিন্তু সরকার সবকিছু গ্রহণ করার পর থেকে কুমারবাহাদুর নিজের পৈতৃক প্রাসাদ আর তার সংলগ্ন কয়েক একর জমির ভেতরই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। উত্তর ভারতের কয়েকটি শহরে প্রাইভেট শিল্প সংস্থায় খাটছে তাঁর অর্থ। আগের ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি নেই কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠারও শেষ হয়েছে।

সেই সঙ্গে। এখন বিপত্নীক সদালাপী কুমারবাহাদুরকে সকলেই প্রীতি আর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। লালসিয়া স্টেটের যে কোন সাংস্কৃতিক সংস্থার এখনও তিনি সম্মানীয় সভাপতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম কর্ণধার। খেলাধূলার ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা তরুণ ক্রীড়াবিদ্‌দের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার।

গাড়ী ঢুকল রাজবাড়ীর ভেতর। সামনে ফোয়ারা থেকে জল অন্ধকার আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করছে। ফোয়ারার পাশ কাটিয়ে গাড়ী সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। সাদা উর্দি পরা আরদালী এসে সেলাম ঠুকে গাড়ীর দরজা খুলে দিল।

দোলন হাত ধরে প্রায় টেনে নামাল প্রেমাকে।

ডানদিকে সিঁড়ির দুধারে শ্বেত পাথরের কাজ করা স্তম্ভ। প্রেমার মনে হল আঙুরলতা আর বুলবুল পাখির কাজ সারা স্তম্ভ জুড়ে।

কুমার জয়কিষণ প্রেমার দিকে মাথাটা ঝুঁকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে সিঁড়িতে ওঠার অনুরোধ জানালেন।

প্রেমা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। সঙ্গে দোলন আর কুমারবাহাদুর। ঝাড়লণ্ঠন ঝোলান দীর্ঘ বারান্দা জুড়ে।

প্রেমা দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে পা রেখে বলল, পেছনের গাড়ীর ওঁরা সব এখনও কি এসে পৌঁছননি ?

গাড়ী পৌঁছনর আওয়াজ পেয়েছি, বললেন কুমারবাহাদুর।

প্রেমা ওঁদের সঙ্গে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলল, ওরা এখুনি তাহলে এসে পড়বে এখানে।

জয়কিষণ বললেন, ওঁরা আমার গেস্ট। তাই গেস্ট রুমেই ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। আর আপনি দোলনের গেস্ট। তাই দোলনের খাস কামরাতেই আপনার থাকার ব্যবস্থা।

পাছে প্রেমার এই ব্যবস্থা মনঃপূত না হয় তাই আগেভাগেই দোলন প্রেমার হাতখানা চেপে ধরে উঠতে লাগল।

প্রেমা দোলনের ব্যাপার-স্যাপার দেখে হেসে বলল, দেখা যাক দোলন কার গেস্ট হলে লাভ বেশী, বাবার না তোমার।

দোলন বলল, আমি তোমাকে আমার কাছেই রাখব আন্টি, বাবাকে দেব না।

কানটা গরম হয়ে উঠল প্রেমার। কিশোরী দোলন বুঝতে পারেনি কথাটার অন্য একটা অর্থও হতে পারে।

জয়কিষণ মুহূর্তে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলেন। ততক্ষণে ওরা দোতলার বারান্দা পার হচ্ছে।

কুমারবাহাদুর বললেন, বাঁদিকের এই লম্বা হলঘরখানা লালসিয়া স্টেটের চিত্র সংগ্রহশালা। আজ সবাই ক্লান্ত রয়েছেন। বিশ্রামের পর কাল আপনাকে এর ভেতর নিয়ে আসব।

প্রেমার গলায় ঔৎসুক্য, আমি ছবি দেখতে দারুণ ভালবাসি কুমার-সাহেব।

জয়কিষণ থেমে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে আপনি নাম ধরে ডাকলে খুশী হব। আর যদি একান্ত না পারেন তাহলে সারনেম ধরে ডাকবেন। কিন্তু কুমারসাহেব বলে ডাকলে ব্যাপারটা খুব পোশাকী হয়ে দাঁড়াবে।

একটু থেমে আবার কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, অবশ্য বারণ আমার কোন কিছুতেই নেই। আপনার ইচ্ছাকেই আমি খুশী মনে মেনে নেব।

প্রেমা হেসে বলল, আপনার রাজ্যে এসেছি, আপনাকে খুশী করার চেষ্টা অবশ্যই আমাকে করতে হবে।

জয়কিষণ বললেন, পুরোনো দিন হলে রাজাকে সবাই খুশী করতে চাইত, কিন্তু এখন দিন বদল হয়ে গেছে। এখন রাজাও নেই তার রাজ্যপাটও নেই। সুতরাং রাজ্যহীন রাজাকে খুশী করার প্রশ্নও নেই।

প্রেমারা বিশাল বারান্দা আর করিডোর পেরিয়ে এসে পৌঁছল একটা ড্রিম ল্যাণ্ডে।

জয়কিষণ বললেন, এটাকে দোলন মহল বলতে পারেন। এখান থেকে দোলনের ওপর রইল আপনার ভার! মেডরা রয়েছে এ মহলে আপনার প্রয়োজন মেটাতে। সবার ওপরে দোলন রইল আপনার সেবার জন্যে।

প্রেমা বলল, একথা কেন বলছেন। দোলন আমার ছোট্ট বন্ধু, কিশোরী সঙ্গিনী।

জয়কিষণ বললেন, আপনি লালসিয়ার পরম সম্মানীয় অতিথি, আপনাকে সেবা করার সুযোগ পেলে সে নিজেও সম্মানিত হবে।

প্রেমা হেসে বলল, এ মহল যখন দোলনের তখন ব্যাপারটা দোলনের ওপরেই ছেড়ে দিন। আমরা নিজেদের ভেতর বোঝাপড়া করে নেব।

জয়কিষণ হেসে মাথা নাড়লেন। পায়ে পায়ে ফিরে চললেন যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেদিকে। যাবার সময় বলে গেলেন, এখন আমার অতিথিদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রেমা কুমারবাহাদুরের চলে যাবার ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করল। ঋজু পুরুষোচিত দেহ। চলায় ছন্দেও রাজকীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

জয়কিষণ চলে গেলে দোলনের দিকে ফিরে তাকাল প্রেমা। আশ্চর্য. এরই ভেতর দুটি বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে ওরই দুটো ভি আই পি স্যুটকেশ। কখন কোন গুপ্তপথে তারা তার প্রয়োজনের জিনিসগুলো নিয়ে এসে গেছে।

ওদের সঙ্গে প্রেমা একটা ঘরে ঢুকল। পুতুলের ঘর। সারা ঘরে কাচের শো-কেশে হাজার রকমের পুতুল। এ যেন ডলস্ মিউজিয়াম। বিভিন্ন দেশের পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন শো-কেসের ওপরে দেশের নাম লেখা। এক একটা সুদৃশ্য ওয়াল ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে ঐ নামগুলির ওপর। প্রতিটি ল্যাম্পেরই ভিন্ন ভিন্ন শেড। গোলাপী হলদ সাদা নীল সবুজ ইত্যাদি। ওপরের বাল্বের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে শো-কেসের ভেতরের আলো জ্বলছে। বাল্বগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন শো-কেসের ভেতর।

কোথাও বসে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে একটা কনসার্ট পার্টি। আশ্চর্য, বিটোফেনের একটা সুর বাজছে। তার পাশের শো-কেসে নাচছে কাজাকী মেয়েরা মাথায় স্কার্ফ বেঁধে। কালারফুল ড্রেসে ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাদের।

রানী এলিজাবেথের করোনেশান হচ্ছে। দীর্ঘ শুভ্র করোনেশান ড্রেস পরে রানী এগিয়ে চলেছেন। তাঁর ভূ-লুণ্ঠিত পোষাক তুলে ধরে চলেছে পাঁচটি সুবেশা তরুণী।

এমনি বিচিত্র সব বিষয় আর বিচিত্র সব পুতুল।

দোলন বলল, আন্টি এখন তোমার বিশ্রামের সময়। তুমি আমাদের সঙ্গে ভেতরে চল। কাল পুতুলগুলো তোমাকে দেখাব।

প্রেমা বলল, চমৎকার তোমার পুতুলের ঘর। চল যাই কোথায় নিয়ে যাবে।

দ্রুত পায়ে ওরা পুতুল আর অ্যাকোয়েরিয়মের ঘর পেরিয়ে ঢুকল গিয়ে দোলনের ড্রইংরুমে।

ড্রইংরুমটি দোলনের একেবারে শৈশব থেকে বর্তমান বয়স অব্দি নানাধরণের ছবি দিয়ে সাজান। অধিকাংশই রঙীন ছবি। বয়সের তুলনায় দোলনকে বেশ খানিকটা বড়সড় দেখায়। মুখে কিন্তু সবসময়েই লেগে থাকে ভারী সুন্দর একটা হাসি। ছবিগুলোর ভেতরেও সেই সুন্দর হাসির ছোঁয়া।

একটুখানি বিশ্রামের পর দোলন প্রেমাকে নিয়ে গেল স্নানের ঘরে। শ্বেত-পাথরের প্রশস্ত বাথরুম। আধুনিক সব সরঞ্জামে সাজান।

দোলন বলল, তোমার স্যুটকেশ বাথরুমের লাগাও ড্রেসিংরুমে রয়েছে।

প্রেমা হেসে স্নানের ঘরে ঢুকল। কেরালার মেয়ে। স্নানের ওপর তাই বিশেষ এক ধরনের অনুরাগ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল একেবারে ড্রেসিংরুমে বেশবাস পরিবর্তন করে প্রসাধন সেরে।

সংলগ্ন রিফ্রেসমেণ্ট রুমে দোলন নিয়ে গেল প্রেমাকে। ফল মিষ্টি লস্যি ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপর।

দোলন বলল, তোমার কফি চা সবই তৈরী আন্টি। তবে অনেক দূর থেকে এসেছ তাই ঠাণ্ডা লস্যি হয়ত ভাল লাগবে, তাই দিয়েছি। পরে আমরা যখন বেডরুমে বসে গল্প করব তখন তুমি কফি অথবা চা যা খুশি খেতে পার।

সেই স্থির মূর্তির মত দুটি তরুণী অ্যাটেনডেণ্ট পাশে দাঁড়িয়ে। অতিথির সামান্য আদেশ পালনের অপেক্ষায়।

প্রেমা লস্যির গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে স্ট্র ঠোঁটে লাগিয়ে খেতে লাগল। হাল্কা গোলাপী আভার পানীয়। গোলাপগন্ধী। বেশ লাগল খেতে।

পাশে বসে দোলনও খেতে খেতে দেখছিল। বড় বড় চোখভরা ঔৎসুক্য। আন্টির কেমন লাগছে পানীয় তাই জানার জন্যে চোখে আগ্রহের বাতি জ্বেলে বসে আছে।

পানীয় শেষ করে প্রেমা বলল, খুব রেলিস করে খেলাম। কফি খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। এখন দেখছি তোমার কথা শুনে অনেক বেশী আরাম পেলাম।

দোলন বলল, এসব বাবার ব্যবস্থা আন্টি। তিনি সরকারমশায়কে ডেকে নিজের হাতে গেস্টদের জন্যে মেনু তৈরী করে দিয়েছেন।

সান্ধ্য জলযোগ শেষ হলে প্রেমা বলল, দোলন তোমার বাবার গেস্ট রুমে আমাকে যে একটু নিয়ে যেতে হবে। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করব।

দোলন বলল, চল আন্টি এক্ষুনি তোমাকে নিয়ে যাই। আমরা আর সামনের গেট দিয়ে বেরুবো না। আমাদের এ মহলের দরজা খুলে নীচে নেমে যাব। একটা বাগান পেরিয়ে গেলেই গেস্ট হাউস।

সুন্দর সাজান গেস্ট হাউস। প্রেমাকে দেখে ওরা হৈ-চৈ করে উঠল। বিশুদ্ধ মালয়ালাম ভাষায় জানাল, বহাল তবিয়তে আছে ওরা। খাওয়াদাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। ইতিমধ্যেই দক্ষিণী জলযোগে আপ্যায়িত করে গেছে।

প্রেমা সবিস্ময়ে বলল, দক্ষিণী খাবার এখানে কোথেকে এল ?

একজন বলল, মেঠাই-এর সঙ্গে ইউলি দিয়েছিল।

অন্যজন বলল, রাতের খাবার দক্ষিণী হবে কিনা জেনে গেছে। মনে হয় দক্ষিণী কুকের ব্যবস্থা করেছেন কুমার বাহাদুর।

প্রেমা এবার হেসে বলল, সারা পথ যে ভাবনা করছিলেন উত্তরের খাবার সম্বন্ধে তা এখন আর রইল না মনে হয়।

সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। একজন ওরই ভেতর থেকে বলল, মনে হচ্ছে অভিযান সফল হবে।

প্রেমা ঘুরে ঘুরে সঙ্গীদের ব্যবস্থাপত্র দেখল। নিখুঁত সব ব্যবস্থা। কলিং বেল শোনার জন্যে তিনটি অ্যাটেনডেণ্ট কান পেতে আছে। সামনেই বাগান। গোলাপবাগ। গেস্ট হাউসের পেছনের বাগান ফলের গাছ দিয়ে সাজান। মাঝে চলে গেছে মোরাম বিছান পথ।

প্রেমা ব্যবস্থাদি দেখে দোলনের সঙ্গে আবার ফিরে এল দোলন মহলে।

রাতের খাবার পর দোলন প্রেমাকে নিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে। সারা ঘর হালকা সবুজ আলোয় ভেসে যাচ্ছে। চোখে একটা মিষ্টি আমেজ।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক হতে হল প্রেমাকে বেডরুমের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। তিনটি দেওয়ালে তিন মাতৃমূর্তি। প্রমাণসাইজ মূর্তি। প্লাস্টারে তৈরী। একদিকে ম্যাডোনা শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। কান্তিময়ী মাতৃমমতায় মাখা মুখখানা। দ্বিতীয় দেয়ালে বালকৃষ্ণ নৃত্যরত। কটিতে ঘুঙুর পায়ে নূপুর। মা যশোদা একটু দূরে বসে করতালি দিয়ে নাচাচ্ছেন তাঁর সাধের গোপালকে। তৃতীয় দেয়ালে উমা মেনকার চিত্র। মা মেনক, বুকে জড়িয়ে আদর করছেন কিশোরী উমাকে। উমা বধূবেশে সজ্জিতা।

ঘরের ভেতর আশ্চর্য এক পবিত্রতার স্পর্শ।

দোলন বলল, তুমি এ ঘরে শোবে শান্তি। এটা আমার মায়ের বেডরুম ছিল।

আর তুমি ?

ঐ যে ভেজান দরজা দেখছ ঐ ঘরটা আমার। এ ঘর ও ঘরের দরজা খোলা থাকে রাতে। তোমার কোন দরকার হলে ডেকো আমাকে।

প্রেমা বলল, রাতে তোমার ঘুম ভাঙাবো এমন দরকার হবে না আমার।

দোলন বলল, তোমার বিছানার সঙ্গে লাগাও কলিংবেলের সুইচ আছে। টিপলেই মেডদের কেউ না কেউ সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে।

প্রেমা হেসে বলল, কোন ভাবনা নেই তোমার। রাতে কাউকে জাগিয়ে তোলা আমার স্বভাব নয়। ঘুমের ভেতরেই কেটে যাবে রাত। চল তোমার শোবার ঘরটা বরং দেখে আসি।

দোলনের বেডরুমে ঢুকে প্রেমা দেখল ঘরখানা ছোট কিন্তু নিখুঁত করে সাজান। একটা বড় জানালা প্রায় পুরো একখানা দেয়াল জুড়ে রয়েছে। ঐ খোলা জানালার ভেতর দিয়ে শুক্লা নবমীর চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। একটুখানি বাঁদিকের কোণ ঘেঁষে তাকালে আর একটা ছবি দেখা যায়। মুসৌরীর পথে কোন পাহাড়ী টাউন অথবা খোদ মুসৌরীর আলো। হলুদ নীল লাল কতকগুলো রঙবাহারী পতঙ্গ যেন ঝিকমিক করছে।

প্রেমা বলল, তোমার ঘরখানা ভারী সুন্দর দোলন।

দোলন বলল, এ ঘরে ছাড়া আমার ঘুমই হয় না। আঙ্কেল সারা রাত বেহালা বাজান। আমার ঘুম ভাঙলেই আমি আঙ্কেলের বেহালা শুনতে পাই।

প্রেমা কৌতূহলী হয়ে উঠল। একটি মানুষ সারা রাত বেহালা বাজায়, একি সম্ভব।

প্রেমা দোলনের বিছানার পাশে সোফায় বসে বলল, সারারাত ধরে বেহালা বাজান তোমার আঙ্কেল?

দোলন মাথা নেড়ে বলল, আমার মা মারা যাবার পর থেকে আঙ্কেল এমনি করে সারা রাত জেগে বেহালা বাজান। মাকে খুব ভালবাসতেন আঙ্কেল।

প্রেমার কৌতূহল বেড়ে গেল। দোলনের দিকে ঝুঁকে বসে বলল, আঙ্কেল কি তোমার বাবার আপন ভাই?

দোলন হেসে উঠে বলল, না না, মায়ের কোন কোন নাচের সঙ্গে বেহালা বাজাতেন। উনি আমার মামাদের দেশের মানুষ। মা ওঁকে দাদা বলে ডাকতেন। ভারী ভাল মানুষ আমাদের আঙ্কেল।

উনি আর সেই থেকে দেশে ফেরেননি বুঝি?

দেশে যেতে চান না। তাই এখানে ঐ বাগানের একধারে বাবা ওঁর থাকার জন্যে একখানা আলাদা ঘর তৈরী করে দিয়েছে। ঐ ঘরে বসেই উনি সারারাত বেহালা বাজান।

প্রেমা বলল, ঘুমোন কখন?

কেন, দিনের বেলায়।

প্রেমা মানুষটি সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করল না।

রাজবাড়ীর কোন একটা ঘড়িতে মিষ্টি ধাতব আওয়াজ তুলে এগারোটা বাজতেই দোলন বলল, এবার তোমাকে শুতে যেতে হবে আন্টি। বাবা যদি জানতে পারে এতখানি রাতে তোমাকে জাগিয়ে রেখেছি তাহলে খুব রাগ করবে।

তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, আমি এক্ষুনি শুতে যাচ্ছি।

হেসে প্রেমা উঠে দাঁড়াল। পরস্পর শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার বিছানায় ঢুকে পড়ল।

রাজবাড়ীর একটি দামী কম্বল গায়ে টেনে নিয়ে পাশ হয়ে শুল প্রেমা। মৃদু ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল। রাতে সামান্য আলোও চোখে সয়না প্রেমার।

বিছানায় শুয়ে কিন্তু ঘুম এল না। কান সজাগ রেখে বেহালার আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল কিন্তু কোন শব্দ কানে এসে পৌঁছল না।

কখন ঘুমিয়ে পড়ল প্রেমা। বারোটা বাজল ঘড়িতে, টের পেল না সে। ঠিক বারোটার পর নিস্তব্ধ চরাচরের বুক চিরে যেন বেরিয়ে আসতে লাগল ভারি করুণ একটা সুরের ধারা। টের পেল না প্রেমা।

কিন্তু নতুন জায়গার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক হঠাৎ শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল তার। জানালার বাইরে আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুকতারাটি, হাওয়ায় শীতের আমেজ। বেহালার ছড়ের টানে একটা চাপা কান্না গুমরে গুমরে উঠছে।

বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে সে সুর শুনতে লাগল প্রেমা।

এমন সুর আছে যাকে উত্তর অথবা দক্ষিণের শাসনে বেঁধে রাখা যায় না। চারদিকের বাধাবন্ধ উপচে সে ভেসে যেতে থাকে। সব দেশের মানুষের বুকের মাটিকে সে ভিজিয়ে ডুবিয়ে দিতে পারে।

বেহালার আশ্চর্য সুরের ঢেউ প্রেমার বুকে এসে বাজতে লাগল।

কে এই মানুষটি! নিশ্চয়ই সংসারী নন। তাহলে নিজের দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে এখানে বছরের পর বছর পড়ে থাকতে পারতেন না। দোলনের মায়ের সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক ছিল এই মানুষটির। শুধু কি তাঁর নাচের আবহ রচনার কাজটুকু করতেন এই শিল্পী? তার চেয়ে বেশী কিছু নয়? যা শোনা যায় না অথবা দেখা যায় না তেমনি কোন সূক্ষ্ম সম্বন্ধের সূত্রে কি বাঁধা থাকতে পারে না দুটি মন?

অন্তত দোলনের কথা থেকে তেমনি একটা ধারণা করা কষ্টকল্পিত নয়।

দোলনই তো বলেছে, তার মায়ের মারা যাবার পর থেকেই বেহালাবাদকের রাত জেগে এমনি সুরসাধনা।

ভোরের নীলাভ একটা আলো অন্ধকার সরিয়ে ফুটে উঠছে। প্রেমা বিছানায় উঠে বসে ফিকে গোলাপী রংঙের উইণ্ডো স্ক্রীন একটুখানি ফাঁক করে দেখতে লাগল।

পাহাড়ী দেশের আবহাওয়াতে ভোরের কুয়াশা। হাল্কা নীলাভ একটা ধোঁয়া যেন ছড়িয়ে আছে ভ্যালির ওপর। খানিক দূরে নদীটা পারদের প্রবাহ বলে মনে হচ্ছে। এখনও ভোর হয়নি তবে কিসের যেন রহস্যময় একটা আয়োজনে মেতেছে চরাচর।

ধীরে ধীরে শালবনের আড়ালে সূর্যোদয় হল। ভ্যালিতে জমে থাকা কুয়াশার গায়ের রঙ পাল্টাতে লাগল। পিঙ্কের ছোঁয়া। অলস চোখে সেদিকে চেয়েছিল প্রেমা। পায়ের সাড়ায় ফিরে চাইল। দোলন ঘুমভাঙা চোখদুটো মেলে তার দিকে চেয়ে আছে।

প্রেমা বলল, ভারী সুন্দর ঘুম হয়েছে আমার। তারপর শেষ রাতে তোমার আঙ্কেলের বেহালাও শুনেছি।

কেমন লাগল তোমার আন্টি?

প্রেমা হেসে বলল, দোলনের মতই মিষ্টি।

দোলন মিষ্টি হেসে একরাশ ফুল ঝরাল।

প্রেমার চোখ পড়ল এবার নীচের বাগানে। আপেলের গাছে ডাল ভরে সাদা আর গোলাপী ফুল এসেছে। ডানদিকে গোলাপের বাগান। অজস্র গোলাপ। বাগানের মাঝে মরশুমি ফুলের বেড। গত রাতে ঐ বাগানের মোরাম বিছানো পথে সে গিয়েছিল। তখন চোখে পড়েনি বাগানের এ ধরনের প্রসাধন। আজ ভোরের আলোয় দারুণ রূপসী মনে হল বাগানটাকে।

কে ঐ ঢুকে এল বাগানে। দূর থেকে গলাবন্ধ গুরুপাঞ্জাবী আর চুড়িদার পরে এগিয়ে আসছে। ভোরের নরম সোনালী আলোটুকু তুলি দিয়ে কে যেন মাখিয়ে দিয়েছে ওর গায়ে।

একটু এগিয়ে আসতেই প্রেমা চিনতে পারল। কুমার জয়কিষণ। হাতে পেতলের ঝকঝকে একটা সাজি। জয়কিষণ বাগানের গাছ থেকে ফুল তুলতে লাগলেন। প্রেমা অবাক চোখে সেদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কুমারবাহাদুর নিজেই ফুল তুলছেন। যে কোন কর্মচারীকে দিয়ে ফুল তোলাতে পারতেন।

প্রেমা দোলনের দিকে ফিরে বলল, তোমার বাবা রোজ এমনি ফুল তোলেন ?

দোলন বলল, রোজ। বাবা যে মহাদেবের মন্দিরে রোজ ভোর বেলা পূজোয় বসেন।

প্রেমা বলল, তোমাদের রাজবাড়ীর দেবতা কি মহাদেব ?

হাঁ আন্টি। মহাদেব আর পার্বতীর শ্বেতপাথরের মূর্তি আছে আমাদের মন্দিরে। জয়পুর থেকে আমার বাবার দাদু আনিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রেমা বলল, আমি তোমাদের মন্দিরে ঐ মূর্তি দেখব।

দোলন বলল, দূর দূর গ্রাম থেকে কত পাহাড়ী লোকজন পূজো দিতে আসে। খুব সুন্দর দেখতে হর-পার্বতীর ঐ মূর্তি। তুমি ব্রেকফাস্ট করে নাও, আমি তোমাকে নিয়ে যাব মন্দিরে।

প্রেমা বলল, দশ পনের মিনিটের ভেতর আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। তুমিও তৈরী হয়ে নাও। ব্রেকফাস্টের আগেই আমি মন্দিরে ঘুরে আসব।

ঠিক আছে, বলে দোলন নিজের শোবার ঘরে ঢুকল।

প্রেমা রাতের পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরল। সোনালী জরি আর সাদা পরিচ্ছদে ওকে অসাধারণ মানিয়েছিল। নিটোল ফুটে ওঠা একটি ম্যাগনোলিয়ার মত। ও দোলনের হাত ধরে দোলাতে দোলাতে হরপার্বতীর মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল।

শ্বেতপাথরে বাঁধান চত্বর। মাঝারি আকারের প্রস্তরনির্মিত মন্দিরটির মাথায় জেগে আছে একটি ত্রিশূল। প্রেমা আর দোলন মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। মন্দিরের দরজা খোলা। ওরা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

অর্ধ আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে বসে হরপাবতী সামনের দিকে চেয়ে আছেন। জয়কিষণ পূজোয় বসেছেন। এখন তাঁর পরণে গেরুয়া বাস। উর্ধ্ব অঙ্গে একখানি উত্তরীয়। ফুল নিয়ে চন্দনে ডুবিয়ে স্তব্ধ হয়ে কিছু সময় বসে থেকে সেই ফুল ইষ্টদেবতার পায়ে সাজিয়ে দিচ্ছেন।

ফুল দেওয়া শেষ হলে করজোড়ে কতক্ষণ বসে রইলেন।

জয়কিষণের এই তদ্গত ভঙ্গীটি বড় ভাল লাগল প্রেমার। সে দোলনের হাত ধরে নতজানু হয়ে বসে মন্দিরের ভেতরে চেয়ে রইল। আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি। শ্বেতপাথরের মূর্তির চোখ মুখ শিল্পী হাল্কা রঙে এঁকে দিয়েছেন। যেমন সৌম্যশান্ত তেমনি আনন্দময় মুখমণ্ডল। বসার লীলায়িত ভঙ্গীটি দেখতে দেখতে প্রেমা যেন পার্বতী হয়ে গেল। তার অজ্ঞাতেই তার রক্তের

শিল্পীসত্তা ঠোঁটের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যটি ফুটিয়ে তুলল। তার তরুণী দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হতে লাগল। কালিদাসের কুমারসম্ভব তার পড়া। মনে হল, দুঃখ তপস্যার শেষে প্রিয়-মিলনের হাসিটি ফুটে উঠেছে পার্বতীর মুখে। জয়কিষণ পার্বতীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন একটি স্থলপদ্ম। আনারদানার রঙের পদ্মটি যেন পার্বতীর ভালবাসার প্রতীক।

পুজো শেষে প্রণাম করে ফিরে দাঁড়ালেন জয়কিষণ। বেরিয়ে আসার জন্যে উদ্যত দক্ষিণ চরণ সংযত করলেন। প্রেমা নতজানু হয়ে চোখ দুটি বন্ধ করে নমস্কার নিবেদন করছে। মন্দিরের বিগ্রহকে কিংবা এইমাত্র যিনি পুজোর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন তাঁকে, তা বোঝা গেল না। তবে নমস্কার রত প্রেমার সামনে দিয়ে জয়কিষণ বেরিয়ে আসতে পারলেন না।

কিছু পরে প্রেমা চোখ মেলে তাকাল। সামনে দাঁড়িয়ে জয়কিষণ। প্রেমার মুখে লজ্জার রঙ ফুটল। সে উঠে দাঁড়াল। জয়কিষণ প্রশান্ত চোখে চেয়ে বললেন, আমাদের কুলদেবতা। এখানে থাকলে রোজ পুজোয় বসতেই হবে। এই আমাদের বংশানুক্রমিক নিয়ম। অবশ্য পূজারী রয়েছেন। আমরা কেউ না থাকলে তিনিই পুজোয় বসেন। তাছাড়া উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ পুজো অর্চনার দায়িত্ব তাঁর। আমাদের পুজো, মহেশ্বরকে ভালবাসি তাই।

প্রেমা অমনি বলল, পার্বতীকে ভালবাসেন না?

জয়কিষণ হেসে বললেন, বাসব না কেন? ওঁরা যে এক হয়ে মিশে রয়েছেন, পার্বতী-পরমেশ্বরৌ। একজনকে স্মরণ করলে অন্যজনকেও অন্তরে গ্রহণ করা হয়।

প্রেমা বলল, অপূর্ব বিগ্রহ। চোখ ফেরান যায় না। বসার ভঙ্গী চোখের দৃষ্টি মুখের হাসি চেয়ে চেয়ে দেখার মত।

জয়কিষণ বললেন, আমার পিতামহ এই মূর্তি তৈরী করিয়ে এনেছিলেন। আমাদের পরিবারের যে শাখাটি বাংলাদেশে রয়েছে তাঁদের কাছ থেকে আমার পিতামহ একসময় একটি ছবি উপহার পান। সেই ছবিটি এক বাঙালী শিল্পীর আঁকা। ছবি দেখে পিতামহ এতই মুগ্ধ হন যে নিজে জয়পুর গিয়ে অবিকল ছবির অনুকরণে এই মূর্তি তৈরী করিয়ে আনেন।

প্রেমা বলল, আপনাদের সঙ্গে দেখছি বাংলাদেশের যোগাযোগ নানা দিক থেকে।

জয়কিষণের মুখ উদ্ভাসিত হল, তা বলতে পারেন।

ওরা এবার টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে বাঁধান চত্বর পেরিয়ে

রাজবাড়ীর দিকে চলল। প্রেমা দেখল, জয়কিষণ স্বল্প বেশবাসে এই মুহূর্তে রোদ্দুর মেখে এক হিরন্ময় পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। দেহের অনাবৃত অংশ পৌরুষে দীপ্তিতে চোখের উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পড়ন্ত বেলায় দোলার সঙ্গে ছাদে উঠে আর এক দৃশ্য দেখল প্রেমা। চারদিকে ধূসর-নীল পাহাড়। মাঝে উপত্যকায় ছড়ানো ছিটোনো ক্ষেতখামার। কোথাও সোনালী কোথাও সবুজ। মাঝে মাঝে শালবন ভ্যালির এক একটুকরো জায়গা জুড়ে সংসার রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণে লালসিয়া স্টেটের বসতি অফিস দোকানপাট। উত্তরে টিলা। তার পেছনে আবার বিরাট মাউন্টেন রেঞ্জ। শাল আর পাহাড়ী গাছের ঘন সমাবেশে উত্তর দিকটা পাহাড়ী অরণ্যভূমির ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

দোলন আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে দেখ আন্টি ঘোড়ায় চড়ে বাবা আসছে। রোজ এই সময় বাবা বেড়িয়ে ফেরে।

প্রেমা দেখল, সেই প্রথম ভোরের মত শেষ সূর্যের উত্তাপহীন আলোয় স্নান করে এক অশ্বারোহী শাল বনের ভেতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে আসছেন রাজবাড়ীর দিকে। টিলা পেরিয়ে সমতলের দিকে নামতে লাগলেন জয়কিষণ। চেয়ে দেখার মত ভঙ্গী। নীচে নামার সময় ঘোড়ার রাশ টেনে পেছনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। আবার সমতল পথে সোজা হয়ে বসে ছন্দিত লয়ে ঘোড়া চালাতে লাগলেন।

প্রেমা বলল, কতদূর তোমার বাবা ঘোড়া নিয়ে চলে যান দোলন?

ঐ যে শালবনের ওপারে একটা বড় পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওটা একসময় আমাদের স্টেটের উত্তরের সীমানা ছিল। বাবা এখানে থাকলে রোজ ঘোড়ায় চড়ে ঐ পাহাড়টা ছুঁয়ে আসেন। একবার ওখানে গিয়ে ফিরে এলে বাবার গায়ের সব পোশাক ঘামে ভিজে যায়। ঘোড়ায় চড়লে দারুণ একসারসাইজ হয়।

প্রেমা বলল, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার দোলন?

পারি বইকি; বাবার পাশে পাশে ঘোড়া চালিয়ে আমি কতদূর গিয়ে ফিরে এসেছি। আমি ঘোড়া দৌড় করিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

প্রেমা বলল, সত্যি! দারুণ মেয়ে তো তুমি!

দোলন এবার লজ্জা পেয়ে হাসি হাসি মুখখানা নামাল।

দোলনের দিকে চেয়ে প্রেমার মনে হল বয়সের তুলনায় দোলন শুধু দেহেই বড় নয় মনেও অনেকখানি এগিয়ে আছে। তরুণী দোলন সময়ে কেবল

অসাধারণ সুন্দরীই হবে না, চারদিকের পরিবেশকে তার উপস্থিতি দিয়ে মাতিয়ে তুলবে।

প্রেমা দোলনের একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আঙুলগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

কি দেখছ আন্টি? তুমি কি পামিস্ট? আঙ্কেল খুব ভাল হাত দেখতে পারেন।

প্রেমা বলল, তাই বুঝি? না, আমি পামিস্ট নাই তবে তোমার আঙুল দেখে বলতে পারি, নাচ শিখলে তুমি নামকরা ড্যান্সার হতে পারবে।

তুমি আমাকে নাচ শেখাবে আন্টি?

প্রেমা হেসে ফেলল। হাসি থামলে বলল, তোমার বাবাকে বল আমার জন্যে গেস্টহাউসটা পারমানেন্টলি ছেড়ে দিতে। মাসে দুদিনের জন্যে প্লেনে করে আসবো তোমাকে নাচ শেখাতে।

দোলন কথাটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে নিল। সে প্রেমার হাতে চুমু খেয়ে বলল, সত্যি আন্টি তুমি কি দারুণ ভাল। বাবাকে এক্ষুনি আমি বলব।

প্রেমা দোলনকে বাধা দিয়ে বলল, বোকা মেয়ে তা কি হয়। আমি থাকি কতদূরে, আমার পক্ষে আসা কি সম্ভব।

দোলনের হঠাৎ কি হল, সে দুহাতের পাতায় তার দুটো চোখ ঢেকে ফেলল।

প্রেমা বুঝল, মেয়েটির আশাভঙ্গ হয়েছে তাই সে নিজের উদ্গত অশ্রু চেপে রাখতে পারছে না।

দুহাত বাড়িয়ে প্রেমা দোলনকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বলল, ছি ছি এমন করে কেউ কাঁদে। বাবাকে বললে কত ভাল নাচিয়ে এনে বাড়ীতে রেখে নাচ শেখাবেন।

দোলন প্রেমার বুকের ভেতর রাখা মাথাটিকে দোলাতে দোলাতে বলল, আমি আর কারুর কাছে নাচ শিখব না আন্টি। তুমি না শেখালে আমি কক্ষনো নাচ শিখব না।

পরিস্থিতিকে রক্ষা করল একটা পরিচারিকা এসে। কুমারবাহাদুর দোলনকে নীচে ডাকছেন।

দোলন দেখা গেল অতি বাধ্য মেয়ে। সে প্রেমার বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বৃষ্টিভেজা মুখখানা মুছে নিয়ে বলল, আন্টি

তুমি কি ছাদে থাকবে না আমার সঙ্গে নীচে নামবে? তোমার কফির টাইম হয়ে গেছে।

প্রেমা বলল, চল নীচেই নেমে যাই।

ওরা নীচে নেমে এল। প্রেমাকে ড্রইং রুমে বসিয়ে দোলন চলে গেল বাবার কাছে। প্রেমা দেখল বুক সেলফে নানা ধরনের বই সাজান। ও লাল কার্পেটের ওপর হাঁটু ভেঙে বসে বই টেনে টেনে দেখতে লাগল। ওপরের থাকে বহু নাচের বই-এর কালেকশান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নাচের ওপর প্রকাশিত বই-এর সংগ্রহ। একখানা বই-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মোহিনী আট্যমের শিল্পী হিসেবে গুরু মাধবী আম্মার নাম দেখে প্রেমা রোমাঞ্চিত হল।

লেখক জনৈক যশোদানন্দন শ্রীবাস্তব। মাধবী আম্মার যৌবনকালের নাচ দেখেছেন তিনি। স্টেজে মাধবী আম্মাকে দেখে তাঁর কি অনুভূতি জেগেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে গেছেন লেখক। মাধবী আম্মার পারফরমেন্সের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নাকের হীরের ঝলকটুকুও যে লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি সে কথাও লেখক অকপটে লিখে গেছেন। আর একটি কথা লিখেছেন। কানের রিং হারানো আর স্টেজে দর্শকদের মাঝে তাই খোঁজার একটা অভিনয় আছে মোহিনী অট্যমে। এক তরুণীর ইয়াররিং হারিয়ে গেছে। সে নাচের ছন্দিত পা ফেলে খুঁজে ফিরছে তার হারিয়ে যাওয়া ইয়াররিং। চরাচরের কোথাও কিছু ঝিলিক দিলেই সে সেদিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে তার হারিয়ে যাওয়া কানের অলঙ্কার ভেবে। এই খোঁজার ভেতরে শিল্পীর পদচারণা থেকে মনের নানা ধরনের ভাবভাবনার দ্রুত পরিবর্তনেই দর্শকদের উল্লাস বাড়িয়ে তোলে। শেষে শিল্পী স্টেজ থেকে নেমে আসে দর্শকদের ভেতর। চোখেমুখে আকুতির ভাব ফুটিয়ে প্রশ্ন তোলে—তোমরা কি কেউ পেয়েছ আমার রিং?

কখনো বা চোখেমুখে আবেদনের ভাবটি ফুটিয়ে বলে—দয়া করে দেবে কি আমার কানের গয়নাটা ফিরিয়ে?

শেষে কোন কোন তরুণ যুবা—পুরুষের দেহে হাত রেখে খোঁজার অভিনয় করে তরুণী নর্তকী। চারদিকে অমনি রসের প্লাবন বয়ে যায়। এ ওর দিকে নির্দেশ করে বলে, এই যে এখানে এখানে।

বিভ্রান্ত নর্তকী জনে জনে সন্ধান করে ফিরতে থাকে। মাতন লাগে সারা অডিটোরিয়ামে।

এই ইয়াররিং হারানোর অভিনয়টি আজকাল উঠে গেছে স্টেজ থেকে।

মোহিনী আট্যমের নাচের তালিকা থেকে নির্মমভাবে ছাঁটাই হয়ে গেছে এই কৌতুক নক্সাটি মরালিস্টদের চাপে পড়ে। এ নাকি অশ্লীল।

মাধবী আম্মাদের যৌবন দিনে নাচের একেবারে শেষে এই অভিনয়টুকু অবশ্য করণীয় ছিল। নর্তকী যেন এই নাচটুকুর ভেতর দিয়ে বলতে চাইত, হে আমার ভক্ত উপাসক দর্শককুল, দেখ, তোমাদের নাচ দেখাতে গিয়ে আমি কানের প্রিয় অলঙ্কারটিও হারিয়ে বসে আছি।

সমঝদার কোন রাজামহারাজ অথবা ধনী দর্শক হলে নর্তকীকে কানের অলঙ্কার গড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেন। সবার সামনে স্টেজের ওপরে উঠে ঘোষণাও করতেন।

লেখক লিখেছেন, মাধবী আম্মা তাঁর কাছে এসে চোখমুখের মুদ্রায় আশ্চর্য জিজ্ঞাসা চিহ্ন ফুটিয়ে তুললেন। লেখক নেতিবাচক মাথা নাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে করুণ হয়ে উঠল মাধবী আম্মার চোখমুখ।

লেখক মন্তব্য করেছেন, মুহূর্তে মুখের এমন ভাব পরিবর্তন তিনি তাঁর দর্শকজীবনে আর কোন শিল্পীর মধ্যেই দেখেননি। এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। মাধবী আম্মাকে না দেখলে ভাষায় সে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ সম্ভব নয়।

পড়তে পড়তে জল এসে গেল অতি আধুনিকা নর্তকী প্রেমা মেননের চোখে। তার বার বার মনে হতে লাগল, সে চেষ্টা করলেও তার গুরু মাধবী আম্মার শক্তির কাছাকাছি যেতে পারবে না। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বইখানা মাথায় ছোঁয়াল। যেন এই মুহূর্তে প্রেমা পরম শ্রদ্ধায় স্পর্শ করল গুরু মাধবী আম্মার চরণ।

পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে দোলন। বইখানা সেলফে রাখতে যেতেই গলা বেজে উঠল দোলনের, আন্টি এ বুক শেলফখানা মায়ের। অনেক নাচের বই আছে এর ভেতর।

প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাই দেখছিলাম এতক্ষণ।

দোলন এবার একখানা ছোট্ট স্লিপ ধরিয়ে দিল প্রেমার হাতে।

প্রেমা দেখল, কুমার জয়কিষণ স্লিপ পাঠিয়েছেন।

মাননীয়া মিস মেনন,

আমার বাইরের মহলে আজ সান্ধ্য কফি খেতে কি আপনার খুব আপত্তি হবে? সামনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও আছে।

আপনাদের জয়কিষণ।

প্রেমা চিঠি পড়া শেষ করে দোলনকে বলল, চল তোমার বাবার ঘরে যাই। উনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওখানেই কফি খাব আমরা।

দোলনের সঙ্গে প্রেমা এলো বাইরের মহলে। কুমার জয়কিষণ একাই বসেছিলেন ড্রইংরুমে। উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে প্রেমাকে বসালেন।

জয়কিষণ ইতিমধ্যে ভ্রমণের পোশাক পরিবর্তন করেছেন। এখন ধবধবে সাদা ধুতির ওপর পরেছেন র-সিল্কের মেরজাই। কাঁচা সোনার মত রঙ এই পোশাকে যেন আরও খুলেছে।

পেতলের কাজকরা ট্রেতে এলো স্ন্যাকস আর কফি।

দোলন কফির কাপ প্রেমার হাতে তুলে দিতে যেতেই প্রেমা কাপটা ধরে নিয়ে জয়কিষণের দিকে চেয়ে বলল, দোলন যেভাবে অতিথি সেবা করছে তাতে সহজে লালসিয়া ছেড়ে যেতে পা উঠবে না। আর যদি একান্ত যেতেই হয় তাহলে দোলনকে সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে দেখছি উপায় নেই।

দোলন রসিকতাটুকু উপভোগ করল, কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াল না। সে একমুখ হাসি উপহার দিয়ে দৌড়ে ঘর ছেড়ে পালাল।

জয়কিষণ বললেন, ওকে যে কোন একটা কাজে নিযুক্ত করে দিলেই হল। ঐটাই হয়ে উঠবে ওর ধ্যানজ্ঞান।

প্রেমা বলল, একটি কিশোরী যে কতখানি আকর্ষণীয় হতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের দোলন। ওর মন আর মুখের হাসি শিশুর মত কিন্তু কর্তব্যে ও বড়দেরও হার মানায়।

জয়কিষণ বললেন, এ সবই ওর মায়ের কাছে শেখা। খুব ছোটবেলা থেকেই প্রতিটি কাজ ওকে দিয়ে করাতেন ওর মা। এলোমেলো নয়, সবকিছু গুছিয়ে সুন্দর করে করতে শেখাতেন।

প্রেমা বলল, দোলন মায়ের অভাব নিশ্চয়ই অনুভব করে?

খুব ছোটবেলা মা চলে গেছে তাই দুঃখবোধটা বড় বেশী নেই। তবে মায়ের সম্বন্ধে ওর প্রশ্ন অহরহ। কোন একখানা ছবি দেখলেই অমনি নানা বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

প্রেমা বলল, খুব স্বাভাবিক।

জয়কিষণ বললেন, কিছুদিন থেকে দেখছি দোলন স্নানের পর আমার ঘরে চলে এসে মায়ের ছবির সামনে চুপচাপ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কোন কথা না বলে প্রণাম করে চলে যায়।

প্রেমা অমনি বলল, দোলনের মায়ের ছবি কি এখানে রয়েছে?

কফি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। জয়কিষণ বুঝলেন প্রেমা তাঁর স্ত্রীর ছবি দেখতে চায়। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

প্রেমা জয়কিষণকে অনুসরণ করে ভেতরের একখানা ঘরে এসে দাঁড়াল।

বিরাট প্রশস্ত ঘর। কুমার জয়কিষণের বেডরুম বলেই মনে হল। দুখানা পালঙ্ক পাশাপাশি রয়েছে। হাতির দাঁতের কাজ করা ছত্রী। লতাপাতা পাখিতে দারুণরকম দর্শনীয়। বিছানা দুখানিই সাজান। একটি বিছানার মাথার দিকে লতাপাতার কাজের মাঝখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানা ছবি।

বড় রঙীন ছবি। গোল্ডেন ফ্রেমে বাঁধান। প্রেমা পাশে দাঁড়িয়ে ছবিখানা দেখতে লাগল। অলঙ্কারে সজ্জিত নববধূর মূর্তি। প্রেমার এক ঝলক দৃষ্টিতেই মনে হল প্রশংসনীয় মুখখানা। সম্ভবত ছবি তোলার সময় জয়কিষণের কোন বন্ধু কৌতুক করছিলেন তাই নববধূর চোখ কারুর ওপর যেন নিবদ্ধ। মুখে কৌতুক উপভোগের একটুকরো হাসি।

প্রেমা বলল, দোলন মা বাবা দুজনেরই আদল পেয়েছে।

জয়কিষণ হেসে বললেন, কার ভাগ বেশী ?

ফিফটি ফিফটি বলা যায়। তবে খুঁটিয়ে না দেখলে অ্যাকিউরেটলি বলা সম্ভব নয়।

একবার ঘরের দেয়ালে চোখ পড়ল প্রেমার। নর্তকী শ্রীমতী গর্গের নানা ধরণের নৃত্যভঙ্গিমার ছবিতে চারটি দেয়াল ভরা। অধিকাংশই রঙীন ছবি। মণিপুরী কত্থক ভারতনাট্যম আর পাহাড়ী কোন লোকনৃত্যের সব ছবি। দারুণরকম গতিশীল আর প্রাণবন্ত।

দেখতে যথার্থ সুন্দরী ছিলেন ভদ্রমহিলা। হাসির ভেতর কৃত্রিমতার চেয়ে স্বতস্ফূর্ত ভাবটুকু লক্ষ্য করার মত। মুখখানাকে প্রায় সিধে রেখে চোখের তারা নয়ন কোণে উড়িয়ে প্রিয়জনকে আহ্বানের কঠিন ভঙ্গীটি অনায়াসে আয়ত্ব করে নিয়েছেন মিসেস গর্গ।

প্রেমা বলল, বড় গুণী ছিলেন আপনার স্ত্রী।

জয়কিষণ হেসে বললেন, কি করে বুঝলেন ?

প্রেমা বলল, সাহিত্যিক সাহিত্যিককে চেনেন আর শিল্পী শিল্পীকে। সেটাই স্বাভাবিক নয় কি ?

জয়কিষণ বলল, হার মানলাম। আপনি একজন গুণী নৃত্যশিল্পী হয়ে অন্য একজন শিল্পীকে চিনবেন বই কি। কিন্তু মিস মেনন একই বৃত্তির মানুষেরা পরস্পরকে সাধারণত ঈর্ষার চোখেই দেখে থাকেন।

প্রেমা বলল, আমি যে গুরুর কাছ থেকে নাচ শিখেছি তাঁর প্রথম পাঠ ছিল অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখ তবেই নিজে শিখতে পারবে।

তিনি বিভিন্ন গুরুর কাছে আমাদের নিয়ে যেতেন। তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতি মন দিয়ে শিখে নিতে বলতেন। তাঁর মত ছিল, বিভিন্ন নৃত্যধারার সঙ্গে পরিচিত হও তবে তোমার নিজস্ব শৈলী একদিন গড়ে উঠবে। বলতেন, গুণীকে সব সময় মন থেকে প্রশংসা করবে আর তোমার চেয়ে যে দুর্বল তাকে উৎসাহ দেবে। ঈর্ষাকাতর হয়ো না, কিন্তু জেদী হও।

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে প্রেমা লজ্জিত হল। গুরু প্রসঙ্গ এলেই প্রেমা প্রগলভ হয়ে ওঠে।

জয়কিষণ বললেন, আপনার গুরু কি মাধবী আম্মা?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?

জয়কিষণ বললেন, আপনাদের জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিচার সভায় উনিই তো প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পুরস্কার দেবার সময় ওঁকে আমরা দেখেছি। কিন্তু দর্শক হিসেবে ওঁর সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি নি। প্রতিটি দর্শকই প্রায় আপনার স্বপক্ষে তাঁদের মত দিয়েছেন।

প্রেমা হেসে বলল, উনি যে আমার গুরু। তাই বিচারে আমাকে দ্বিতীয় স্থান দিয়ে আপনাদের চোখে আরও বড় করে তুলেছেন।

জয়কিষণ বললেন, বিশ্বাস করুন সেদিন আমরা বিচারকদের ডিসিসানে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। শেষে যখন শুনলাম আপনার গুরু মাধবী আম্মাই আপনার বিপক্ষে একটি ভোট দিয়ে কথক শিল্পীকে জিতিয়ে দিয়েছেন তখন আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রেমা বলল, আমার গুরু বলেই একাজ করতে পেরেছেন। আমি আমার গুরুর জন্যে গর্বিত।

জয়কিষণ এবার হেসে ফেললেন। বললেন, এমন শিষ্যের জন্যে গুরুরও গর্বিত হওয়া উচিত।

প্রেমা প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার স্ত্রীর অনেকগুলি মূল্যবান নাচের বই-এর কালেকসান আছে।

উনি ওঁর সাবজেক্টের বই পড়তে খুব ভাল বাসতেন। আমি ওঁর বিষয়ের ভেতর নাক গলাতে যেতাম না। কারণ দু' একবার পাতা উল্টে দেখেছি ও বিষয়টা দর্শনে যত সুন্দর পঠনে ঠিক ততটা নয়।

প্রেমা বলল, ওঁর সেলফ থেকে বই একখানা দেখতে গিয়ে আমার গুরু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দেখে খুব ভাল লাগল।

জয়কিষণ বললেন, আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই আপনার গুরুর নাম জানতেন। উনি আজ এখানে থাকলে ওঁর সঙ্গে নাচের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে আপনি খুশীই হতেন।

প্রেমা বলল, দুর্ভাগ্য আমার উনি আজ নেই। আচ্ছা জয়কিষণ আপনাদের নৃত্য মঞ্চটি কি মিসেস গর্গের পরিকল্পনায় তৈরী হয়েছিল?

সম্পূর্ণ ওঁরই পরিকল্পনায়। শুরু থেকে শেষ অব্দি প্রায় প্রতিদিন উনি মঞ্চ তৈরীর সময় উপস্থিত থাকতেন।

প্রেমা বলল, আপনাদের নাট মণ্ডপটি দেখা হল না। বাইরের সংস্কারের কাজ কি এখনও বাকী আছে?

জয়কিষণ বললেন, প্রায় শেষ। কদিন বাদেই আপনাকে নিয়ে যাব ওখানে।

প্রেমা বলল, মিঃ গর্গ, আপনি কি যেন আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে?

জয়কিষণ বললেন, একটু আগে নাম ধরেই তো কথা বলছিলেন, আবার মিঃ গর্গ কেন? আমি খুব আনন্দ পেয়েছি আপনার নাম ধরে ডাকাতে।

প্রেমা বলল, আমার কোন আপত্তি নেই। কেবল কুমারবাহাদুর আপত্তি না করলেই হল।

জয়কিষণ বললেন, আমি তো আগেই নাম ধরে ডাকার আবেদনটা পেশ করে রেখেছিলাম।

প্রেমা সুন্দর করে হাসল।

জয়কিষণ বললেন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, পালঙ্কের ওপরেই বসুন।

প্রেমা বলল, অসম্ভব। মিসেস গর্গের চিহ্নিত আসন এটি। ওঁর ফটোও রাখা আছে এর ওপর।

জয়কিষণ বলে উঠলেন, কিছু হবে না, কিছু হবে না। ওসব প্রেজুডিস নেই আমার। আপনি অসংকোচে বসুন।

প্রেমা মিসেস গর্গের ছবির ফ্রেমে হাত দিয়ে নমস্কার করে পালঙ্কের এক কোণায় বসল।

জয়কিষণ খানিক দূরে নিজের বিছানার ওপর বসে বললেন, আপনাকে ডেকেছি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব বলে।

প্রেমা জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকাল।

জয়কিষণ বললেন, কয়েকটা দিন পরেই পূর্ণিমা। রাস উৎসবের অনুষ্ঠান ঐদিনে। লালসিয়ায় এই বসন্ত রাসের প্রবর্তন দোলনের মাই করে গেছেন।

প্রেমা বলল, আপনাদের রাস উৎসব কিভাবে হয়?

জয়কিষণ বললেন, নাট মণ্ডপের সামনের বাগানটিকে আলো দিয়ে সাজান হয়। বাগানের বিভিন্ন অংশে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিচিত্র সব লীলার প্রদর্শনী হয়। মাঝে তৈরী হয় রাস মঞ্চ। একটি কৃত্রিম দণ্ড শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পে সজ্জিত হয়ে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। তোতা, কোকিল, পাপিয়া, বুলবুল পাখিতে গাছটি ছেয়ে থাকে। অবশ্য সবই কারিগরের হাতের তৈরী। রাতে গাছে নানা ধরনের আলোর ফুল ফোটে।

গাছের ডালে ডালে ঝোলান হয় দোলনা। কারেণ্টে দোলনাগুলো দুলতে থাকে। প্রতিটি সজ্জিত দোলনায় একজন কৃষ্ণ ও একজন গোপকন্যা। এক সময় বৃক্ষটিকে বৃত্তাকারে ঘোরান হয়। তখন কোকিল পাপিয়া ডাকতে থাকে। রাসের গান করে গায়কেরা গাছের তলায় মঞ্চে বসে।

প্রেমা বলল, রাধাকে চেনা যায় কি করে?

জয়কিষণ বললেন, তিনি তো অপরূপা। দর্শকেরা সব গোপিনীর ভেতর থেকে রাসেশ্বরীকে ঠিকই চিনে নেয়। সবচেয়ে সুন্দর করে গড়া হয় রাধার মূর্তি।

প্রেমা বলল, আপনাদের উৎসব নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

জয়কিষণ বললেন, সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত নটা অব্দি রাস উৎসব। জনসমাগম হয় সে সময়। তারপর সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট অতিথিরা তখন শুধু থাকেন নাট মণ্ডপে। আর সবাই চলে যান।

প্রেমা বলল, ঐ তিন ঘণ্টাতেই কি উৎসবের শেষ? সবাই কি এই সামান্য সময়ের ভেতর সবকিছু দেখে নিতে পারেন?

উৎসবের শেষ এক রাতেই। তবে আলোকসজ্জা ইত্যাদি থাকে তিন দিন। তারই ভেতর বহু মানুষ দেখে যান।

প্রেমা বলল, এরপর বিশিষ্ট অতিথিরা নাট মণ্ডপে নৃত্য শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখেন?

ঠিক তাই।

প্রেমা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা জয়কিষণ, আপনার স্ত্রী লালসিয়ার বাইরে নৃত্যের কোন অনুষ্ঠানে কখনো যোগ দেন নি?

বিয়ের আগে হয়ত দিয়েছেন, কিন্তু এখানে আসার পরে নয়।

এ বিষয়ে কি আপনাদের পরিবারের কোন প্রেজুডিস আছে ?

জয়কিষণ বললেন, আমার না থাকলেও বাবার ছিল। আর আমার স্ত্রী বাবাকে যেমন ভক্তি করতেন, তাঁর কথা তেমনি মেনেও চলতেন।

প্রেমা বলল, আপনার বাবার মৃত্যুর পরে তাহলে এ নাটমণ্ডপ হয়েছে ?

হাঁ। তাঁর মৃত্যুর পরে আমি আমার স্ত্রীর কাছে এ ধরনের একটা নৃত্য মঞ্চ তৈরীর পরিকল্পনা করি। তিনি বাবার কথা চিন্তা করে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে যান। নাটমণ্ডপের পরিপূর্ণ রূপটা কিন্তু দেন তিনি। ইঞ্জিনীয়ার এবং মিস্ত্রিরা তাঁর চিন্তা অনুযায়ী কাজ করে যায়।

প্রেমা বলল, তিনি আপনার অতিথিদের সামনে এই নাট মণ্ডপে তাঁর নৃত্য পরিবেশন করতেন নিশ্চয় ?

হাঁ। তবে বছরের কতকগুলো অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে অনেক গুণী শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে আনতেন।

প্রেমা বলল, একটা কুঁড়ি যেমন পাপড়ি মেলে ফুটে উঠতে চায়, শিল্পীও তেমনি চায় সবার সামনে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে।

জয়কিষণ বললেন, কোন শিল্পী লালসিয়াতে এলে বড় খুশী হয়ে উঠতেন তিনি। তাকে কিভাবে সমাদর করবেন যেন বুঝে উঠতে পারতেন না। অনেক করেও কিছুতেই যেন আর তাঁর তৃপ্তি হত না।

প্রেমা বলল, মেয়ে কিন্তু মায়ের গুণ পেয়েছে। এত অল্প বয়সে ও দারুণ ডিউটিফুল হয়েছে।

জয়কিষণ বললেন, দোলন মায়ের মত মানুষকে ভালবাসতে শিখেছে আর আমার কাছ থেকে কিছু কিছু দোষ ও পেয়েছে।

প্রেমা হেসে বলল, যেমন ?

এই যেমন ধরুন কোন গোলমাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা কোথাও বাধলে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যাওয়া। কর্মচারী আর পরিচারকদের ঝামেলা ঠাণ্ডা মাথায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা।

প্রেমা অমনি বলল, লালসিয়া স্টেটের সীমানা অব্দি বাবার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া।

জয়কিষণ হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, সবই জানা হয়ে গেছে দেখছি।

প্রেমা বলল, এইসব দস্যিপনার অপগুণগুলো দারুণভাবে বাবার কাছ থেকে

পেয়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, ছেলেদের মত এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও ওর ভেতর কিশোরী মেয়ের কোমল লাবণ্যটুকু থেকে গেছে।

জয়কিষণ বললেন, ওটুকু ওর মায়ের আশীর্বাদ।

প্রেমা বলল, ওঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু সামনের ছবি দেখে ওঁর স্বভাবের অনেকখানিই অনুমান করা যায়।

জয়কিষণ এবার আর কোন কথা বললেন না। স্ত্রীর আরও অনেক প্রশস্তি করার ইচ্ছে তাঁর থাকলেও তিনি চুপ করে গেলেন। এরপর কিছু বললে যে তা আর গম্ভীর শোনাবে না সেটা তিনি বেশ অনুভব করলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতার ভেতর কাটিয়ে এক সময় জয়কিষণ বললেন, আপনাকে ডেকেছি একটি ব্যাপারে ক্ষমা চাইবার জন্যে।

প্রেমা বলল, এমন করে বলছেন কেন ? কি অপরাধ যে ক্ষমা চাইতে হবে।

জয়কিষণ বললেন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানের আগের দিন ফিরব।

প্রেমা বলল, কাজ থাকলে যেতে হবে বৈকি। কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কাজটা কি খুবই জরুরী ?

মনে হল কিছুটা সংকুচিত হলেন জয়কিষণ। এক সময় বললেন, যদিও ব্যাপারটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত তাহলেও আপনাকে বলতে কোন বাধা নেই।

একটু থেমে প্রেমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললেন, রাস উৎসবের আগে আমি আর মধুবন্তী হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গায় ফুল আর প্রদীপ ভাসিয়ে আসতাম। ওঁর মৃত্যুর পরেও আমি প্রতি বছর একটি দিনের জন্যেও হরিদ্বারে যাই।

প্রেমা বলল, খুব ভাল লাগল কথাটা শুনে। তিনি যেমন আপনার কাছে আকর্ষণীয়া ছিলেন, আপনিও তেমনি ওঁর কাছে স্বামী হিসেবে কম আকর্ষণীয় ছিলেন না!

জয়কিষণ একটু হেসে বললেন, কি করে বুঝলেন ?

প্রেমা বলল মেয়েদের একটা হৃদয় আছে, সেই হৃদয় দিয়ে।

জয়কিষণ অন্য কথা পাড়লেন, আমার লোকজন সারাক্ষণ থাকবে অতিথিদের সেবাযত্নের কাজে। আর দোলন তো ছায়ার মত থাকবে আপনার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রেমা বলল, অত ভাবছেন কেন। এমনও তো হতে পারে এই সুযোগে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে নর্তকী প্রেমা যেমন গঙ্গা দর্শন করে এল।

জয়কিষণ বলল, সে তো সৌভাগ্য, কিন্তু কুমারবাহাদুর তো কাউকে নিয়ে যাবে না। গেলে জয়কিষণই নিয়ে যেতে পারে।

প্রেমার হাসিতে দ্রুত জলতরঙ্গ বেজে উঠল। হাসি থামলে সে বলল, আচ্ছা আচ্ছা, কুমারবাহাদুরের জায়গায় জয়কিষণই বহাল রইল।

জয়কিষণ বললেন, সত্যি আপনি যেতে চান?

প্রেমা বলল, আমি খুব খেয়ালী তাই না?

শিল্পী মাত্রেই। মধুবন্তীও বড় খেয়ালী ছিলেন।

প্রেমা বলল, দোলন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে তো?

জয়কিষণ বললেন, দোলন তার মা থাকতেও কোনদিন যায় নি হরিদ্বারে। আমরা দুজনেই শুধু এ-সময় যেতাম। তবে আপনি যখন যাচ্ছেন তখন দোলনও যাবে। আচ্ছা, দোলনকে ডেকে পাঠাচ্ছি আমি।

দোলন এল। জয়কিষণ বললেন, তোমার আণ্টি হরিদ্বারে যেতে চাইছেন।

দোলন বলল, খুব ভাল। বাবা তুমি তো যাবে, আণ্টিকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

জয়কিষণ হেসে বললেন, আণ্টি যে তোমাকে ছাড়া যেতে চাইছেন না।

দোলনের মুখে একটা বিচলিত অবস্থার ছবি ফুটে উঠল।

সে হঠাৎ বলল, তুমি যাও না আণ্টি বাবার সঙ্গে। আমাকে যে রাস মঞ্চের ফুল তৈরী করতে হবে। আমি চলে গেলে একা আঙ্কেলের পক্ষে কি একরাশ ফুলপাতা তৈরী করা সম্ভব।

জয়কিষণ নীরব। দোলন প্রেমার মুখের দিকে চেয়ে। প্রেমা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। কোন পুরুষের সঙ্গী হতে তার কোন সংকোচ থাকার কথা নয়, তবু দোলন সঙ্গী থাকলেই যেন মানাতো ভাল।

জয়কিষণ নীরবতা ভাঙলেন। প্রেমার দিকে চেয়ে বললেন, আমি এ যাত্রায় একাই ফিরে আসি। রাস উৎসবের পর আপনার সব দলবলকে নিয়ে হরিদ্বারে না হয় ঘুরিয়ে আনব।

প্রেমা বলল, থাক, সবাইকে আর নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। নাচ তো ভারী, তার জন্যে খরচ আর হাঙ্গামার অন্ত নেই।

জয়কিষণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, একথা কেন বলছেন মিস মেনন। আমি তো হিসেব কষে আমন্ত্রণ করিনি।

প্রেমা বলল, সে কথা যাক এখন আপনার যদি কোন রকম অসুবিধে না থাকে তাহলে এ যাত্রাতেই আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।

দোলন্ বলল, বাবার আবার অসুবিধে কি। ওখানে তো হোটেলেই উঠবে। নিজের হাতে তো কিছু করতে হবে না।

জয়কিষণ হেসে বললেন, তুমি সঙ্গে রইলে না, অথচ তোমার আন্টিকে নিয়ে যাচ্ছি। ওঁর কোন অসুবিধে হলে কিন্তু আমাকে দায়ী করতে পারবে না তুমি।

প্রেমা বলল, অসুবিধে কতখানি হয় দেখা যাক। তারপর ফিরে এসে চুপি চুপি তোমার কানে বলে দেব সব।

দোলন শাসনের ভঙ্গীতে বলল, দেখো বাবা, আন্টির কোন অসুবিধে হলে কিন্তু তুমি যতই বল তোমাকে ছাড়ব না।

জয়কিষণ মেয়ের দিকে চেয়ে অনাবিল হাসি হাসতে লাগলেন।

ঝাঁক ঝাঁক সোনালী প্রোভার পাখির মত গঙ্গার জল রোদ্দুরের ঝিলিমিলি তুলে উড়ে চলেছে। দূরে কাছে নীল সবুজ পাহাড়ের রেখা। ব্রীজ পেরিয়ে গঙ্গার এপারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে দুজন। প্রেমা এই প্রথম দেখছে গঙ্গাকে। খরস্রোতা গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রেমা মন্ত্রমুগ্ধ। ঠাণ্ডা জল ছুঁয়ে বয়ে আসছে হাওয়া। মুখে চোখে আশ্চর্য একটা শীতল স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

বাঁধান তীরভূমি। কয়েক গজ দূরে দূরে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ফুল ফুটে আছে। কোন কুশলী নামকরণবিদ কবে যে কৃষ্ণচূড়া নামকরণ করেছিলেন কে জানে। কিন্তু সার্থক তাঁর নামকরণ। একটা ফুল হাতের নাগালের ভেতর এসে গেছে দেখে দীর্ঘদেহী জয়কিষণ সেটি তুলে নিলেন। গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল প্রেমা। সে দেখছিল নীল জলধারার ত্বরিত প্রবাহ, ব্রীজের পিলারে ধাক্কা খেয়ে জলে মুহূর্তে ঘূর্ণির পাক। সামনের একটি শিলাখণ্ডে আঘাত লেগে জলের কলকল ছলছল শব্দে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া। সব মিলিয়ে গঙ্গা যেন দুরন্ত এক নর্তকী। প্রেমার দেহের প্রতিটি কোষ থর থর করে কাঁপতে লাগল। নীল শিরার ভেতর দিয়ে লাল রক্তের ধারা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল। প্রেমা মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল প্রবাহিনী গঙ্গায়।

পেছন থেকে এসে জয়কিষণ তার সামনে ছোট্ট একটি ডাল সমেত কৃষ্ণচূড়া ফুল এগিয়ে ধরলে প্রেমা প্রথমে দারুণ রকম চমকে উঠল। তার গভীর ধ্যান আচমকা ভেঙে গেল। সে অমনি দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এ কান্নার জন্ম বিশেষ কোন একটা ঘটনার থেকে নয়। মনের তদ্গত ভাবটি হঠাৎ ভেঙে চুরে যাওয়াতে এই আকস্মিক কান্নার উচ্ছ্বাস।

বিহ্বল জয়াকিষণ। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না প্রেমার এই কান্নার কারণ। তাঁর হাতের ফুল হাতেই ধরা রইল।

একটু পরেই প্রেমার ঘোর কাটল। সে শান্ত হয়ে রইল আর সঙ্গে সঙ্গে জয়কিষণের সামনে এ ধরনের দুর্বলতা প্রকাশের জন্যে দারুণ লজ্জা পেল। চোখ থেকে হাত নামাল কিন্তু চোখ তুলে কথা বলতে পারল না।

.জয়াকিষণ বললেন, তুমি কাঁদছ প্রেমা!

এই প্রথম তুমি বলে প্রেমাকে সম্বোধন করলেন জয়কিষণ। প্রেমার মনে এই ডাকটুকু দারুণ সুখকর এক অনুভূতির জন্ম দিল।

প্রেমা কোন উত্তর দিল না। সলজ্জ এক টুকরো হাসি হেসে জয়কিষণের হাত থেকে কৃষ্ণচূড়া ফুলটি নিয়ে দেখতে লাগল।

যে কৃষ্ণকে সে তার নাচের ভেতর প্রেমিক পুরুষরূপে গ্রহণ করে এসেছে, যাঁর জন্যে তার দেহ কখনো কদম্বের মত বিকশিত হয়েছে, আবার কখনো বর্ষাধারার মত ভেঙে ঝরে পড়েছে, তাঁরই মাথার মুকুট এই ফুলের কারুকর্মে। লাল হলুদে মেশা ফুলগুলো কেমন বড় থেকে ছোট হতে হতে একেবারে শেষ প্রান্তের সবুজ বৃন্তে কুঁড়ি হয়ে জেগে আছে। সবটুকু মিলে দক্ষ কারিগরের হাতে গড়া অদ্ভুত সুন্দর শিরোভূষণের আকৃতি।

ফুল দেখা শেষ হলে নর্তকী প্রেমা চোখ তুলে চাইল জয়াকিষণের দিকে। একটা সুখের অনুভূতি তখন তিরতির করে কাঁপছিল তার চোখের তারায়।

জয়কিষণ চিনে ফেলেছেন মুডি মেয়েটিকে। তিনি একটুখানি হেসে বললেন, অন্যায় একটা করে ফেললাম। সম্মানীয় অতিথিকে নাম ধরে ডাকলাম।

প্রেমা বলল, মানুষের কাছে মানুষ অতিথি হয়ে আসবে কেন। হয় আসবে আপনজন হয়ে নয়তো থাকবে দূরের মানুষ হয়ে। এর মাঝামাঝি কোন রকম রফাতেই আমার আপত্তি।

জয়াকিষণ বললেন, মতের দিক থেকে তোমার সঙ্গে আমার দারুণ মিল হয়ে গেল। কিন্তু আমার বেলাতে যেন আলাদা ব্যবস্থা না হয়। একই সম্ভাষণ আমিও আশা করব তোমার কাছ থেকে। চাইব আমার নাম ভূষণ ছাড়াই তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হোক।

প্রেমা হেসে বলল, রাজী।

ওরা গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াল টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে। এক সময় আকাশ রাঙিয়ে সূর্যাস্ত হল। ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে দুজনে দেখল সেই সমারোহপূর্ণ সূর্যাস্ত। সন্ধ্যার ঘণ্টা বেজে উঠল মন্দিরে। ওরা পায়ে পায়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ব্রীজ পেরিয়ে এপারে চলে এল।

সামনেই রয়েল হোটেল। তিন তলার ওপর ভাড়া নেওয়া হয়েছে পাশাপাশি দুখানা ঘর। সামনে গঙ্গামুখী প্রশস্ত বারান্দা।

জয়কিষণ বললেন, এসো আমরা ফুলের দীপ ভাসাই প্রেমা। ঐ দেখ দীপ ভাসানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

প্রেমা দেখল, ছোট্ট চুপড়ি ভরে ভরে দোকানীরা লাল সাদা ফুল সাজিয়ে দিচ্ছে। ঐ ফুলের চুপড়ির ওপরে একটি করে ছোট্ট দীপ। ক্রেতারা দীপ জেলে ঐ চুপড়ি ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে। চুপড়িটি জলে দেওয়া মাত্র চোখের পলকে স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূর দূরান্তে। অন্ধকারে শুধু দেখা যাচ্ছে একটি আলোর ফুলে গাঁথা মালা ভেসে চলেছে। মালার দুটি প্রান্তে গ্রন্থি পড়ে নি।

জয়কিষণ একটি ফুলের চুপড়ি কিনে জ্বালিয়ে নিলেন প্রদীপ। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল প্রেমা। জয়কিষণ তার হাতে ঐ উপচারটি তুলে দিয়ে বললেন, সাবধানে ঘাটে নেমে ফুল আর দীপ ভাসিয়ে এসো। জলে পা দেবার চেষ্টা কর না। কারেণ্টে পড়লে আর রক্ষে নেই।

প্রেমা ফুলের চুপড়ি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে নামল। হাত বাড়িয়ে জলে চুপড়িটা ছুঁইয়ে দেওয়া মাত্রেই কে যেন হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাল। জলের কি তীব্র টান। একটা বিরাট চুম্বক যেন বিপুল শক্তিতে টেনে নিল একটুকরো লোহা।

পেছন ফিরতেই চোখাচোখি জয়কিষণের সঙ্গে। এবার জয়কিষণ হাতে ফুল আর দীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভাসাবার জন্যে। প্রেমা ওপরে উঠে আসতে আসতে বলল, সাবধান, জলে নামবেন না যেন।

জয়কিষণ হেসে উঠলেন।

ওপরে উঠে এসে প্রেমা মুখ নীচু করে জিজ্ঞেস করল, হাসলেন যে?

নীচ থেকে ওপরে তাকিয়ে জয়কিষণ হেসে বললেন, দুটো কারণে। এক তুমি প্রতিজ্ঞা ভেঙেছ আমাকে সম্মানীয় সম্বোধনে ডেকে। আর দ্বিতীয়, আমাকে সাবধান করছ জলে নামার ব্যাপারে।

প্রেমা বলল, প্রথম অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু প্রিয়জনকে সাবধান করা কোন অপরাধ নয়।

জয়কিষণ বললেন, গঙ্গার সঙ্গে আমার আবাল্য সখ্য। কাল গঙ্গায় নেমে স্নান করব আবার সাঁতারও কাটব। দুটোই দেখতে পাবে।

সত্যি!

বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার যোগাড় প্রেমা মেননের।

জয়কিষণ প্রেমার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লেন। তারপর গঙ্গার দিকে ফিরে ফুল আর দীপ ভাসিয়ে দিলেন।

ফুল আর দীপ ভেসে গেল। সেদিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন জয়কিষণ।

ওপরে দাঁড়িয়ে প্রেমা তাকিয়ে রইল জয়কিষণের দিকে। তার মনে হল, জয়কিষণ শুধু ফুল আর দীপ ভাসিয়ে কর্তব্য শেষ করে নি, স্ত্রী মধুবন্তীর মঙ্গল কামনা করছে একান্ত মনে।

জয়কিষণ ওপরে উঠে আসছিলেন, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল প্রেমা তার দিকে। নীচে থেকে এক মুখ হাসি ছড়িয়ে প্রেমার হাত ধরে উঠে এলেন জয়কিষণ।

ওপরে উঠে হেসে বললেন, মানুষকে সাহায্য করার একটা সহজাত ইচ্ছে আছে তোমার ভেতর।

প্রেমা বলল, ভাগ্যি ভাল, আমার হাতখানা আজ সম্মানিত হল। অনেকে এর ভুল ব্যাখা করতে পারেন।

আর যিনি করুন জয়কিষণ করবে না কোনদিন।

প্রেমা চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, সন্ধ্যায় হরিদ্বারের গঙ্গা অপরূপা।

জয়কিষণ বললেন, এসো আমরা ওপরের বারান্দায় বসে গঙ্গার ছবি দেখি।

ওরা দুজনে সিঁড়ি ভেঙে হোটেলের তিন তলার বারান্দায় এসে বসল। প্রায় সারা হোটেল জুড়ে বিরাট ব্যালকনি। চেয়ার সাজান রয়েছে। এখন ভ্রাম্যমানদের মরশুম নয়, তাই এতবড় হোটেলটা প্রায় শূন্য। গঙ্গার ধারে অন্য হোটেলগুলিরও ঐ একই অবস্থা। শুধু সন্ধ্যায় কিছু জনসমাগম হয় গঙ্গা তীরে। পূজো ও দীপ ভাসানোর আয়োজন চলে কিছু সময়। তারপর আটটা সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই গঙ্গা-তীর নিস্তব্ধ। তখন কান পাতলেই জলকল্লোল শোনা যায়। রাত যত বাড়তে থাকে গঙ্গার জলধ্বনি তত সোচ্চার হয়ে ওঠে। তখন আর কান পাতবার দরকার হয় না, আপনি শব্দগুলো কানে

এসে বাজে। ঘরের ভেতরে থাকলেও একটা ধ্বনি সারা চরাচরে মন্ত্রের মত উচ্চারিত হতে শোনা যায়। শিবভূমিতে শিবজায়া গঙ্গার কলকণ্ঠ এমনি করে নিরন্তর বাজতে থাকে।

জয়কিষণ নীরবতা ভেঙে বললেন, খুব ছোটবেলা থেকে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে আমি হরিদ্বারে আসতাম। সকলে যখন নানা ধরণের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে মেতে থাকত তখন আমি দস্যুবৃত্তি করে বেড়াতাম।

প্রেমা বলল, কিশোর জয়কিষণের দস্যুবৃত্তিটা কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে করছে।

জয়কিষণ বললেন, কিছু আগে গঙ্গায় সাঁতার কাটার কথা বলছিলাম না? ঐ ভয়াবহ ব্যাপারটা আমার সেই সময়েই শেখা। সাঁতার জানার সঙ্গে হরিদ্বারের গঙ্গায় সাঁতার দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু এক নয়।

প্রেমা বলল, সে তো স্রোতের ভয়ঙ্কর টান দেখলেই বোঝা যায়।

জয়কিষণ বললেন, তখন বয়েস আমার বার তেরর বেশী নয়। একদিন এ অঞ্চলের ছেলেদের সঙ্গে অভিভাবকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নামলাম জলে। জলে নামা তো এতদিন চলছিল লোহার শেকল ধরে। স্নানার্থীরা যেমন শেকল ধরে নামে। কিন্তু এ হল একেবারে আলাদা কায়দায় নামা। দারুণ দুঃসাহসী খেলা। কে প্রথম এই ভয়াবহ সাঁতার শুরু করেছিল তা কারো জানা নেই, তবে তারপর থেকে ব্যাপারটা চলে আসছে।

প্রেমা ভীতু চোখে তাকিয়ে বলল, যে প্রবল স্রোতের টান তাতে একবার গা ভাসানো মাত্র মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। তুমি কেমন করে এই স্রোতে গা ভাসালে তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।

জয়কিষণ হেসে বললেন, ঐ বয়েসে ছেলেমেয়েরা একটু বেপরোয়াই হয়। এক প্রায় নির্জন দুপুরে মা বাবারা গাড়ী করে গেছেন সপ্তধারার মন্দিরে পুজো দিতে। আমি রয়েছি পরিচারকদের হেফাজতে। গরমের দুপুরে আমাকে ঘরের ভেতর শুইয়ে দিয়ে ওরা বাইরে একটুখানি গড়িয়ে আরাম করছে। আমি পেছনের দরজা খুলে চুপি চুপি নেমে গেলাম। বাজারে দু চারজন সাঁতারু সঙ্গীসাথী খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। মনের ইচ্ছেটা জানাতেই ওরা রাজী হয়ে গেল। সবাই মিলে চলে এলাম গঙ্গার ঘাটে।

ওরা জলে নামার আগে প্রথম পাঠ দিয়ে বলল, ভয় পাবে না কিছুতেই। বলল, প্রথমে পা ঠেকাবে জলের তলায়। তারপর পাখির মত ডানা ভাসিয়ে উড়বে। মাঝে মাঝে জলের তলায় পা ঠেকাবে আবার ভেসে যাবে। এ

কাজটা মনের দারুণ একটা ইচ্ছা-শক্তির সঙ্গে চলতে থাকবে। তবেই এই ঝড়ের মত স্রোতে গা ভাসান সম্ভব।

ওরা দু-তিনজন নেমে পড়ল জলে। আমিও ওদের দেখাদেখি নামলাম। মনে আমার চিরদিনই দারুণ সাহস। ওদের দেখাদেখি আমিও সাঁতার শুরু করে দিলাম। মাঝে মাঝে পা ঠেকান আর স্রোতে ভেসে চলা। একটা মিনিটও কাটল না, বোধকরি মাইল দুয়েক পার হয়ে গেলাম।

প্রেমা যেন সামনেই সাঁতার দেখছে। সে বলল, গঙ্গা কি গভীর নয়? পা ঠেকালে কেমন করে?

জয়কিষণ বললেন, এখানে গঙ্গা অগভীর। জায়গায় জায়গায় পা রাখা যায়।

প্রেমা বলল, তুমি সত্যি দুঃসাহসী।

এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছি প্রেমা। তরুণ বয়সে এক মজার কাণ্ড করেছিলাম। এক বন্ধুকে বলেছিলাম, সে যদি ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমাকে হারাতে পারে তাহলে লালসিয়া স্টেটের মালিকানা যেদিন পাব সেদিনই ওকে দান করে দেব। বন্ধুরা জানত কথার খেলাপ আমার কোনদিনই হবে না।

প্রেমা বলল, তুমি যে হারনি তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

জয়কিষণ বললেন, যে বন্ধু বাজী ধরেছিল সে কিন্তু সামান্য ঘোড়সওয়ার ছিল না।

প্রেমা বলল, ঘোড়দৌড়টা কিভাবে হল?

জয়কিষণ বললেন, দূরপাল্লার দৌড়। লালসিয়া থেকে একেবারে মুসৌরীর লালটিব্বায় আমার কোয়ার্টারে।

এত দূরে!

হাঁ প্রেমা। বাঁধা রাস্তার বাইরেও আমাকে ঘোড়া চালাতে হয়েছে। অনেক বিপজ্জনক সর্টকাট পেরিয়ে গেছি।

প্রেমা বিস্ময়ের গলায় বলল, তুমি অসাধারণ।

জয়কিষণ বলল, সব বিষয়েই আমি জয়ী হব এমনি একটা ধারণা ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে বাসা বেঁধেছিল।

প্রেমা বলল, তাই তো বলছি তুমি অসাধারণ হয়েই জন্মেছ।

জয়কিষণ লজ্জিত হলেন। বললেন, এমন করে বল না প্রেমা। আমি একেবারে সাধারণের দলে। তবে বুকে আমার এক ধরনের দুর্জয় সাহস আছে যার জোরে কোনকিছুই আমি তোয়াক্কা করি না।

প্রেমা আগের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলল, তোমার বন্ধুটি বাজীতে হেরে গিয়ে তোমাকে কি কমপ্লিমেণ্ট দিয়েছিল ?

জয়কিষণ বললেন, ঘটনার পরিণতি দুঃখজনক।

কি রকম ?

জয়কিষণ বললেন, লালটিব্বায় পৌছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করার পরও যখন বন্ধু পৌছল না তখন ঘোড়া নিয়েই নামলাম ওর খোঁজে। কিছুদূর নেমেই পাহাড়ীদের মুখে খবর পেলাম একটি ঘোড়সওয়ার ঘোড়া সুদ্ধ জখম হয়েছে।

ছুটে গেলাম স্পটে। ঘোড়াটা কিছুক্ষণের ভেতরেই মারা গেছে। বন্ধু ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় আশ্চর্যভাবে একটা গাছে পা আটকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে।

ওকে হাসপাতালে পৌছে দিলাম। তিন চার মাস পরে একটা পা খুইয়ে ও বাঁচল। ও এখনও বেঁচে আছে। আর অনেক দূর থেকে মাসে অন্ততঃ একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

প্রেমা বলল, ও বেচারা কষ্ট করে আসে, তুমি যাও না ?

জয়কিষণ বললেন, গাড়ীর পথ নয়, ঘোড়ার পথ। তাই আমি ঘোড়া নিয়ে কোনদিন আর যেতে পারি না। পাছে ওর মনে পুরোনো দুঃখটা জেগে ওঠে।

এরপর আর কোন কথা হল না। দুজনে কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

দূরের কোন পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে ঝকঝকে চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। প্রেমা আর জয়কিষণ পাশাপাশি বসে। জয়কিষণ তাকিয়ে আছেন চাঁদের দিকে। পূর্ণ যৌবনবতী হতে এখনও চাঁদের কয়েকটি কলা বাকী। মনে পড়ছে জয়কিষণের মধুবন্তীর কথা। ঠিক এইখানে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকত মধুবন্তী।

জয়কিষণ বলতেন, কি দেখছ এমন চাঁদের দিকে চেয়ে ?

মধুবন্তী বলত, কত পুরোনো চাঁদ, তবু দেখতে কত ভাল লাগে। আমার কি মনে হয় জান ?

কি ?

অসংখ্য মানুষের ভালবাসার দৃষ্টি পড়ে ও একেবারে ভালবাসার প্রতিমা হয়ে গেছে।

জয়কিষণ হেসে বলতেন, আমাদের ভালবাসাও ওর সঙ্গে যুক্ত হল !

প্রেমা গঙ্গায় ছুটে চলা তারা-ফুলের ওপর থেকে চোখ তুলে নিয়ে জয়কিষণের মুখের ওপর রেখে বলল, কি ভাবছ?

তেমন কিছু না।

আমি বলব?

বল।

স্ত্রীর কথা।

জয়কিষণ খানিক অবাকই হলেন। বললেন, কি করে অনুমান করলে?

প্রেমা বলল, অতি সহজ স্বাভাবিক অনুমান। এজন্যে চিন্তা করারও দরকার হয় না। প্রতি বছর তুমি তাঁকে নিয়ে আসতে এখানে। দুজনে এই ব্যালকনিতে বসতে। গঙ্গায় আলোর ভেসে চলা মালা দেখতে। আজ নিঃসঙ্গ এসে তাঁর কথা মনে না করে পারবে কি করে।

জয়কিষণ ম্লান হেসে বললেন, নিঃসঙ্গ এসেছি ক'বছর। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমি সঙ্গীহারা নই প্রেমা।

প্রেমা বলল, বাইরের দিক থেকে দেখলে হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু তোমার মনের মধ্যে যে শূন্যতা তাকে ভরানোর ক্ষমতা এই মুহূর্তে কারো আছে বলে আমার মনে হয় না।

জয়কিষণ প্রেমার এই ধারণাকে ভেঙে দেবার মত কোন যুক্তি বা শক্তি পেলেন না। তিনি বেশ কিছুক্ষণ তাই চুপ করে রইলেন।

গঙ্গার জলের শব্দ বেজে উঠছে একদল নর্তকীর ছুটে চলার মত।

জয়কিষণ এক সময় বললেন, তোমার কথাই ঠিক প্রেমা। জীবনে কখনো একজনের শূন্যতা অন্যজনে ভরে দিতে পারে না। মনের মধ্যে প্রত্যেকের আসন আলাদা। বরণ অভ্যর্থনার পদ্ধতিও আলাদা।

প্রেমা বলল, আমার বোধহয় তোমার সঙ্গে আসাটা ঠিক হয়নি।

একথা কেন প্রেমা?

এই গঙ্গাতীরে যে স্মরণীয় মুহূর্তগুলো তোমার কেটেছে তাকে একান্তে পাওয়া আর তেমন করে হয়ে উঠল না। আমি না থাকলে তোমার পুরোনো স্মৃতিগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

দেয়ালগিরির হাল্কা সবুজ আলোয় হাসলেন জয়কিষণ। বললেন, এমনও তো হতে পারে, তুমি এসেছ বলে মধুবন্তীর কথা আমার আজ বেশী করে মনে পড়ছে।

প্রেমাও মিষ্টি করে হাসল। বলল, তা কি করে হয়।

জয়কিষণ তদ্গত হলেন। বললেন, আমি ঠিকই বলছি প্রেমা। একা যখন আসতাম তখন আনুষ্ঠানিক কাজগুলো সেরে নিয়ে পালাতে পারলেই যেন বাঁচতাম। মধুবন্তীর কথা বেশী ভাবতে চাইতাম না। একে বলতে পার নিজের কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা। কিন্তু আজ তুমি কাছে আছ বলেই হয়ত ওর কথা বেশী করে মনে পড়ছে।

প্রেমা এই মুহূর্তে জয়কিষণের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে গঙ্গার দিকে ফিরে তাকাল। গঙ্গা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওপারের আবছায়ায় কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো স্থির হয়ে তারই মত গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। জলে জয়কিষণের স্মৃতির মত ভাঙা ভাঙা চাঁদগুলো ডোবাভাসার খেলা খেলছে।

জয়কিষণ বললেন, কাল একবার হৃষিকেশ থেকে ঘুরে আসব প্রেমা।

আমাকে সঙ্গী করবে তো?

সে কি কথা। সঙ্গে এসেছ আর তোমাকে একা হোটেলে ফেলে রেখে যাব ভেবেছ?

না। ভাবলাম হয়ত অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কাজে যাবে।

তেমন কোন কাজ সেখানে নেই। আর থাকলেও তোমাকে না নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রেমা বলল, আমার খুব ভাল লাগছে গঙ্গা। আমি নদীর দেশের মেয়ে হলেও গঙ্গাকে এক বুক ভালবেসে ফেলেছি।

জয়কিষণ বললেন, গঙ্গা সত্যিই অনন্যা। আমি ওর উৎসমুখ গঙ্গোত্রী থেকে সঙ্গমক্ষেত্র গঙ্গাসাগর অব্দি ঘুরে এসেছি। এর বৈচিত্র্যের তুলনা হয় না প্রেমা।

প্রেমার মনে হল একটা স্বপ্ন যেন ধীরে ধীরে বাস্তবে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে আর সে দেখছে তাকে রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে।

কিছুক্ষণ প্রেমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জয়কিষণ বললেন, কি ভাবছ প্রেমা?

চমকে উঠে প্রেমা আবার স্থির হল। বলল, আমার এক বন্ধু আমাকে একটা ব্যালে গ্রুপ তৈরী করতে বলেছিলেন। আমার মনে সেটা স্বপ্ন হয়ে ছিল এতকাল। এখন গঙ্গাকে দেখে সে স্বপ্নের একটা বাস্তব রূপ দেখতে পাচ্ছি আমি।

জয়কিষণ বললেন, তুমি ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট প্রেমা। তোমার পক্ষে যে কোন নতুন জিনিস তীব্র মানসিক প্রেরণায় সৃষ্টি করা সম্ভব। এ বিষয়ে গঙ্গা

নিঃসন্দেহে তোমাকে প্রেরণা দেবে। কারণ গঙ্গা একদিকে হিমবন্ত আর অন্যদিকে সাগর ছুঁয়ে আছে। বহু বিচিত্র জনপদের বুক ছুঁয়ে বয়ে এসেছে গঙ্গা। তাই তোমার প্রেরণাকে গঙ্গা যে উদ্দীপ্ত করবে তাতে সন্দেহ কি।

প্রেমা বলল, যে মুহূর্তে আমি গঙ্গাকে দেখেছি সেই মুহূর্তটি থেকে আমার রক্তে গঙ্গা, আমার ছন্দে গঙ্গা এসে গেছে। সারা ভারতের একটা রূপ নাচের ছন্দে আমি গঙ্গার পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাই।

অসাধারণ পরিকল্পনা তোমার।

সত্যি বলছ জয়কিষণ!

তোমার ক্ষমতার ওপর অগাধ আস্থা আমার প্রেমা। যে কোন সাহায্য, তা যত ক্ষুদ্রই হোক আমি করতে পারলে খুশী হব।

প্রেমা উচ্ছ্বসিত আবেগে হাত বাড়িয়ে দিল। জয়কিষণ সে হাত তাঁর দুটো হাতের ভেতর ধরলেন। সহসা ছেড়ে দিলেন না।

কতক্ষণ এমনি হাতে হাত রেখে বসে রইল দুজনে। তাদের ঘিরে নর্তকী গঙ্গা নূপুর বাজিয়ে চলল।

হৃষিকেশের গঙ্গা বিরাট বিরাট বোল্ডারে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে চলেছে। লছমনঝোলার পুলের ওপর দাঁড়িয়ে জয়কিষণ বললেন, বদ্রীনাথ যাবার হাঁটাপথ ধরে একটুখানি এগোলেই এক সাধুর গুহা। যাবে প্রেমা সেখানে?

প্রেমার গলায় আগ্রহ উছলে উঠল, যাব মানে? এক্ষুনি আমি তৈরী।

জয়কিষণ বললেন, তোমাকে কোন কথা বলাও বিপদ।

কেন, কি করেছি আমি?

তোমার অন্তহীন আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই মুশকিল।

প্রেমা বলল, তাহলে থাক। তোমাকে নানা ব্যাপারে বিরক্ত করার জন্যে বিশেষ দুঃখিত।

প্রেমা আবার চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট নীচে গঙ্গার ওপর চোখ নামিয়ে দেখতে লাগল।

জয়কিষণ বললেন, একটুতেই তোমার অভিমান প্রেমা। আমি বলতে চাইছিলাম দুপুরে কিছু খেয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে বেরোব। ওপথে তো গাড়ী চলে না। হোটেলে গাড়ী রেখে তবে আমাদের আসতে হবে।

প্রেমা মূর্তি কিন্তু অবুঝ নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোমার কথাই ঠিক

জয়কিষণ। কিছু খেয়ে নিয়েই আমরা বেরোব সাধু দর্শনে, নইলে ফিরতে ফিরতে কত বেলা হয়ে যাবে কে জানে।

দুপুর দুটো তখন। ওরা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার এল ব্রীজের ওপর। একই দৃশ্য। একই ভঙ্গীতে গঙ্গার ধেয়ে চলা। অমসৃণ শিলা স্রোতের ধাক্কায় মসৃণ পিচ্ছল হচ্ছে। ছোট বড় নানা ভঙ্গীর নানা রূপের শিলাখণ্ডগুলো বৃহৎ সংসার রচনা করে বসে আছে। কেউ কেউ স্নান করছে স্রোতোধারায়। কেউবা স্নান সেরে তীরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ব্রীজটা পেরিয়ে এল। এখন ওরা ডানদিকে গীতা ভবনের পথ ছেড়ে উল্টোদিকের পথ ধরল। পাহাড় ভেঙে উঠছে ওরা। প্রেমার কেরলীয় পোশাক পাহাড়ে চড়ার উপযুক্ত নয়। তাই বারে বারে পোশাক সামলে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠতে গিয়ে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে প্রেমাকে। জয়কিষণ কিছুটা চড়াই ভেঙে উঠে গিয়ে আবার ফিরে আসছেন প্রেমাকে সাহায্য করার জন্যে। হাত বাড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে টেনে তুলছেন আর অমনি নূপুর বাজান হাসি উপহার দিচ্ছে প্রেমা জয়কিষণকে।

ওরা খানিক ওপরে উঠেই পাকদণ্ডীর পথ ধরল। জয়কিষণ চলেছেন আগে আগে। প্রেমা চলেছে তাঁর পায়ের গতির দিকে চোখ রেখে।

একসময় ওরা এসে পৌছল একটা অতি নির্জন পাহাড়ী এলাকায়। কি যেন একটা গাছ বড় বড় ডালপাতা শূন্যে ছড়িয়ে একপদ সন্ন্যাসীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঋতু বসন্তের সোনালী উত্তরীয় সারা ভ্যালি জুড়ে উড়ছে। তারই একটি প্রান্ত গাছের তলায় বিছান।

জয়কিষণ বললেন, তুমি এই গাছের ছায়ায় দাঁড়াও প্রেমা। আমি এখুনি খোঁজ নিয়ে আসছি উনি আছেন কিনা।

প্রেমা বলল, আছেন মানে? উনি কি অন্য কোথাও চলে যান নাকি?

জয়কিষণ যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার ফিরলেন। বললেন, আমাদের সাধু সম্বন্ধে যে সব ধারণা আছে ওঁকে কিন্তু সে ধরনের সাধু ভাবলে ভুল করা হবে।

তবে?

জয়কিষণ সহসা কোন ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না অথবা সেই মুহূর্তে দিতে চাইলেন না। শুধু বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে, কথাবার্তা বললে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

একটু থেমে আবার বললেন, পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে উনি ভালবাসতেন। হিমালয়ের সঙ্গে ওঁর প্রাণের যোগ।

প্রেমা বলল, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

জয়কিষণ বললেন, এই টিলার ওপারে বেশ ঢালু একটা উৎরাই। খুব সাবধানে খানিকটা নামলেই সাধুর গুহা। কষ্ট করতে রাজী থাক তো এস আমার সঙ্গে। পরে সাধু দর্শন না হলে আমার ওপর রাগ কর না যেন।

প্রেমা বলল, আমার জন্যে অন্য একজন কষ্ট করবে তার চেয়ে তার কষ্টের অংশ নেওয়া অনেক সোজা।

ওরা একটুখানি ওপরে উঠে টিলার ওপারে নামতে লাগল। বার বার উৎরাই-এর পথে প্রেমাকে সাবধান করে দিতে লাগলেন জয়কিষণ।

এপারে হাওয়ার বেগ বেশী। একবার প্রেমা তাকিয়েছিল একপলক। একটা আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠেছিল তার চোখের ওপর। ওপারে সবুজ অরণ্যে ছাওয়া পাহাড়। এপারে গীতাভবনের মন্দির চূড়া। মাঝে প্রবাহিনী গঙ্গা। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, গাছগাছালির ফাঁকে ওপারের ছবি স্পষ্ট দেখা গেলেও এপারের কোন মানুষজনের গতিবিধি ওপার থেকে লক্ষ্য করা সম্ভব নয়।

ওরা দাঁড়াল একটি গুহার সামনে। একে গুহা বলা যায় কিনা সন্দেহ। গুহার বাঁদিকে একটি খাড়া পাথর দাঁড়িয়ে। ঐ পাথর গুহাটিকে লোকচক্ষুর একেবারে আড়াল করে রেখেছে। সামনে একখণ্ড মসৃণ শিলা। তাকে ঘিরে কিছু গাছপালা। গুহার সামনে একটি চৌকো পাথর গুহা মুখের প্রবেশ পথটিকে আড়াল করে রেখেছে। পাশ দিয়ে সংকীর্ণ একটি পথে ঢুকতে হয়। গুহার প্রবেশ পথের মাথায় কতকগুলি ফোকর। সম্ভবত আলো হাওয়া প্রবেশের পথ। প্রয়োজন মত কেটে কেউ যেন তৈরী করেছে।

জয়কিষণ গুহা মুখে দাঁড়িয়ে বার কয়েক সাধুর নাম ধরে ডাক দিলেন। কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। জয়কিষণ রুদ্ধদ্বার শিলার পাশ দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে গেলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে রইল প্রেমা।

বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পর প্রেমার প্রতীক্ষাকাতর চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন জয়কিষণ।

বললেন, সাধু শ্রীধর শর্মাজী বাইরে কোথায় গেছেন। কিন্তু একটি চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

জয়কিষণ হাতে ধরে থাকা চিঠিখানা প্রেমার দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রেমা

বলল, আমি তো হিন্দি পড়তে জানি না জয়কিষণ। তবে বুঝতে পারি, বলতেও পারি কিছু কিছু। তুমি পড়ে শোনাও। আর আমি অবাক হচ্ছি, তিনি কি করে জানলেন তোমার হৃষিকেশে আসার খবর? তুমি কি চিঠি পাঠিয়েছিলে আমার আগে?

জয়কিষণ হাসলেন। বললেন, চিঠি পড়লেই সব বুঝতে পারবে।

জয়কিষণ চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন।

প্রিয় জয়কিষণ

তোমাকে আজ সকালে লছমনঝোলা পুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কয়েক বছর তোমাদের কাউকে দেখিনি। কিন্তু আমি জরুরী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি। অপেক্ষা করে থাকা চলল না। তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব। আমি এই ভেবে চিঠি লিখলাম যে তুমি যখন এসেছ হৃষিকেশে তখন একবার আসবে আমার আস্তানায়। যদি একান্তই ফিরতে দেরী হয় তাহলে হিমালয়ের দেবতার কাছে তোমাদের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে গেলাম।

তোমাদের শুভার্থী শ্রীধর শর্মা।

প্রেমা বলল, তুমি কি ফিরে যেতে চাও এক্ষুনি?

তোমার কি ইচ্ছে?

এতদূর যখন পাহাড় ভেঙে এলাম তখন খানিক অপেক্ষা করাই যাক না। সাধুর ডেরায় আসাও তো একটা পুণ্যের ব্যাপার।

জয়কিষণ প্রেমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, বেশ তাই হবে। আচ্ছা প্রেমা, পাপ পুণ্য সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম?

প্রেমা একটুও না ভেবে বলল, খাঁটি কথা যদি বলতে হয় তাহলে প্রচলিত পাপ পুণ্যের ধারণার সঙ্গে আমার মিল বড় কম!

যেমন?

প্রেমা অমনি বলল, এই যেমন ভোগের ভেতর থাকা পাপ আর ইন্দ্রিয় শাসন একমাত্র পুণ্য কর্ম।

জয়কিষণ বললেন, কথাটা ঠিক তা নয়। আমাদের সনাতন শিক্ষা হল কোন কিছুর অতিরিক্তটাই পাপ।

প্রেমা হেসে বলল, ঐ যেমন গঙ্গা বইছে তার স্বাভাবিক প্রবাহে, জীবনও বয়ে চলবে তার একেবারে স্বভাবধর্মে। খিদের অতিরিক্ত খেতে গেলে

যেমন প্রবৃত্তির কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদ ওঠে, ইন্দ্রিয় ভোগের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে। এটা কাউকে বলে দিতে হবে না। মানুষের স্বভাবধর্ম আর অভিজ্ঞতা তাকে অতিরিক্তের হাত থেকে রক্ষা করবে।

জয়কিষণ বললেন, তোমার কথার ভেতর অদ্ভুত একটা জোর আছে প্রেমা। সেই জোরেই তুমি নদীর মত স্বাভাবিক খাতে বয়ে যাও।

প্রেমা নিজের প্রশংসায় খুশী হল কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে বলল, যদিও এটা সাধুর পুণ্যভূমি তবুও পাপ-পুণ্যের আলোচনা চালাতে আর মন চাইছে না। তার চেয়ে চল শর্মাজীর গুহার ভেতরটা ঢুকে দেখি।

জয়কিষণ আগে আগে ঢুকলেন। প্রেমা ঢুকবার জন্যে মাথা নীচু করে থমকে থেমে গিয়ে বলল, সাধুর গুহায় মেয়েদের ঢোকার বারণ নেই তো?

ভেতর থেকে জয়কিষণ বললেন, আগেই তো বলেছি শর্মাজী সে ধরনের সাধু নন।

প্রেমা মাথা নীচু করে ঢুকে পড়ল গুহার ভেতর।

দেখা গেল গুহাটির পরিসর খুব একটা সংকীর্ণ নয়। দাঁড়ালে জয়কিষণের মাথা ছাদে ঠেকে গেলেও প্রেমা সচ্ছন্দে মাথা উঁচিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারে। দুজনের থাকার পক্ষে স্থানটি প্রশস্ত না হলেও একেবারে সংকীর্ণ নয়।

গুহার বাইরে হাওয়ায় যে ঠাণ্ডা আমেজ ছিল তা ভেতরে আরামদায়ক উষ্ণ অভ্যর্থনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাইরের আলো ওপরের কটি ছিদ্র পথে গুহার ভেতর এসে পড়লেও এতখানি গুহাকে আলোয় ভরে দিতে পারেনি। একটি প্রদীপ তাই গুহাটির এক প্রান্তের কোণে জ্বলছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে স্তূপীকৃত কতকগুলি বই আর খাতা। ঠিক উল্টো প্রান্তে বাইরের আবছা আলোয় একটি স্টোভ আর দু-চারটি পাত্র পড়ে। অন্য কোণে গেরুয়া রঙে ছোপান কটি পোশাক পাট করা কম্বলের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে।

জয়কিষণ মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়েছিলেন। তাঁর পক্ষে বেশীক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রেমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। এবার সেও বসে পড়ে জয়কিষণের দিকে চেয়ে একটু হাসল। জয়কিষণ হাসিতে তার উত্তর দিল।

প্রেমা প্রথম কথা বলল, প্রদীপটা উনি জ্বালিয়ে রেখে গেছেন চিঠিখানা তোমার চোখে পড়বে বলে।

জয়কিষণের সংক্ষিপ্ত উত্তর, মনে হয়।

প্রেমার গলায় কৌতূহল, আচ্ছা জয়কিষণ, গুহায় থাকেন অথচ বইখাতা, রান্নার বিশেষ উপকরণ, এ কি ধরনের সন্ন্যাস?

জয়কিষণ বললেন, আমি সতের বছর বয়েসে বাবার সঙ্গে প্রথম এসে এঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই থেকে এদিকে এলেই ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। প্রথম যেদিন ওঁকে দেখেছিলাম সেদিন শুধু ওঁর দিকে সারাক্ষণ চেয়েইছিলাম। এমন আকর্ষণীয় রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি।

প্রেমা হঠাৎ মন্তব্য করল, তোমার চেয়েও?

জয়কিষণ বললেন, যারা লালসিন্না স্টেটের কুমারবাহাদুরকে রূপবান বলে বারে বারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, জয়কিষণের ভাগ্য ভাল যে তাঁরা কেউ এসে শর্মাজীকে দেখে যাননি। তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি মুহূর্তে মত বদল হয়ে যেত।

এখন ওঁর বয়স কত হবে জয়কিষণ?

আন্দাজ ষাট-বাষট্টি। কিন্তু তুমি বুঝতেই পারবে না। হাঁটা চলা হাসি ঠাট্টা কথাবার্তা সবই বিশ বছরের তরুণের মত।

শেষ কবে তোমার সঙ্গে দেখা?

জয়কিষণ বললেন, মধুবন্তীর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে।

প্রেমার আবার প্রশ্ন, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি ওঁর দেখা হয়েছে কোনদিন?

জয়কিষণ বললেন, আমি আর মধুবন্তী শেষবার একসঙ্গেই এসেছিলাম।

হঠাৎ জয়কিষণ শর্মাজীর চিঠিখানা অস্পষ্ট আলোয় চোখের অনেক কাছে নিয়ে গভীর আগ্রহে কি যেন দেখতে লাগলেন। কিছু পরে চিঠিখানা কোলের ওপর ফেলে রেখে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। প্রেমা জয়কিষণের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করল। সে ইচ্ছে থাকলেও কোনরকম প্রশ্ন করে জয়কিষণকে বিরক্ত করতে চাইল না।

একসময় জয়কিষণ বললেন, জান প্রেমা, সাধুরা আগের থেকে অনেক কিছুই অনুমান করতে পারেন।

শুনেছি।

জয়কিষণ কিছুটা যেন উত্তেজিত হলেন, শুনেছি নয় একেবারে খাটি সত্যি।

কোলের ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে প্রেমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, চিঠির ভেতর একটা লাইন বেশ ভাল করে কাটা দেখতে পাচ্ছ?

প্রেমা ঝুঁকে পড়ে দেখল সত্যিই তাই।

বলল, দেখছি কিন্তু কি লেখা ছিল ওতে?

জয়কিষণ চিঠির দিকে চেয়ে বললেন, এই কাটা অংশটাতে উনি লিখেছিলেন, মনে হয় মধুবন্তী তোমার সঙ্গে এসেছে।

প্রেমা বলল, তাতে কি বোঝাল?

জয়কিষণ বললেন, কেটে দেওয়াতে অনেক কিছুই বোঝাল।

প্রেমা বলল, এমন কিছুই বোঝায় না। প্রথমে আমাকে দূর থেকে দেখে মধুবন্তী বলেই ভেবেছিলেন। পরে মনে হয়েছে অন্য কেউ হতে পারে। তাই লাইনটা লিখেও কেটে দিয়েছেন।

হাসলেন জয়কিষণ। বললেন, না ব্যাপারটার সমাধান এত সহজে হবে না প্রেমা।

আমার তো তাই মনে হয়েছিল।

জয়কিষণ বাধা দিয়ে বললেন, শোন, আমি আর মধুবন্তী শেষবার যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করি তখন উনি ওঁর জীবনের অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। দারুণ ইণ্টারেস্টিং সে সব গল্প। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম উনি গল্পের মাঝে মাঝে আচমকা থেমে গিয়ে মধুবন্তীর মুখের দিকে অর্থভরা চোখ মেলে তাকাচ্ছিলেন। যেন মধুবন্তীর অন্তর্জীবনকে একসঙ্গে আইতে দেখে নিচ্ছিলেন।

যাবার সময় হলে মধুবন্তী যখন পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল তখন উনি দুহাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে সরে দাঁড়ালেন। বললেন, বড় মহৎ তোমার হৃদয় মধুবন্তী। তবে মনে হয় আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, একথা কেন বলছেন?

হঠাৎ একটা বিষণ্ণ করুণ হাসি মুখে ফুটে উঠল। বললেন, ওপরওয়ালার ডাক কখন এসে পড়ে তার কি কোন স্থির আছে।

আমি ফেরার পথে ভেবেছিলাম শর্মাজী নিজের জীবনের দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে লঘুভাবে হয়ত কথাটা বলেছেন। কিন্তু এখন বুঝছি তিনি মধুবন্তীর মুখে সুস্পষ্ট মৃত্যুর ছায়া দেখেছিলেন।

প্রেমা বলল, আশ্চর্য!

জয়কিষণ বললেন, দূর থেকে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখে শর্মাজীর নিশ্চয় ভ্রম হয়েছিল। তাই তিনি মধুবন্তীর কথা লিখেও ছিলেন। কিন্তু একটু চিন্তা করে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর গণনায় ভুল নেই। তাই ঐ ছত্রটিকে কালি বুলিয়ে অস্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন।

প্রেমা বলল, এখন মনে হচ্ছে এটাই সম্ভব।

জয়কিষণ বললেন, অথচ দেখ, উনি আনন্দময় একটি মানুষ। সাধনভজন বড় একটা করেন বলে মনে হয় না। মানুষের উপকার করেই বেড়ান।

প্রেমা বলল, উনি যে চিঠিতে লিখেছেন জরুরী কাজে বেরুলেন, কিছু কাজ কি উনি করেন?

জয়কিষণ বললেন, সে অনেক কথা। আসলে উনি ছিলেন বোটানির প্রফেসার। তারপর হিমালয়ে বেড়াতে এসে হিমালয়ের প্রেমে পড়ে যান। শুধু হিমালয় নয় একটি হিমালয় কন্যাও ওঁর হৃদয় হরণ করে। সেকথা থাক। সে অন্য কাহিনী। কিন্তু উনি আর হিমালয় ছেড়ে নীচে নামেননি। অবশ্য ওঁর মা-বাবা না থাকায় পেছনের টানও কিছু ছিল না।

উনি এখানে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত ফাবমাকোলজিস্টের কাজ শুরু করে দেন। এক ওষুধ কোম্পানীব সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ভ্রমণ করে দুষ্প্রাপ্য গাছগাছালি সংগ্রহ করতে থাকেন। এব থেকে যা রোজগার হত সবই খরচ করতেন পাহাড়ীদের সেবায়।

প্রেমা বলল, এখনও কি উনি ঐ কাজ করেন?

না, তবে পাহাড়ী যুবকদের নিয়ে একটি দল তৈরী করে তাদের হিমালয়ের গাছ-গাছালি লতাপাতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কবে তুলেছেন। ওঁর নির্দেশ নিয়ে তারাই এখন সব কাজ করছে।

প্রেমা হাঁটুতে মুখ গুঁজে জয়কিষণের মুখের ওপর চোখ রেখে কথাগুলো শুনছিল। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, কিন্তু উনি মানুষেব জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে এমন ভবিষ্যৎবাণী করতে পারলেন কি করে? উনি তো কর্মী মানুষ। সাধু সন্তের মত ধ্যানধারণা করে অসাধারণ কোন ক্ষমতা কি লাভ করেছিলেন?

জয়কিষণ বললেন, নিরাসক্ত কর্মী উনি। মানুষের কল্যাণের কথা যিনি সর্বদা ভাবেন তাঁর দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ, অনেক গভীর। যথার্থ সাধু তাঁরাই। শর্মাজী হয়ত নিজেকে সবার জন্যে বিলিয়ে দিয়ে দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন।

প্রেমা বলল, ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া একটা আশ্চর্য ক্ষমতা।

জয়কিষণ হেসে বললেন, সাধনার পথে যাঁরা এগিয়ে যান তাঁদের কাছে এটি কোন ক্ষমতাই নয়। তাঁরা এসব নিয়ে কোন চর্চাও করেন না। হঠাৎ কোন সময় কোন প্রসঙ্গে তাঁদের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে পড়ে। আমরা তখন অবাক হয়ে যাই।

প্রেমা আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজে চোখের দৃষ্টি গুহার একটি দেয়ালের গায়ে ফেলে বসে রইল। ওখানে ওপরের ফোকর থেকে একটা সাদা আলো এসে

পড়েছিল। বাইরের কোন একটি গাছের ঝিরিঝিরি পাতায় ভরা ডালের ছবি ছায়ারূপ ধরে দুলে দুলে নাচছিল।

প্রেমা মগ্ন হয়ে দেখতে লাগল সে নাচ। প্রকৃতি কি আশ্চর্য নর্তকী! ঘূর্ণির ঘাঘরা পরে প্রবল আবর্তে পাক খেতে খেতে নাচে। ঝর্ণার দ্রুত লয়ে পায়ের কাজ করতে করতে সামনে এগোয়। আবার গাছের পুষ্পিত ডালে মন্থর দুলুনি দিতে দিতে নাচে। সত্যিই প্রকৃতি অনন্য নর্তকী।

হঠাৎ ধ্যান ভেঙে প্রেমা এক সময় উঠে বসে বলল, আচ্ছা শর্মাজী কোন একটি পাহাড়ী মেয়েকে ভালবাসতেন বললে না? কাহিনীটা একটু শোনাবে?

জয়কিষণ বললেন, কাহিনীটা আমার স্বয়ং শর্মাজীর কাছ থেকেই শোনা। আর সেদিন মধুবন্তীও উপস্থিত। বড় একটা ঘরোয়া পরিবেশ তৈরী হয়েছিল সেই দিনটিতে। মধুবন্তীই চেয়েছিল শর্মাজীর জীবনের কথা শুনতে। শর্মাজী যে কত বড় কথক তা সেদিন তাঁর কথা শুনে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছিলাম। বাইরে চলছিল শীতের হাওয়ার হাহাকার। ভেতরে তিনটি প্রাণী বসেছিলাম কাঠের আগুনের সামনে। গল্প বলছিলেন শর্মাজী তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে।

একটু থেমে জয়কিষণ বললেন, আমি তো তাঁর মত করে বলতে পারব না প্রেমা। আর তাছাড়া যাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার তিনিই তা সবচেয়ে সুন্দর করে বলতে পারেন।

প্রেমা অমনি বলল, তাহলে শর্মাজীর কথা থাক তোমার নিজের জীবনের ঐ ধরনের কিছু কাহিনী শোনাও।

জয়কিষণ বললেন, আমার জীবনে বলার মত তেমন কোন ঘটনা নেই প্রেমা।

বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিশ্বাস করা না করা তোমার অভিরুচি।

কি করে বিশ্বাস করতে পারি বল? ভোরবেলা উঠে বিশ্বকর্মা যাকে নিপুণ হাতে নিখুঁতভাবে তৈরী করে স্বর্ণের সোনালী রঙ মাখিয়ে দিয়েছেন, কুবের যার হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর ধনভাণ্ডারের মূল্যবান সব সম্পদ, সে মানুষ অস্পৃশ্য হয়ে রইল রমণী সমাজের কাছে একথা কোন মেয়ে বিশ্বাস করবে জয়কিষণ?

জয়কিষণ হেসে বললেন, উজ্জয়িনীর গুণগ্রাহী রাজা বিক্রমাদিত্যের কালে জন্মালে তিনি নিশ্চিত তোমাকে তাঁর সভাকবি করে নিতেন।

প্রেমা বলল, সে সুযোগ যখন আর নেই তখন একালের লালসিয়া স্টেটের কুমারবাহাদুর তাঁর নাটমণ্ডপের নর্তকী নিযুক্ত করলে ধন্য হই।

হেসে উঠলেন জয়কিষণ। গুহার ভেতর হাসিটা অলৌকিক বলে মনে হল।

হাসি থামলে প্রেমা মুখখানাকে যদ্দূর সম্ভব গম্ভীর করে বলল, হাসছ যে? এদিকে তো জান না, মেয়ের আর্জি পেশ হয়েছে তাকে নাচ শেখাতেই হবে।

জয়কিষণ বললেন, কথা আদায় করে নিয়েছে নিশ্চয়।

বলেছি, গেস্ট হাউসটা আমার জন্যে পারমানেণ্টলি বুক করে রাখতে। আর সপ্তাহে দুদিন করে প্লেনে কেরালা থেকে আমার ভাড়াটা লালসিয়া স্টেট থেকে দেবার ব্যবস্থা করতে।

দোলনের হয়ে তার বাবা প্রস্তাব মঞ্জুর করছে।

প্রেমা বলল, মেয়েকে নাচ শেখানোর আগ্রহ না কুমারবাহাদুরের নিজেরই নাচ দেখার আগ্রহ?

জয়কিষণ হেসে বললেন, দুটোই।

প্রেমা কিছু সময় চুপ করে থেকে অন্য প্রসঙ্গে এল, আমরা আসল কথা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি জয়কিষণ। শর্মাজীর গুহায় বসে তাঁর জীবনের কথাটাই শোনাও। কুমারবাহাদুরের কথা তার প্রাসাদে বসেই শোনা যাবে।

জয়কিষণ বললেন, তরুণ অধ্যাপক শ্রীধর শর্মাজী হিমালয়কে ভালবেসেই প্রতি বছর ছুটি পড়লে চলে আসতেন। এই আসা যাওয়ার পথে পাহাড়ী এক পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ডিসেম্বরের শীতে পথের ধারে জমে যাবার অবস্থা হয়েছিল তাঁর একবার। অসহায়ভাবে ভয়ঙ্কর রাতের দিকে যখন তিনি চেয়েছিলেন তখনই শিউপূজন তাঁকে দেখতে পায়। বলিষ্ঠ শিউপূজন তাঁকে প্রায় কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায় নিজের ডেরায়। সেখানে শিউপূজনের বউ লহরী সারারাত আগুন জ্বেলে তাঁর সেবা করে সুস্থ করে তোলে। সেই থেকে তরুণ শর্মাজী তাজা দুটি পাহাড়ী প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে যান।

শিউপূজন পাহাড়ী এলাকায় গাইডের কাজ করত। কোন পর্বতারোহী দল এলে খোঁজ পড়ত শিউপূজনের। পাহাড়ে চড়তে সে ওস্তাদ। বরফের ওপর কোথায় মরণ-ফাঁদ পাতা আছে সে সম্বন্ধে তার অনুভূতি এমনি তীক্ষ্ণ ছিল যে অভিযাত্রীরা বলত, শিউপূজন হাওয়ায় বিপদের গন্ধ পায়।

বউ লহরী একটা নদী পারাপারের পুলের কাছে পাথরের দেয়াল ঘেরা ছোট কোঠীতে থাকত। যাত্রীদের কাছে সে পকৌড়া বেচত। তার হাসিতে আর চোখের তারায় নাকি এমন যাদু ছিল যে যাত্রীরা দু' দণ্ড লহরীর দোকানের সামনে না বসে পুল পার হতে পারত না।

শিউপূজন তার সোমত্ত বউকে দারুণ ভালবাসত। কিন্তু তার চেয়েও বেশী

ভালবাসত বুঝি হিমালয়কে। তাই কোথাও থেকে ডাক এলেই সে অমনি বউ ফেলে ছুটত। শর্মাজীর ভাষায়, বুকের ভেতর জড়িয়ে নেওয়া বউকে এক পাশে ঝেড়ে ফেলে দিয়েও সে উঠে চলে যেত।

প্রেমা মন্তব্য করল, বউ রাগ করত না?

জয়াকিষণ বললেন, করত বই কি। এক একবার তো শাসিয়েই বলত, এবার পাহাড় থেকে ফিরে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে না।

শিউপূজন হেসে বলত, কেন, কোথায় যাবি? আমাকে ছেড়ে পালাবি নাকি? নতুন ঘর বাঁধবি?

হাতের কাছে যা পেত তাই নিয়ে অমনি তাড়া করত লহরী। শিউপূজন পালিয়ে বাঁচত। অনেক দূর দৌড়ে গিয়ে পিছু ফিরে তাকাত শিউপূজন। লহরী অমনি নদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে দিত। ইঙ্গিতটা, পালাব ওরই গর্ভে।

এসব শর্মাজী নিজের চোখে দেখেছেন। তখন আসা যাওয়ার পথে পরিচয় হয়েছে ওদের সঙ্গে। বন্ধুত্বও জমে উঠেছে। অতিথি হয়ে ওদের সঙ্গে গাদাগাদি থেকে ঐ কোঠীতেই কাটিয়েছেন কয়েক রাত।

শর্মাজী আর লহরীর ভেতর দিনে দিনে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ গড়ে উঠল। কিন্তু কেউ পারল না পরস্পরের কাছাকাছি যেতে। শিউপূজনের আকাশের মত খোলা মন, ভোরের রোদের মত উপভোগ্য হাসি ওদের মিলনে বাধা হয়ে রইল। শর্মাজী নির্জন কোন মুহূর্তে লহরীর দিকে এগোতে চাইলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত একটা মানুষ। পাহাড়ে উঠতে উঠতে বার বার ফিরে ফিরে চাইছে। হাত তুলে যেন শর্মাজীর দিকে একমুখ অনাবিল হাসি উপহার দিচ্ছে। সংশয়ের ছায়া নেই চোখে। সন্দেহের কাঁপুনি নেই মনে।

এই ছবি দেখার পরে শর্মাজীর সংস্কৃত মন আর এগোতে পারত না। কত জ্যোৎস্না ঝরা রাত শুধু নদীর নিজন পুলের ওপর বসে লহরীর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিতেন।

মাঝে মাঝে কানে বাজত শিউপূজনের একটা কথা, ভাইসাহেব তুমি আমার দোস্ত। তোমার জিম্মায় আমার লহরীকে রেখে গেলাম।

এরপর আর কথা চলে না। যৌবনের অশ্ব উদ্দাম হলেই কড়া চাবুক লাগাতেন। এদিকে শর্মাজী কঠিন পাথরের মত যত বেশী সংযম দেখাতেন পাহাড়ী নদীর মত তত বেশী দুরন্ত আবেগে আছড়ে পড়ত লহরী। খিলখিল হাসি উপহার দিত। সামান্য কথায় অভিমানে ফেনার মত ফুঁসতো।

এক সময় নিজেকে বিশ্লেষণ করলেন শ্রীধর শর্মাজী। যৌবনের ঢল যে

কোন মুহূর্তেই তীরের বাঁধন ভেঙে ফেলতে পারে। তাই নিজেকে কিছুকালের জন্যে লহরীর কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চাইলেন। পর পর দু বছর এলেন না হিমালয়ে।

একটি বছর যেতে না যেতেই চিঠি এল। শিউপূজন চিঠিতে দারুণ দুঃখ আর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আরও জানিয়েছে, দোস্তকে বহুৎ দিন না দেখতে পেয়ে লহরী তার মুখের হাসি লুকিয়েছে।

তার পরেও এক বছর কোন খবর না দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন শর্মাজী। কখানা চিঠি পর পর দিয়ে ওপক্ষ জবাব না পেয়ে চুপ হয়ে গেল।

দু' দুটো বছর পার করে হঠাৎ এলেন শর্মাজী। নদীর ধারে কোঠীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্তের আয়োজন চলেছে তখন সামনের পাহাড়ের মাথায়। কেউ নেই কোথাও। কাঠের দরজা ভেজান। চারদিক কেমন যেন শ্রীহীন।

শর্মাজী শিউপূজনের নাম ধরে ডাকলেন। লহরীর নাম ধরে ডাকতে গিয়ে এতদিনের বিচ্ছেদে গলাটা কেঁপে উঠল। ভেঙে গেল স্বর। এক সময় সূর্যাস্ত হল। সন্ধ্যার ঘোলাটে আলো চারদিক থেকে ঢেউ-এর মত এগিয়ে আসতে লাগলো। শর্মাজী বসে পড়লেন কোঠীর দাওয়ায়।

হঠাৎ চোখ পড়ল নদীর ওপর। পুলের নীচ থেকে কে যেন উঠে আসছে। কাছাকাছি আসার আগে চিনতে পারলেন না।

লহরী সামনে এসে দাঁড়াল। সত্যি তাকে চেনা কষ্টকর। তার ছিমছাম রঙীন পাজামা আর চোলি গেল কোথায়? কানের গয়না, গলার হাঁসুলি উধাও। অতি জীর্ণ একটা পোশাকে লজ্জা ঢেকে এক ঘড়া জল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লহরী।

শর্মাজী সে রাতে ঐ ছোট কোঠীতে বসে শুনলেন লহরীর দুর্ভাগ্যের কথা। শিউপূজন আর নেই। কয়েক মাস আগে একটি বিদেশী দলের সঙ্গে কোন এক এক্সপিডিশনে নাকি গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে ক্রমাগত ব্লাড ভমিট করতে থাকে। দলের ডাক্তার কঠিন কিছু একটা রোগ সন্দেহ করে একেবারে দিল্লীতে এনে ফেলল। সেখানে পরীক্ষার পর জানা যায় রোগটা আরোগ্যের বাইরে। আভাসে ইংগিতে কথাটা জানতে পেরেছিল শিউপূজন। সে আর তিলমাত্র সময় নষ্ট করল না। হাসপাতালের এতখানি সুব্যবস্থা, নার্সদের ঘন ঘন আসা-যাওয়া কিছুই তাকে বেঁধে রাখতে পারল না। একটা পাহাড়ী নদীর পুলের ধারে ছোট একটা কোঠীর ছবি তার চোখের ওপর

ভেসে উঠল। একটা নিঃসঙ্গ পাহাড়ী মেয়ের বুকের আশ্রয়ে গোণাগুনতি দিন কটা কাটাবার জন্যে শিউপূজন হাসপাতালের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এল।

লহরীর কাছে শর্মাজী শুনলেন মাত্র মাস দুয়েক আগে শিউপূজন মারা গেছে। মারা যাবার দিনও নাকি বারবার শর্মাজীর নাম ধরে ডেকেছিলেন।

শর্মাজী সে রাতে কি ভাবলেন কে জানে। লহরীকে বলে এলেন ওখানেই থাকতে। বললেন, ঠিক মাসখানেকের ভেতর তিনি ফিরে আসবেন।

এলেনও তাই। কেউ ছিল না নিকট আত্মীয়। ছিল কিছু জোত জমি আর পূর্ব পিতামহের সঞ্চিত সম্পদ। জোতজমি বেচে জমানো টাকা পয়সা নিয়ে শর্মাজী চলে এলেন লহরীর কাছে। বললেন, চলো লহরী আমার সঙ্গে।

কোথায় বাবুজী?

মানুষের কষ্ট ঘোচাতে।

লহরী কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল শর্মাজীর দিকে।

শর্মাজী বললেন, শিউপূজনের রোগের ওষুধ বেরোয় নি। চল আমরা হিমালয়ের পথে পথে রোগের ওষুধ খুঁজে বেড়াই। হাজার হাজার লতাপাতা গাছগাছালির ভেতর কোটি কোটি মানুষের নিরাময়ের ওষুধ লুকিয়ে আছে। আমরা জানি না, তাই রোগের কাছে আমরা হার মানি।

এরপর চলল গাছগাছালি খোঁজার পালা। বড় একটি ওষুধ কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হল। নতুন নতুন অনেক ওষুধও তৈরী হতে লাগল হিমালয়ের গাছগাছালি থেকে।

প্রেমা বলল, লহরী এখন কোথায়?

জয়কিষণ ম্লান হেসে বললেন, শর্মাজীর হৃদয়ের ভেতর। বছর কয়েক আগে লহরি মারা গেছে।

প্রেমার গলায় কৌতূহল, একটা কথা একটুখানি অসংগত হলেও কি জিজ্ঞেস করতে পারি?

অসংকোচে, বললেন জয়কিষণ।

প্রেমা বলল, শর্মাজী কি লহরীকে তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন?

জয়কিষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, জড়িয়ে নিয়েছিলেন বৈকি। একই সঙ্গে জীবনের দীর্ঘ কতকগুলি বছর দুজনে দুর্গম পাহাড়ে দিন রাত্রি ঘুরে বেড়িয়েছেন। শর্মাজী বলতেন, একটা নেশার ঘোরে তাঁরা কাটাতেন দিন,

মাস, ঋতু, বছরগুলো। কোন গাছের রোগ নিরাময় ক্ষমতার খবর পেলেই শর্মাজী আর লহরী ছেলেমানুষের মত আনন্দে চীৎকার করে উঠতেন।

একটু থেমে জয়কিষণ বললেন, কিন্তু এত কাছে থেকেও এক দিনের জন্যে লহরীর দেহ স্পর্শ করেননি শর্মাজী।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য ঘটনা সন্দেহ নেই, কিন্তু একেবারে সন্দেহাতীত। এখানেই শর্মাজীর সঙ্গে অন্যদের তফাৎ প্রেমা। দেহধর্মে তাঁরা যুক্ত হতে পারতেন, এতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু শর্মাজী তা পারেন নি। যে মানুষটি তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিল, তাঁকে বন্ধুর মত বিশ্বাস করেছিল, সেই মানুষটিকে কোনদিনই শর্মাজী মৃত বলে ভাবতে পারেন নি। তাই লহরীকে নিয়ে দিনে-রাতে কাজ করে গেছেন। কিন্তু স্ত্রী হিসাবে কাছে পেতে চান নি। কোনদিন মন চঞ্চল হলেও নিজেকে শাসন করেছেন। আরও দুর্গম অঞ্চলে অনেক বেশী শ্রমসাধ্য কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে দেহের ক্ষুধা ভুলেছেন।

প্রেমা বলল, অন্যপক্ষ? তারও কি ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল না? যোগীর সঙ্গে সেও কি যোগযুক্ত হয়ে গিয়েছিল?

ঠিক তাই। শর্মাজীর কাজে সে নিজেকে যাকে বলে সঁপে দিয়েছিল। মনে তার কি ছিল তা শর্মাজার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সম্ভব হলেও তিনি জানতে চাইতেন না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারতেন দিনের পর দিন লহরী গভীর হচ্ছে। কাজের ভেতর সে পাগলের মত নিজেকে ডুবিয়ে ফেলতে চাইছে।

প্রেমা বলল, এখন শর্মাজী কি কাজে জড়িয়ে রয়েছেন?

জয়কিষণ বললেন, এখন নিজে আর লতাপাতার খোঁজে ঘুরে বেড়ান না। পাহাড়ী ছেলেদের এ কাজে শিক্ষিত করে তুলেছেন। তারাই এখন এসব কাজ করছে। আমি শেষবার তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করি তখন তিনি একটি হাসপাতাল তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের সব সঞ্চয় ঢেলে তিনি তা গড়ে তুলছিলেন। মধুবন্তী তাঁকে শ্রদ্ধা করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল, তিনি তা নিতে চান নি। অবশ্য তাঁর প্রত্যাখ্যানটা ছিল অত্যন্ত স্নেহ সৌজন্যে ভরা। হেসে মধুবন্তীকে বলেছিলেন, যখনই তুমি দেবার কথা বলেছ তখনই আমি অন্তরে তা গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমি যে কাজ করছি সেটা আমাকে একাই করতে দাও। ওরা আমার জন্যে যা করেছে তার কিছু যদি শোধ দিয়ে যেতে পারি। আমি ওদের নামেই সেবা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলছি।

শেষে বললেন, তোমাকে দুঃখ দেব না, তুমি একটি টাকা আমাকে দান করে যাও। ওটি আমি নারী সেবা সদনের কাজে লাগিয়ে দেব। এ আমার জীবিতকালের ভেতর হবে প্রথম আর শেষ দান গ্রহণ।

প্রেমা বলল, আর একটি কথা। উনি এখনও এমনি একটা গুহায় থেকে কৃচ্ছসাধন করছেন কেন?

জয়কিষণ বললেন, মধুবন্তী ঠিক এই প্রশ্নটি করেছিলেন শর্মাজীকে। তিনি বলেছিলেন, এক রাতে কাজের শেষে ক্লান্ত হয়ে আমি আর লহরী এই গুহাতেই আশ্রয় খুঁজে পাই। সে রাতে আশ্চর্য উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল আকাশে। আমরা ক্লান্ত থাকলেও ঘুমুতে পারিনি।

লহরী শুধু বলেছিল, এমন একটি নির্জন গুহার ভেতর সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

সেই থেকে গুহাটিকে আমি পরিত্যাগ করিনি। ওর ইচ্ছা আর স্বপ্নকে মর্যাদা দিয়ে শেষ অব্দি আমিই থেকে গেছি। আর জীবনের শেষ কটা দিন এইখানেই শয্যা পাতব।

শর্মাজীর কথা শেষ হলে জয়কিষণ কিছু সময় নীরব হয়ে বসে রইলেন।

প্রেমা এক সময় বলল, আমরা শর্মাজীর জন্যে কি সন্ধ্যে অব্দি অপেক্ষা করব?

জয়কিষণ কৌতুক করে বললেন, কেন সারারাত অপেক্ষা করতে আপত্তি আছে কি?

প্রেমা কৌতুকটা বুঝল। সে অমনি বলল, কিছুমাত্র না। কুমার জয়কিষণের আপত্তি না থাকলে নর্তকী প্রেমা মেননেরও আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন জয়কিষণ। বললেন, তুমি আমার মধু রাসের সম্মানীয় অতিথি প্রেমা। তুমি গুহায় থাকার কষ্ট হয়ত সইতে পারবে কিন্তু আমি তো তোমাকে কষ্ট দিতে পারব না।

প্রেমা বলল, এখন প্রেমা মেননের নিজস্ব ইচ্ছার কোন দাম নেই। কুমার বাহাদুরের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। যখন যেখানে নিয়ে যাবে কৃতজ্ঞ অতিথির মত চলে যেতে হবে সেখানে।

গুহা ছেড়ে চলে আসার সময় জয়কিষণ চিঠি লিখে রেখে গেলেন। শর্মাজীর সঙ্গে দেখা হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করে প্রণাম জানিয়ে গেলেন। মধুবন্তীর বিয়োগ সংবাদটিও দিয়ে যেতে ভুললেন না।

দুদিন একান্তে জয়কিষণকে পেয়ে প্রেমার কেবলই মনে হতে লাগল দেবনের কথা। এমনি বলিষ্ঠ সুন্দর এক পুরুষ দেবন। সংযমের শ্রী তার সমস্ত আচরণে। জয়কিষণের সঙ্গে পার্থক্য শুধু এক জায়গায়। দেবন বিষয়বিরাগী আত্মমগ্ন শিল্পী আর জয়কিষণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পানুরাগী।

গাড়ীতে লালসিয়া ফেরার পথে প্রেমা বলল, আর একটা কৌতূহল মেটাবে?

জয়কিষণ হেসে বললেন, অফুরন্ত কৌতূহল তোমার। বল, সাধ্যমত উত্তর দেব।

প্রেমা বলল, রাতে বিছানায় শুয়ে বেহালার সুর শুনতে পাই। যখনই ঘুম ভাঙে তখনই শুনি বেহালা বেজে চলেছে। কে এই বেহালাবাদক জানতে খুব ইচ্ছে করে।

জয়কিষণ বললেন, দোলন কিছু বলেনি?

আমি জানতে চেয়েছিলাম। ওর কথা থেকে সবকিছু স্পষ্ট হয়নি। তবে উনি যে বাঙালী আর দোলনের মায়ের নাচের কোন কোন অংশে বেহালা বাজাতেন, তা শুনেছি। কিন্তু উনি সারাটা রাত জেগে বেহালা বাজান কেন? ওঁর কি সংসার নেই?

জয়কিষণ সহসা কোন উত্তর দিলেন না। গাড়ী চালাতে লাগলেন পথের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে। প্রেমা যখন বুঝল উত্তর দেবার সম্ভাব্য সময় পার হতে চলেছে তখন সে মনে মনে লজ্জাই পেল। হয়ত তার এ প্রশ্ন তোলা ঠিক হয় নি। হয়ত এই একটিমাত্র প্রশ্নে সে জয়কিষণের পুরাতন কোন আহত স্থানে আঘাত করে বসেছে। এখন সেই আহত স্থান থেকে রক্তক্ষরণের জ্বালা হয়ত নীরবে সইছে জয়কিষণ। প্রেমা এই মুহূর্তে তার প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু নিক্ষিপ্ত তীরের মত যা একবার ধনু থেকে বেরিয়ে চলে গেছে তাকে ফেরাবে সে কোন ইচ্ছাশক্তির বলে। এখন নিশ্চেষ্ট দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকা ছাড়া অন্য কোন করণীয় নেই প্রেমা মেননের।

জয়কিষণ কথা বললেন, মেয়েদের ভাবনা অনেক দূর অব্দি যেতে পারে। ছেলেরা এ ক্ষেত্রে হার মেনে যায়। আমি বলছি, ভালবাসার ভাবনার কথা।

প্রেমা তাকাল জয়কিষণের মুখের দিকে। জয়কিষণ প্রেমার দিকে চেয়ে একটুখানি হেসে বললেন, তোমার মনে যে ধারণা অস্পষ্ট হলেও জন্মেছে তা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবার শক্তি আমার নেই। ঐ বেহালাবাদকটিকে বলতে পার আমার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রেমা বলল, আশ্চর্য ! তুমি জেনেও সহ্য করলে কি করে ?

জয়কিষণ বললেন, আমি তো মধুবন্তীর ভেতর কোনরকম বিকার দেখিনি। প্রতারণা তো দূরের কথা।

তবে ?

জয়কিষণ বললেন, মানুষটি বড় তদ্গত শিল্পী। হয়ত কোন মুহূর্তে তার মধুবন্তীকে ভাল লেগে থাকবে। সেই ভাল লাগার টানেই হয়েছিল একদিন দেশান্তরী, তারপর আর ঘরে ফিরতে পারেনি।

প্রেমা বলল, তুমি কি নিশ্চিত করে বলতে পার তোমার স্ত্রী ওঁর ভালবাসার কোন উত্তাপই পাননি ? আমি হয়ত কথাটা ঠিকভাবে তোমাকে বোঝাতে পারলাম না। আমার মনে হয় প্রত্যেক মেয়ের মত তোমার স্ত্রীরও ঐ মানুষটির গোপন মনের খবর জানার ক্ষমতা ছিল।

জয়কিষণ বললেন, এত করে বোঝাতে হবে না প্রেমা। মধুবন্তীকে কোনদিন এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে আমার রুচিতে বেধেছে। তবে আমি এও জানতাম, মধুবন্তী এ বিষয়ে সচেতন ছিল। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না মধুবন্তীর মনের গোপনে সামান্য কোন অনুরাগ ছিল কিনা, তবে ভায়োলিনের সুরে নাচতে নাচতে সে যে উদ্দীপ্ত হত তা আমি দর্শক আসনে বসে স্পষ্ট অনুভব করতাম।

প্রেমা বলল, এত বছর একসঙ্গে মানুষটি রইল, কোনদিন দুজনের কোন সান্নিধ্য কি চোখে পড়েনি ?

না। দেখা হয়েছে দুজনের। নাচের জন্যে বাজনা কম্পোজ করে শুনিয়েছে কিন্তু চোখেমুখে আকাঙ্ক্ষার কোন ছবি ফুটে উঠতে দেখিনি।

প্রেমা বলল, এ ভালবাসা দেহের সীমা ছাড়িয়ে গেছে জয়কিষণ। শিল্পীর ওপর শিল্পীর ভালবাসা। এ তো দেশকাল আর ব্যক্তির বাঁধনে বাঁধা নয়।

জয়কিষণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, তোমার অনুমান একেবারে সত্যি প্রেমা। তাই আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও ঐ মানুষটিকে আমি সমান সমাদরে আমার লালসিয়ার বাড়ীতেই রেখেছি।

প্রেমা তদ্গত হয়ে বলল, যে কোন শিল্পীর সঙ্গে তার সংগতকারের একটা নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠে। নাচ, গান, বাজনা, সকল ক্ষেত্রেই এই অদৃশ্য বাঁধন আপনা আপনি তৈরী হয়ে যায়। বোলের তালে নৃত্যের তালে যে রস ছলকে ওঠে সেই রসটুকু পান করার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় দর্শকদের ভেতর। করুণ সুরে যখন ভায়োলিন বেজে ওঠে তখন কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা-

কাতর রাধার বুক কাঁপতে থাকে। তার করুণ চোখের দৃষ্টি পাতার মত বিছান থাকে দূর পথের ওপর। ধীরে ধীরে কাতরতার একটি মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় রাধারূপী নর্তকী।

আচ্ছা জয়কিষণ, সুরস্রষ্টার যে সুর নৃত্যশিল্পীর হৃদয়কে স্পর্শ করে তাকে রূপান্তরিত করে দিল তার সঙ্গে একটা অগোচর বাঁধনে বাঁধা পড়বে শিল্পী, এটাই কি স্বাভাবিক নয়?

জয়কিষণ বললেন, তুমি শিল্পী বলে কথাগুলোকে এমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারলে। তুমি যে কথা বললে প্রেমা, সে সত্য আমার অজানা নয়। তাই মধুবন্তীকে বিয়ে করে আর পাঁচটি মানুষের মত আমি মনে মনে যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হইনি। তবে একটি সত্য আজ আমি তোমার কাছে স্বীকার করব, মধুবন্তীকে সর্বভারতীয় নৃত্যের আসরে ছেড়ে দিতে আমার প্রাণ চাইত না। বলতে পার মানুষ হিসেবে সেখানেই আমার হার। আমার উদারতা এতদূর পৌঁছতে পারত না প্রেমা।

প্রেমা বলল, স্বাভাবিক। সেজন্যে আমার মনে হয় শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর মিলনই বাঞ্ছনীয়। শিল্পক্ষেত্রে, সংসারক্ষেত্রে দু জায়গাতেই ওদের যুক্ত হওয়া দরকার। বিত্তবানের সঙ্গে শিল্পীর যোগ প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু তাকে যোগ না বলে ভোগ বললেই ভাল হয়। সেখানে শিল্পীর মোহ ভাঙতে বেশী সময় লাগে না। তখন শুধু আক্ষেপ, শুধু বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে পথ খোঁজা।

কথাগুলো বলে প্রেমার মনে হল সে হয়ত জয়কিষণকে আহত করেছে। তাই সে আবার বলল, তবে বিত্তবান যদি রসিক সমঝদার হন, তাহলে সেখানে শিল্পীর সঙ্গে মিলনে কোন বাধা থাকতে পারে না।

জয়কিষণ একটা পাহাড়ী জলধারার সামনে এসে পড়েছিলেন। আস্তে পার হতে হবে। তাই গাড়ীটা ব্রেক করে তাকালেন প্রেমার দিকে। হেসে বললেন, শেষের কথাটুকু কি সঙ্গীর জন্যে সান্ত্বনা পুরস্কার?

প্রেমা বলল, তোমার দিকে তাকিয়েই কথাটা মনে পড়েছে ঠিক, কিন্তু আমি বানিয়ে স্তুতি করে কোনদিনই কথা বলতে পারি না জয়কিষণ।

আচ্ছা তাহলে আর একটা প্রশ্ন।

বল।

এমনি কোন সম্ভ্রান্ত সমঝদারকে গ্রহণে তোমার দ্বিধা আছে কি? ধর জীবনে যদি এমন কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হও তাহলে তুমি কি তোমার আজকের এই মুহূর্তের উক্তিকে মর্যাদা দিতে পারবে?

সহসা কোন জবাব দিতে পারল না প্রেমা। তার সুন্দর মুখখানাতে লালের ছোপ লাগল। একটা জবাব তাকে দিতেই হবে। কিন্তু নিজের কথার মর্যাদা রাখতে গেলেই তাকে হতে হবে বন্দিনী। এ যে নিজের কথার জালে নিজের জড়িয়ে পড়া।

অসহায়ের মত জয়কিষণের মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু মাথাটা নাড়ল।

জয়কিষণ হেসে বললেন, সম্মান দিয়ে যাকে এনেছি, আমার কাছ থেকে তার ভয় পাবার কোন কারণ নেই প্রেমা। তুমি শিল্পী বলে আমার আকর্ষণ আছে তোমার ওপর, আর কোন অসম্ভব ইচ্ছা আমার এই মুহূর্তে নেই।

জয়কিষণ পাহাড়ী জলপ্রবাহের ওপর দিয়ে সাবধানে গাড়ী পার করে নিয়ে চলে গেলেন।

আগামী রাতই মধুরাস। আকাশে জ্বলবে আকাশ দেবতার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোর গোলক। পূর্ণ চাঁদের জোৎস্না ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেবে চরাচর। লতাপাতা ফল, সৌধ পর্বত উপত্যকা নদী মাখামাখি হয়ে যাবে জ্যোৎস্নার সেই ঘন কিরণ ধারায়।

জয়কিষণ প্রেমাকে নিয়ে উৎসবের আগের রাতে ঢুকলেন নাটমণ্ডপে। সুসজ্জিত আলোকিত মণ্ডপে প্রেমার এই প্রথম আগমণ।

এ যেন এক বিস্ময়। সমস্ত সৌধটি শ্বেত পাথরে গড়া। সামনে গোল গম্বুজ। বৌদ্ধ রীতির তোরণ। তোরণের ওপরে একটি ময়ূর। পেখম ধরে দাঁড়িয়ে আছে নৃত্য-ভঙ্গিমায়। গ্রীবা থেকে ঊর্ধ্বমুখী শিখা পর্যন্ত ঈষৎ বক্রিম ভঙ্গীতে স্থাপিত। অপূর্ব জয়পুরী কাজ করা পেতলের ময়ূর। ওপরের উজ্জ্বল একটি বিদ্যুৎ বাতির চক্রাকার আলো এসে পড়েছে ময়ূরটির ওপর। মাজা পেতলের ওপর আলো পড়ে স্নিগ্ধ সোনালী একটা আভা ছড়িয়ে পড়ছে। নাটমণ্ডপের গায়ে কোনো আলো নেই। তার চারদিক ঘিরে যে মঞ্জরিত শালগাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে তাদের ডালে ডালে বাঁধা আলোগুলো ফোয়ারার মত ছড়িয়ে দিচ্ছে দুগ্ধধারা। সেই ধারায় স্নান করছে শ্বেত পাথরের নাটমণ্ডপ। রাত বারোটার পর যখন মেন-সুইচ অফ করে দেওয়া হয় তখন নাটমণ্ডপের আর এক রূপ। সেদিনের মত উৎসবের সমাপ্তি। দর্শকরা চলে যান যে যার আশ্রয়ে। শুধু জেগে থাকে শ্বেত সৌধটি নীল আকাশের তলায় তাজমহলের ক্ষুদ্র একটি সংস্করণের মত। আকাশের চাঁদ তার দিকে চেয়ে

চেয়ে দেখে আর ভালবাসায় বিগলিত হয়ে সুধা ঝরায়। দু-একজন সত্যিকারের রসজ্ঞ এই জনশূন্য মুহূর্তগুলোকে অনুভবের মধ্যে খোদাই করে রাখার জন্যে নাটমণ্ডপের চারদিকে নিশি পাওয়ার মত ঘুরে বেড়ান।

অডিটোরিয়ামে ঢোকার আগে প্রেমা শুধু বলল, তোমার স্ত্রীকে এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি জয়কিষণ। বোধহয় এর চেয়ে ভাল করে দেখা আর কোনরকমে হতে পারে না।

জয়কিষণ বললেন, শিল্পীই শিল্পীকে চিনতে পারে। চোখের বাইরের বস্তুকে চোখের সামনে স্পষ্ট করে দেখার ক্ষমতা একমাত্র শিল্পীরই আছে।

প্রেমা বলল, চোখ হল সবচেয়ে ছোট জানালা, যার ভেতর দিয়ে বিশ্বভুবন দেখা যায়। কিন্তু শিল্পীর আছে বাড়তি আর একটি চোখ। সে চোখের দৃষ্টি অনন্তের সৌন্দর্য ভাণ্ডারকে ছুঁয়ে আছে। তাই শিল্পীমাত্রেই দ্বিতীয় স্রষ্টার সম্মান পায়।

জয়কিষণ বললেন, তোমার কথাগুলো শিল্পীর মত। আমার স্ত্রীকে দেখতাম, কত গভীর রাতে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে কাজ করছেন। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াতাম। উনি কিন্তু লক্ষ্যই করতেন না। নিজের মনে স্কেচ করতেন আর তার পাশে পাশে কিসব লিখতেন।

আমার সঙ্গে হঠাৎ চোখাচোখি হলেই চমকে উঠতেন। চমক ভাঙলে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। বলতেন, এত রাতে কি অন্যায় দেখতো, তোমার ঘুম ভাঙালাম।

আমি অমনি বলতাম, কি করছ জানতে বড় ইচ্ছে করে।

উনি আরও সঙ্কুচিত হয়ে কাগজখানা তুলে বুকের কাছে চেপে রাখতেন।

বলতাম, তোমার ও রত্নে আমার অধিকার নেই জানি, আর এও জানি আমার এ কৌতূহলের কোন দামই নেই তোমার কাছে।

মধুবন্তী বিচলিত হয়ে আমার চোখের সামনে ওঁর আঁকিবুকি কাটা কাগজখানা মেলে ধরে বলতেন, এই সামান্য জিনিসের জন্যে এত কৌতূহল তোমার। দেখ, শুধু নতুন একটা নাচের ছক তৈরী করছি আমি। ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখি নাচের। ইন্দ্রসভায় উর্বশী নতুন নাচ পরিবেশন করছেন। ঘুম ভেঙে গেলে আমি তাই এঁকে রাখার চেষ্টা করি। প্রায়ই স্বপ্নে আমি নানা ধরনের নাচ দেখতে পাই।

প্রেমা অমনি বলল, শিল্পী মাত্রেই তদ্গত কিন্তু শিল্পের দেবীর আশীর্বাদ না থাকলে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে এমন আশ্চর্য সব দর্শন হয় না।

জয়কিষণ অন্যমনস্ক হলেন। সম্ভবত তাঁর মধুবন্তীর কথা সেই মুহূর্তে বেশী করে মনে পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই স্বাভাবিক হলেন জয়কিষণ। বললেন, চল ভেতরে যাই।

প্রেমা যেন আপন মনে বলে উঠল, সত্যি, এখানে এসে যেমন অনেক কিছু পেলাম, তেমনি হারালামও অনেক।

যেমন?

প্রেমা বলল, ওঁর মত একজন গুণী শিল্পীর আশ্চর্য সব পরিকল্পনা দেখলাম, কিন্তু সঙ্গ পেলাম না।

জয়কিষণ হঠাৎ বললেন, তুমি নিজে যে কত বড় শিল্পী প্রেমা সে সম্বন্ধে তোমার নিজের কোন ধারণাই নেই। আমরা যারা তোমার নাচ দেখি তারাই শুধু বুঝি।

ওরা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে অডিটোরিয়ামের স্টেজের মুখোমুখি। সামনে দু'সারি দর্শক আসন। দর্শকদের দিকে ধনুকের মত বাঁক নিয়ে উঠেছে শ্বেতপাথরের মঞ্চ। প্রেমার চোখ স্থির হয়ে আছে মঞ্চের পেছনের একটি পেন্টিং-এর ওপর। চারদিক ধবধবে সাদা পাথরের রঙে আশ্চর্য প্রশান্ত। তার মাঝখানে ঐ ছবিখানা ভোরের সূর্যের লাল হলুদ রঙে রঙীন।

একটি সোনালী রথে বসে আছেন দেব-দিবাকর। সাতটি গতিশীল বলদৃপ্ত অশ্ব আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে সেই সজ্জিত রথ। সূর্যের হাতে সোনালী রজ্জু। উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে তিনি চালনা করছেন রথ। সারা আকাশ জুড়ে লালে হলুদে মেশা রঙের সমারোহ। টুকরো টুকরো রঙীন মেঘের সঙ্গে দিগন্তের দিকে উড়ে চলেছে প্রভাতী পাখির দল।

ছবির তলায় শ্বেতপাথরের টানা প্যানেলের ওপর এক সারি আধফোটা পাথরের তৈরী পদ্ম।

প্রেমা মঞ্চের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দুহাত তুলে নমস্কার করল।

জয়কিষণ প্রেমার মুগ্ধ ভাবটি লক্ষ্য করে বললেন, শিল্পী সারদা উকীলের এমনি সূর্য-সারথীর একটি ছবি মধুবন্তী কোথায় যেন দেখেছিলেন। ছবিখানার গতিভঙ্গী তাঁর মনে দারুণভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি ঐ ছবির একটি রঙীন প্রতিলিপিও কোন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মঞ্চ তৈরী শেষ হলে ব্যাকগ্রাউণ্ড ডেকোরেশানের সময় ঐ ছবিখানাই কুশলী এক বাঙালী শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে নেন।

তখন প্রেমা বলল, সূর্য তো এক অর্থে ছন্দ। সূর্যের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাখির ডানায়, প্রজাপতির পাখনায়, ফুলের পাপড়িতে ছন্দের কাঁপন লাগে। জলের বুকে ঢেউ-এর দোলায় সূর্যের ভালবাসার টান। চারদিকে প্রাণের ছন্দ তো ঐ সূর্যেরই ছোঁয়ায়। জলে স্থলে আকাশে অগ্নিতে সূর্যেরই লীলা, সূর্যেরই ছন্দ। ঋতুর নৃত্যমহিমাও তো আমাদের এই পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণের ফল।

জয়কিষণ বললেন, কিন্তু আমি মধুবন্তীকে বলেছিলাম, নটরাজের মূর্তি মঞ্চের পশ্চাৎপটে খোদিত করাই তো রীতি। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত নটরাজের উপাসক। তিনি শ্রেষ্ঠ নর্তক বলেই তো নটরাজ।

মধুবন্তী বলেছিলেন, প্রতিদিন ভোরে যে চলমান সূর্যকে চোখের সামনে দেখছি, তাঁকেই আমার নৃত্যগুরু বলে মনে মনে বরণ করেছি। তাঁকে আমি বাইরের চোখেও দেখি আবার ধ্যানের চোখেও দেখি। তাঁকে বুঝতে, তাঁর ছন্দে দেহমন দুলিয়ে দিতে তাই আমার কোন কষ্ট হয় না। অবলীলায় তিনি আমার ঘুমন্ত ভাবনাগুলোকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলেন। আমি তাই চিরদিনই সূর্য উপাসিকা।

প্রেমা বলল, আমি তো আগেই বলেছি সূর্যের ভেতরে ছন্দের লীলা। মধুবন্তী তাই সূর্যকেই তাঁর নৃত্যদেবতারূপে বরণ করেছিলেন। কিন্তু মহাদেবকে শ্রেষ্ঠ নটরূপে গ্রহণ করার ভেতরেও একটা যুক্তি আছে।

জয়কিষণ তাকালেন প্রেমার দিকে। তাঁর চোখে জানবার কৌতূহল।

প্রেমা বলল, আমার গুরু বলেন, স্থিতি আর গতি, ধ্যান আর প্রকাশ একই সঙ্গে বিরাজ করে। পর্বতের ওপর যখন তুষারের স্তূপ স্থির হয়ে থাকে তখন তার ধ্যানের মূর্তি, আবার তুষার যখন গলে ঝরে পড়ে তখন তার গতির লীলা। মহাদেবের পরিকল্পনায় একদিকে স্থিতি অন্যদিকে গতি। যখন তিনি ধ্যানে মগ্ন তখন তিনি শাম্ভম। আবার যখন তিনি নৃত্যরত তখন তাণ্ডব নটরাজ। দুটি রূপেই সম্পূর্ণতা।

একটু থেমে আবার প্রেমা বলল, মাধবী আম্মা একটি ডালিম একদিন হাতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, এটি কি বলতো?

আমরা চেঁচিয়ে বলেছিলাম, ডালিম।

উনি বলেছিলেন, সে তো সাদা চোখেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে এটি একটি ধ্যান। এই ধ্যান থেকেই একদিন জন্ম নেবে বৃক্ষ। তার থেকে জাগবে তার ছন্দিত শাখাপ্রশাখা। তার রঙীন ফুল। তার রসে ভরা ফল।

বীজে যার ধ্যান, বৃক্ষের শাখায় পুষ্পে ফলে তার প্রকাশ। নাচও ঠিক তাই। ধ্যানের ভেতর দিয়ে তার সমস্ত রূপটা ভেবে নিতে হয়।

আরও বলেছিলেন, স্বামীকে যখন শয্যায় গ্রহণ করবে তখন আগে ধ্যানের ভেতর তাঁর রূপটিকে চিন্তা করবে। তবেই তো দেহের লীলা হবে উৎসব.

আশ্চর্য তোমার গুরুর শিক্ষা প্রেমা!

প্রেমা বলল, তিনি নাচের আগে আমাদের সাজিয়ে দেবার পর ধ্যান করতে বলতেন কিছুক্ষণ। যে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চাই, ধ্যানের ভেতর দিয়ে সেই চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে যেতে বলতেন।

জয়কিষণ বললেন, তোমার গুরু যদি এ অনুষ্ঠানে তোমার সঙ্গে থাকতেন, তাহলে আমার মধুবন্তীর নাটমণ্ডপ ধন্য হয়ে যেত।

উনি আজকাল কোন নাচের অনুষ্ঠানেই অংশ নেন না।

জয়কিষণ বললেন, শুধু উপস্থিতি। তার দাম কি কম।

প্রেমা জয়কিষণের শ্রদ্ধার উত্তাপটুকু অনুভব করে মাথা নেড়ে জানাল, তা ঠিক।

এবার জয়কিষণ বললেন, এসো, অডিটোরিয়ামের দেয়াল চিত্রগুলো তোমাকে দেখাই।

ওরা ঘুরে ঘুরে দেয়ালের ছবি দেখতে লাগল। সবকটি ছবিই রাধাকৃষ্ণ-লীলার। মহারাসের ছবিতে প্রতি গোপিনীর সঙ্গে মণ্ডলী রচনা করে নৃত্য করছেন কৃষ্ণ। যত গোপিনী তত কৃষ্ণ। কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, পরনে পিতবাস, গলায় দীর্ঘ সাদা মালা। সবকিছু ত্যাগ করে কৃষ্ণের হাত ধরে উধাও হয়ে যাবার আকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে ব্রজবধূদের চঞ্চল চরণ চালনায়।

পাশের চিত্রটি বিরহ-কাতর রাধিকার। ঘনমেঘে বিদ্যুতের বিকাশ। শিহরিত কদম্ব তরুর তলায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে প্রিয়তমের আসা-পথের দিকে চেয়ে আছে শ্রীমতী রাধা। শিথিল হাতখানা অবগুণ্ঠনের ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে। উত্তাল যমুনা তরঙ্গের কান্নায় আছড়ে পড়ছে প্রতীক্ষা কাতর রাধার চরণপ্রান্তে।

অন্য একখানি চিত্র বসন্ত রাগিণীর। মন্দিরা, মৃদঙ্গ আর করতালের ধ্বনি তুলেছে গোপিনীর দল। সেই তালে বাঁশরীর রব তুলে নৃত্য শুরু করেছেন শ্রীকৃষ্ণ মাধব। চারদিকে বসন্ত পুষ্পের সমারোহ।

এমনি কৃষ্ণলীলার বহুচিত্রে মনোরম করে সাজান প্রেক্ষাগৃহ। সবকটি চিত্রই রাজপুত অথবা কাংড়া শৈলীর মাধ্যমে আঁকা। সাদা মার্বেলের দেয়ালে ভারমেলিয়ন রেড, গোল্ডেন ইয়োলো, স্কাই ব্লু, পেল গ্রে, ডিপ গ্রীন রঙের

ব্যবহারে ছবিগুলো দারুণভাবে চোখে লাগে। কিন্তু আশ্চর্য! কোথাও চড়া রঙের চোখ ধাঁধান ব্যবহার নেই। সব ছবিতেই একটা কোমল লাবণ্য মাখান।

ছবির ভেতর রাধার চোখমুখের অভিব্যক্তি চেয়ে চেয়ে দেখার মত। প্রেমা তাই দেখছিল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা শ্রীমতী রাধায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। বিপ্রলব্ধা রাধার ছবি দেখতে দেখতে প্রেমার বুক ঠেলে উঠে আসছিল একটা ব্যথার ঢেউ। সে ঢেউ ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল তার চোখের পাতা।

জয়কিষণ ছবিগুলোর ইতিহাস বলে যাচ্ছিলেন। কিছু শুনছিল প্রেমা। অনেক কথাই আবার তার কানে যাচ্ছিল না। নাচ শেখার শুরুতেই প্রায় জয়দেবের গীত-গোবিন্দের সঙ্গে তার পরিচয়। দক্ষিণ ভারতের শিল্পীদের কাছে জয়দেব বহু দিনের আত্মীয়। কেরালার মোহিনী আট্যমের সঙ্গে কৃষ্ণরাধার লীলারঙ্গের যোগ অনেকখানি। তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ জয়কিষণের মুখ থেকে শোনার দরকার ছিল না প্রেমার। তবু জয়কিষণের কথা বলার ভঙ্গীতে আকৃষ্ট হচ্ছিল প্রেমা।

এক জায়গায় এসে প্রেমা থমকে দাঁড়াল। দেয়ালের মাঝ বরাবর একটা হালকা লাল চুণার স্টোনের পিলার। তার সারা দেহ ভাস্কর্যে খোদিত। ফুললতা বিতানের তলায় পদচারণার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে লীলাবতী নর্তকী। উদ্ধত বুকের ওপর দিয়ে বামবাহু প্রসারিত করে দক্ষিণ করে ধৃত কেশপাশ বেণীবদ্ধ করে চলেছে। অভিসারে বিলম্ব না হয় তাই কবরী রচনার সঙ্গে সঙ্গে পথচলা।

এমনি অডিটোরিয়ামের চারটি পিলারে চার নায়িকা মূর্তি। কটি ও পদবিভঙ্গে, বাহুমুদ্রায় ললিত নৃত্যের ছন্দ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় গোলাপী আভার মসৃণ পাথরে মূর্তিগুলো মনে হচ্ছে জীবন্ত।

জয়কিষণ বললেন, বর্তমান উড়িষ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ভুবনেশ্বর মহাপাত্রের হাতের স্পর্শ আছে এ মূর্তিতে।

প্রেমা বলল, এ মূর্তি কিন্তু বেলুরের নর্তকী মূর্তির অনুকরণে তৈরী। আমাদের কলাকেন্দ্রমে নাচ শেখার সময়ে ভারতের মন্দির-ভাস্কর্য দেখে বেড়াতে হয়েছে। অবশ্য একথা স্বীকার করব মূর্তির অলংকরণের কোন কোন ক্ষেত্রে কলিঙ্গ ভাস্কর্যকে বেলুরের মূর্তিগুলি অতিক্রম করে গেলেও মুখের অভিব্যক্তির দিক থেকে বিচার করলে ভারতভস্কর্যে কলিঙ্গের শিল্পীরা অদ্বিতীয়।

আমার তো মনে হয় বেলুরের মূর্তিগুলোর অঙ্গবিভঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গমূর্তির একসপ্রেশান যুক্ত হলে ভারতভাস্কর্যের নবদিগন্ত খুলে যাবে।

জয়াকিষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন প্রেমার দিকে। নৃত্যের বাইরে অন্য একটি শিল্পকে এমন করে স্টাডি করা তো সাধারণ শিল্পীর কাজ নয়।

জয়কিষণ বললেন, তোমার নাচ কেন যে এমন করে দর্শকের চোখের দ্বার পেরিয়ে একেবারে হৃদয়ে পৌঁছে যায় তা বুঝতে পারলাম। যে কোন শিল্পীরই অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে স্টাডি করা দরকার।

প্রেমা লজ্জা পেল জয়কিষণের প্রশংসায়। তবু সে বলল, মাধবী আম্মা আমাদের নাচ শেখানোর সময়ে এক-একটা অনন্যকরণীয় একসপ্রেশান দেখিয়ে বলতেন, আমাকে অতিক্রম করে যাও।

বলতাম, অসম্ভব আম্মা।

অমনি মাধবী আম্মা ক্ষেপে গিয়ে বলতেন, ভারতের মান্দরে মন্দিরে ঘুরে তাহলে কি দেখলে এতদিন। ঠোটের কোণায় শিল্পীর কুশলী হাতের আঁচড়ে হাসি ফুটে উঠতে দেখনি? চোখের চাহনিতে কামনার কান্না দেখনি? নিজেদের সেইসব মূর্তি বলে কল্পনা করে নাও। তবে আমাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারবে।

মুখ নীচু করে থাকতাম। গুরুকে বড় বলে ভাবতেই শিখেছিলাম। তাঁকে অতিক্রম করে যাবার কথা ভাবতে পারতাম না।

একদিন সমুদ্রের ধারে আমাদের কজনকে নিয়ে বসেছিলেন মাধবী আম্মা। হালকা মেজাজে নানা রকম গল্প করতে করতে হঠাৎ বললেন, আমি একবার আমার গুরুর সঙ্গে একই মঞ্চে নাচতে নেমেছিলাম। প্রায় সব কটিই সোলো পারফরমেন্স। গুরু কুঞ্জকুট্টি আম্মা একটি নাচ নেচে এলে আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে ভিন্ন একটি নাচ পরিবেশন করছিলাম। বয়েস কম। তাই ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে মাতোয়ারা। অনুষ্ঠানের মাঝে উৎসাহীরা একবার স্টেজের ওপর উঠে এসে আমাকে ঘিরে এমন অভিনন্দন জানাতে লাগল যে আমি একেবারে দিশেহারা।

ওরা ফিরে গেলে আবার নাচ শুরু হল। নাচছি পাখির ডানার মত হালকা দুটো হাতকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে। সারা দেহটা ঘুরছে একটা ঘূর্ণির মত। আমার চোখে মুখে ফুটে উঠছে বর্ষা বসন্তের লীলা। প্রশংসা ধ্বনির সঙ্গে করতালি মিশে দারুণ উন্মাদনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি রাজহংসীর মত উদ্ধত নৃত্য-ভঙ্গিমায় ঢুকলাম উইংস পেরিয়ে গ্রীন-রুমের ভেতর।

পরবর্তী নাচ গুরু কুঙ্কুট্টি আম্মার। আর এটিই ছিল অনুষ্ঠানের শেষ নাচ। ঘোষক আড়ালে থেকে তাই ঘোষণা করলেন।

অমনি অডিটোরিয়াম ভেঙে পড়ল চীৎকার ধ্বনিতে। আমরা মাধবীকে চাই। মাধবীর নাচ দেখে তবে ফিরব।

গ্রীনরুমে কুঙ্কুট্টি আম্মা তখন শেষ অনুষ্ঠানের সাজে নিজেকে সাজিয়ে তুলছিলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে চেয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে। তিনি চোখের কোণে কাজলের টান টানছিলেন। ওদের চীৎকার আমাদের কানে এসে পৌছল। আমি সে শব্দে চমকে উঠলাম। একি! আমার গুরুর নাচ দিয়ে শেষ হবে অনুষ্ঠান। ওরা কি পাগল হয়ে গেল নাকি!

সমানে তখন চীৎকার উঠছে দর্শক আসন থেকে।

আমি স্পষ্ট দেখলাম, কাজলের স্টিক চোখের কোণে থেমে গেছে কুঙ্কুট্টি আম্মার। আমি নিজেকে তাঁর এই অসম্মানের কারণ ভেবে দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললাম। আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। বুক ঠেলে কান্নার ঢেউ উঠে এল। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

কুঙ্কুট্টি আম্মা আমাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বললেন, ছিঃ পাগলা কাঁদছিস কি রে! আজ এতদিন পরে আমি তোর কাছে গুরু দক্ষিণা পেলাম।

তখন কান্নায় আমার মুখবুক ভেসে যাচ্ছে। আমি ক্রমাগত বলে চলেছি, আমি আর নাচব না। কোনদিনও নাচব না।

কুঙ্কুট্টি আম্মা আমার কান্না ভেজা মুখখানা জোর করে দুটি হাতের পাতায় তুলে ধরলেন। আমি চেয়ে দেখলাম, তাঁর চোখে জল টলমল করছে, কিন্তু মুখে এক অপার্থিব হাসি। আমাকে তাঁর দিকে তাকাতে দেখে বললেন, তুই আমার সন্তান মাধবী। গুরু পিতা, গুরু মাতা। আজ আমার এতদিনের এত শ্রমের মূল্য মিলেছে। আমার কন্যা আমার শিষ্যা আমাকে অতিক্রম করে গেছে। এর চেয়ে বড় পুরস্কার জীবনে আর পাব না রে। এ আমার হার নয়, এ আমার বিজয় গৌরব।

তিনি আমার চোখের জল মুছিয়ে আমাকে সোনালী আলোর রঙের একটি কাঞ্জিভরমে সাজালেন। নিজে পরেছিলেন একটি নীলাম্বরী শাড়ি। আমাকে সাজিয়ে তিনি বুকের কাছে টেনে নিয়ে ছোট্ট মেয়ের মত চুমু খেয়ে বললেন, আমার নীল শাড়ির সঙ্গে এই সোনালী হলুদ শাড়িখানা কি সুন্দর মানিয়েছে। নীল আকাশের বুকেই তো সোনালী আলোর খেলারে। আজ থেকে আমি বসে বসে তোর খেলাই দেখব।

আমাকে নাচের মুদ্রায় আহ্বান করতে করতে কুঞ্জকুট্টি আম্মা মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি করজোড়ে নাচের বিশেষ মুদ্রায় দাঁড়ালেন। আমি জোড়হস্তে উপবেশন মুদ্রায় তাঁর চরণ তলে বসলাম। তিনি দর্শকদের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা আজ মাধবীকে গ্রহণ করে আমাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারই দিয়েছেন। শিষ্য আর সন্তানের কাছে পরাজয়ে গ্লানি নেই। আছে শুধু জয়ের আনন্দ। আপনারা আমাকে আজ সেই দুর্লভ আনন্দই দিয়েছেন। আমি আজ আমার মাধবীকে আপনাদের সামনে রেখে যাচ্ছি। সে যেন আপনাদের অফুরন্ত ভালবাসার মর্যাদা রাখতে পারে।

কুঞ্জকুট্টি আম্মা নমস্কার করে সরে যেতে চাইলে দর্শক আসনের সবাই হাত জোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা আপনাকে স্টেজ ছেড়ে চলে যেতে দেব না। আজ দ্বৈত নাচেই আসরের সমাপ্তি ঘটুক।

থামল প্রেমা। মাধবী আম্মার মুখখানা তার চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে উঠল। হঠাৎ তার মনে হল, মাধবী আম্মার অবয়ব যেন অন্য কোন মধ্যবয়সী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ইনি কে? ইনিই কি মাধবী আম্মার গুরু কুঞ্জকুট্টি আম্মা! প্রেমা এবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার গৌরদেহ মাধবী আম্মার শ্যামল দেহবর্ণে পরিণত হয়েছে। বহু বছর আগের এক অসাধারণ শ্যামাঙ্গী তরুণী নর্তকী ধীরে ধীরে তার মধ্যে জেগে উঠছে।

একটা আচ্ছন্ন ভাবের ভেতর কতক্ষণ কেটে গেল প্রেমার। সে তাকিয়েছিল মঞ্চের দিকে। সে দেখছিল স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে গুরু আর তাঁর পায়ের তলায় যুক্ত করে উপবেশন মুদ্রায় বসে তরুণী শিষ্যা।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এল প্রেমার। চোখের জলে ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গেল মঞ্চের ওপরের দুটি মূর্তি।

জয়কিষণ প্রেমার পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিলেন। তিনি একবার আস্তে ডাকলেন প্রেমার নাম ধরে। কিন্তু তদ্গত প্রেমার কানে সে ডাক পৌঁছল না।

কিছুক্ষণ পরে প্রেমা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। সে তাকাল জয়কিষণের দিকে। সলজ্জ একটা হাসি বর্ষণক্ষান্ত আকাশের বুকে কোমল করুণ রোদ্দুরের মত ফুটে উঠল তার মুখে।

নাচ শেষ হয়ে গেছে। নিমন্ত্রিত দর্শকেরা দারুণভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে প্রেমাকে। ভারত নাট্যমের শেষ পর্বে যখন সে সিঁদুর রাঙা শাড়িতে দেহ

আবৃত করে গোলাপের পাপড়িতে বেণী বন্ধন করে নমস্কারের মুদ্রায় নাচতে নাচতে থেমে দাঁড়াল তখন মধুবন্তীর নাট মণ্ডপ ভেঙে পড়ল করতালির ধ্বনিতে।

যবনিকা পড়ল। দলে দলে বিশিষ্ট দর্শকেরা অভিনন্দন জানাতে এলেন। তাঁরা অকুণ্ঠভাবে বলে গেলেন এই মঞ্চে কয়েক বছর ধরে ভারতের যে সকল গুণী শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করে গেছেন তাঁদের নাচ দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছে, কিন্তু আজকের নাচ অবিস্মরণীয়।

প্রেমা রোমাঞ্চিত হয়েছে। তবু হাত জোড় করে বলেছে, দয়া করে এভাবে প্রশংসা করবেন না। ওঁরা সকলেই আমার নমস্য শিল্পী।

যবনিকা আবার উঠেছে। এবার মঞ্চে দাঁড়িয়েছে প্রেমা। সুসজ্জিতা দোলন ড্রিমল্যাণ্ডের পরীর মত গোলাপী একখানা ফ্রক পরে হাতে রূপোর ট্রে নিয়ে উইংসের ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে প্রেমার পাশে। মায়ের স্মৃতির স্মারক চিহ্ন দেবার ভার প্রতি বছর পড়ে তারই ওপর।

রূপোর ট্রে নাচে নামিয়ে সে ভার থেকে তুলে নিয়েছে সোনার তারের কাজ করা সুদৃশ্য মুকুট। চুণী আর পান্নার সেটিং-এর মাঝখানে এক খণ্ড কমল হীরে জ্বল জ্বল করছে।

প্রেমা একবার বিজয়িনীর হাসি হাসল। কিন্তু পরক্ষণেই মাথা নত করল শ্রদ্ধায়। আর দোলন নিপুণ হাতে প্রেমার মাথায় পরিয়ে দিল সে মুকুট।

আবার করতালি ধ্বনি আর উল্লাসের শব্দে আলোড়িত হল নাটমণ্ডপ। সঙ্গে সঙ্গে সে বছরের মত মধুবন্তীর নৃত্য মঞ্চে নেমে এল শেষ যবনিকা।

দর্শকেরা চলে গেছেন। গায়ক বাদকের দলও চলে গেছে অতিথি ভবনে। শুধু থেকে গেছেন জয়কিষণ, প্রেমা আর দোলন। তারা এখন বসেছে নাটমণ্ডপের পেছনে শালবীথির তলায় বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে। এদিকে জোরাল আলোর চমক নেই। সবুজ কটি বাল্ব থেকে যে আলো ঝরে পড়ছিল তা ভারী স্নিগ্ধ আর সুখকর। তবে তা নীচের অন্ধকারকে তরল করে দিলেও একেবারে দূর করতে পারে নি।

নাটমণ্ডপের পাশেই পোশাক পরিবর্তনের ঘর। ঝকঝকে বাথরুম। প্রেমা গীজার চালিয়ে গরম জল করে স্নান সেরে নিয়েছে। পোশাক বদলে ঝরঝরে মনে হচ্ছে এখন। সাদা পোষাকে প্রেমাকে শ্বেতপাথরের গ্রীক কোন মডেল

বলে মনে হয়। গা এলিয়ে গল্প করতে বেশ লাগছে এখন। একটু আগেই গরম কফি খেয়েছে।

প্রেমা কথায় কথায় বলল, এত মূল্যবান উপহার পাবার মত যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনে করি না। আমার কিন্তু ভীষণ সংকোচ হচ্ছিল উপহার পেয়ে।

জয়কিষণ বললেন, খুশি হও নি ?

খুশি যে একেবারে হইনি তা বলব না তবে অস্বস্তি বোধ করেছি অনেক বেশী।

তুমি তৃপ্তি না পেলে মধুবন্তীর আত্মা আজকের এই অনুষ্ঠানে অতৃপ্ত থেকে যাবে প্রেমা।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তৃপ্তি পাইনি এমন কথা তো বলি নি। তবে এ আমার সৌভাগ্যের অতিরিক্ত।

দোলন বলল, দিল্লী থেকে তোমার নাচ দেখে ফিরে এসে আমি আর বাবা এ বছরের অনুষ্ঠানের জন্যে এই উপহার দেব বলে ঠিক করেছিলাম।

প্রেমা বিস্ময়ের গলায় বলল, প্রতি বছর এমন বহুমূল্য উপহার দেওয়া বোধ করি লালসিয়া স্টেটের কুমারবাহাদুরের পক্ষেই সম্ভব।

জয়কিষণ বললেন, প্রতি বছরের পুরস্কারের সঙ্গে এ বছরের কোন মিলই রাখেনি দোলন। সে নিজেই এবারকার পুরস্কারের বস্তুটি নির্বাচন করেছে।

দোলন বাবার মুখের ওপর তার খুশি খুশি চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, তোমার মত নিয়েই তো প্ল্যানটা করেছি বাবা।

জয়কিষণ মেয়েকে ইসারায় সম্ভবত আর বেশী কিছু বলতে বারণ করলেন। বাবা আর মেয়ের ইসারাটুকু প্রেমার চোখ এড়াল না।

প্রেমা বলল, নির্বাচন যার দ্বারাই হোক উপহার শুধু দামে নয় রুচিতেও অসাধারণ। আমি নিখুঁত করে দেখার সুযোগ এখনও পাইনি তবে এক ঝলকেই উপহার দাতার শিল্প রুচিকে প্রশংসা না করে পারি নি।

দোলন হঠাৎ বলল, আমার মা ওটা পছন্দ করে তৈরী করিয়েছিলেন আন্টি। মায়ের সব কিছুর ভেতরই দারুণ রুচির পরিচয় আছে। এই যেমন মায়ের প্ল্যানে তৈরী নাটমণ্ডপ। ভাল লাগে নি তোমার ?

এত ভাল লেগেছে যে ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না দোলন।

জয়কিষণ তাকিয়েছিলেন মেয়ের দিকে। দোলন তাঁদের ভেতরের কোন

সিক্রেট যাতে ফাঁস করে না ফেলে সেই জন্যে স্থির চাহনির ভিতর দিয়ে নীরব শাসন।

ওদের একটু দূরে এসে দাঁড়াল একটি পরিচারিকা। দোলন মহলে এই ছিমছাম পরিচ্ছন্ন তরুণী মেয়েটি তার আচার আপ্যায়নে প্রেমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কুমারবাহাদুরের সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াতে সে স্বভাবতই সংকোচ বোধ করছিল। দোলন উঠে গিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কি যেন কথা বলল তার সঙ্গে। ফিরে এসে প্রেমাকে বলল, ভেরি সরি আন্টি এখুনি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আঙ্কেল এখন আমাকে ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাবেন।

প্রেমা বলল, উনি কি রোজ তোমাকে এ সময় শোনান ?

শুধু এই রাসের দিনটিতে। যখন সব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় তখন আঙ্কেল তাঁর কাছে বসিয়ে আমাকে বাজনা শোনান।

আচ্ছা তাহলে তো তোমাকে শুনতেই হবে দোলন। আমি চলে যাবার আগে তোমার আঙ্কেলের বাজনা শুনব কিন্তু।

এখুনি চল না আমার সঙ্গে।

এই মুহূর্তে প্রেমার বড় ক্লান্ত লাগছিল। সে সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, চল যাওয়া যাক।

কুমার জয়কিষণ প্রেমার অনিচ্ছুক সম্মতিটুকু লক্ষ্য করে বললেন, এইমাত্র আন্টি নাচ শেষ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দোলন। অন্য একদিন নিয়ে যেও আঙ্কেলের কাছে।

দোলন মেয়েটির স্বভাবে একটা আকর্ষণীয় মাধুর্য আছে। সে কাউকে আঘাত দিতে চায় না তার জেদ দেখিয়ে। বয়োজ্যেষ্ঠ পরিচারিকাদের ওপর কঠোর আদেশ জারি করে সে কখনো তার মনের সুকুমার সৌন্দর্যের হানি ঘটায় না। তবু তার কিশোরী অবয়বের কোথায় যেন একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যাকে অবহেলা করা বা এড়িয়ে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

বাবার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠল দোলন। যেন প্রস্তাবটা দিয়ে সে অন্যায় করে ফেলেছে এমনি একটা সংকোচের ছবি ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, তুমি ঠিক বলেছ বাবা। আমি অন্য দিন নিয়ে যাব।

প্রেমা তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে ততক্ষণে পরিচারিকাটির সঙ্গে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিয়েছে। যেতে যেতে বলছে, আজ নয়, কোন মতেই আজ নয় আন্টি।

ওরা চলে গেলে প্রেমা সিধে হয়ে বসে বলল, তুমি আমাকে বাধা দিলে কেন জয়কিষণ। দোলন মনে মনে হয়ত কষ্ট পেল।

একটুও না। মনে আর মুখে বলতে পার ও একটু বেশী রকমেই এক। আর তাছাড়া এখন তোমার বিশ্রামের দরকার।

প্রেমা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল আবার। বলল, নাচে সারা শরীরে একটা তোলপাড চলতে থাকে। সুখ দুঃখের এক্সপ্রেশান গুলোতেও মনের ওপর চাপ পড়ে খুব বেশী। তবে শিল্প সৃষ্টির আনন্দ সব কিছুর ওপর দারুণ একটা তৃপ্তি এনে দেয়।

জয়কিষণ বললেন, তুমি মোহিনী আট্যম আর ভারত নাট্যমের মাঝখানে যখন সেই ইয়ার রিং খোঁজার অভিনয় করতে করতে স্টেজ থেকে নেমে এসেছিলে তখন আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি যে তুমি অভিনয় করছ। তোমার চোখে মুখে প্রিয়বস্তু হারানোর দুঃখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, আশানিরাশার দোলা সবকিছু মিলে সে এক অবর্ণনীয় এক্সপ্রেশান।

প্রেমা বলল, আমার গুরু মাধবী আম্মা এই উপভোগ্য অনুষ্ঠানটুকুতে যে রকম কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন তার শত ভাগের এক ভাগও যদি আমি দেখাতে পারতাম তাহলে তোমার আমন্ত্রিত অতিথিরা সত্যিকারের কিছু দেখতে পেতেন।

তুমি খুব বেশী রকমের গুরু ভক্ত প্রেমা।

সেটাই স্বাভাবিক নয় কি ?

আমি কিন্তু তোমাকে কোন রকম পরিহাস করতে চাই নি প্রেমা আমি শুধু সত্যটুকুই প্রকাশ করতে চেয়েছি।

প্রেমা বলল, তোমার স্ত্রীর বুক সেল্ফে ইণ্ডিয়ান আর্টের ওপর একখানা বই আছে। তাতে প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের দারুণ একটা বর্ণনা দেখতে পাবে। পড়ে দেখো।

কিসের বর্ণনা প্রেমা ?

এই যে আমাকে যে নাচটির ওপর কমপ্লিমেণ্ট দিলে সে নাচটি সম্বন্ধে। আর আমার গুরুই সে নাচ তাঁর যৌবনে নেচেছিলেন। দর্শক ছিলেন ঐ গ্রন্থের লেখক স্বয়ং।

জয়কিষণ হেসে বললেন, আমি জানি তোমার গুরু কত বড় শিল্পী। তবু বলব তুমি তোমার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন নও।

একটু কি ভেবে নিয়ে প্রেমা বলল, থাক ও প্রসঙ্গ। কিন্তু জয়কিষণ সত্যি করে আমাকে একটা কথা বলবে ?

আমি বুঝি সব কথাই বানিয়ে বলি ?

অমনি রাগ হয়ে গেল তো।

আচ্ছা বল কি বলতে চাও।

আমাকে আজ যে বস্তুটি দিয়ে সম্মানিত করলে সেটি কি তোমার স্ত্রীর জিনিস ?

তুমি বুদ্ধিমতী প্রেমা। দোলনের কথার ভেতর থেকে সবকিছু আঁচ করে নিয়েছ।

এবার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে ?

বল।

কেন তোমার স্ত্রীর এত সখের জিনিসটা আমাকে দিলে ?

আমি তো দিই নি। দোলন তার মায়ের জিনিস তোমাকে ভালবেসে দিয়েছে।

অন্য দিকে চেয়ে চুপ করে রইল প্রেমা।

কিছুক্ষণ পরে জয়কিষণের মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, তোমার সম্মতি ছিল না এই উপহারে ?

খুব কঠিন প্রশ্ন করে বসলে প্রেমা। সম্মতি ছিল না একথা কি করে বলি। তবে পরিকল্পনাটা এসেছে দোলনের কাছ থেকে। আর ওর মায়ের জিনিসে একমাত্র ওরই অধিকার। তাই আমি ওকে বাধাও দিই নি।

প্রেমা আবার প্রশ্ন তুলল, যদি দোলনের না হয়ে ওটা তোমার অধিকারে থাকত তাহলে পারতে এমন করে স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষার জিনিসটাকে একজন স্বল্প পরিচিতা নর্তকীর হাতে তুলে দিতে ?

জয়কিষণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এক সময় বললেন, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় যে খুব বেশী দিনের নয় তা ঠিক, তবে তোমার নাচের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক গভীর। তোমার মনের স্রোতের আঁক-বাঁক সম্বন্ধে এখনও আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম কিন্তু তোমার নাচের প্রতিভার ওপর একটা যথাযথ প্রবন্ধ লেখা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে খুব একটা অসম্ভব কাজ নয়। এবার আসল কথায় আসা যাক। উপহারটা প্রেমা মেনন নামের একজন সুন্দরী তরুণীকে দেওয়া হয়নি, হয়েছে একজন প্রতিভাময়ী নর্তকীকে।

থামলেন জয়কিষণ। প্রেমা বলল, আমার আসল প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও পাই নি।

প্রশ্নের ভঙ্গীতে তাকালেন জয়কিষণ।

প্রেমা আবার বলল, স্ত্রীর এমন প্রিয় বস্তুটি তোমার হেফাজতে থাকলে তুমি কি পারতে ওটা আমাকে দিতে?

একটু চিন্তা করে জয়কিষণ বললেন, আমি মানুষ প্রেমা তাই শুধু নাচ ভালবাসি বললে মিথ্যে বলা হবে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীকেও ভাল লেগে যায়। আর ভাল লাগার জনকে তো সব কিছু দিতেই ইচ্ছে করে।

প্রেমা অমনি বলল, এই মুহূর্তে মধুবন্তী আমাদের মাঝখানে থাকলে পারতে তুমি এমন কথা বলতে?

জয়কিষণ বললেন, কথাটা তো মিথ্যে নয় তবে স্ত্রীর সামনে এমন এক গুণী নর্তকীকে এই সত্যি কথাটা বুক ঠুকে বলতে পারতাম এমন কথা হলপ করে বলি কি করে।

প্রেমা অন্যমনস্কভাবে বলল, আমার ভাবতেই কেমন কষ্ট লাগছে।

কিসের কষ্ট প্রেমা?

তোমরা বাবা আর মেয়েতে যুক্তি করে মধুবন্তীর স্মৃতিটুকু আমার হাতে তুলে দিলে।

আগেই তো বলেছি প্রেমা এতে মধুবন্তীর আত্মা তৃপ্তি পাবে। আমি বিশ্বাস করি আমার মনের ভেতর বেঁচে থাকার চেয়ে একজন গুণী শিল্পীর স্মৃতির ভেতর বেঁচে থাকতে পারলে তার আত্মা তৃপ্ত হবে বেশী।

প্রেমা বলল, আমি তোমাদের পরিবারের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি জয়কিষণ। তুমি আমার চেয়ে বড় তাই আশীর্বাদ কর যেন তোমাদের এই দানের মর্যাদা আমি রাখতে পারি।

প্রেমা জয়কিষণের জানু স্পর্শ করতে যাচ্ছিল, জয়কিষণ উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমার দুটো হাত ধরে ফেললেন।

আমাকে এতখানি মর্যাদা দিও না প্রেমা। একজন প্রতিভাধর শিল্পীকে শুধু বয়েসের দাবীতে আশীর্বাদ জানাব এমন গুরুজন আমি নই। তবে আজ তোমার দুটো হাত আমার হাতের ভেতর ধরা রয়েছে। শুধু এই অন্তরঙ্গতার দাবীতেই বলব তুমি আমার অতি প্রিয় শিল্পী। জীবনে কোনদিন তোমার কোন প্রয়োজনে আসতে পারলে আমি দারুণ তৃপ্তি বোধ করব।

প্রেমাকে তার চেয়ারে বসালেন জয়কিষণ। নিজে প্রেমার পাশের চেয়ারটিতে বসলেন।

এক সময় কোমল আলোছায়ার রহস্যময়তার ভেতর প্রেমাকে চুপচাপ বসে

থাকতে দেখে জয়কিষণ বললেন, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ প্রেমা। চল বিশ্রামের আয়োজন করা যাক।

তেমনি চেয়ারে গা এলিয়ে বসে প্রেমা বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিল জয়কিষণের দিকে। চোখ দুটি কিন্তু রইল ভ্যালির দিকে যেখানে কুয়াশার স্তূপের ওপর চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে।

জয়কিষণ প্রেমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানা ধরলেন। ছোট ছোট বাক্যহারা খেলায় কখন মেতে উঠল অবাধ্য আঙুলগুলো। প্রেমের লীলায় এই আঙুলের ভূমিকাই বোধহয় সর্বাধিক। পত্র রচনা থেকে হাতে হাতে শব্দহীন কথকতার অননুভূত বিদ্যুৎ স্পর্শ এই আঙুলগুলিরই দান।

কতগুলো প্রহর এমনি হাতে হাত রেখে কেটে গেল। দুজনেই নির্বাক। দুটি মনের ভেতর শুধু আলোড়ন। প্রেমার স্মৃতি থেকে এই মুহূর্তে মুছে গেছে দেবন যার জন্যে সে সবকিছু উজাড় করে দিতে পারে। তার যৌবন তার সম্পদ এমন কি তার অভাবনীয় জনপ্রিয়তা। যে দেবনকে সে তার শিল্প জীবনের সঙ্গী বলে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সেই আশ্চর্য প্রতিভাধর নর্তক যেন কোনদিন তার জীবন মঞ্চে দেখা দেয় নি এমনি এক অপরিচয়ের কুয়াশা তার স্মৃতিকে এই মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সাগর পারের যে পাখিটি নীল আকাশে ডানা ভাসিয়ে একদিন উড়ে এসেছিল কোভালম বীচের সবুজ নারিকেল কুঞ্জে যার সোনালী ডানার আড়ালে একদিন প্রেমা অননুভূত উত্তাপের স্বাদ পাবার জন্যে হারিয়ে গিয়েছিল, সেই সিন্ধু পারের পাখিও আজ আর তার স্মৃতির আকাশে নেই। এখন তার পূর্ণ তরুণী দেহের তটে আছড়ে পড়ছে যে ঢেউ রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে সেই উদ্দাম স্পর্শগুলো সে এখন অনুভব করছে। তার মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ-এ গা ভাসিয়ে দিয়ে যে বলিষ্ঠ পুরুষ এগিয়ে আসছে, তটভূমি স্পর্শ করতে তার বেশী বিলম্ব নেই। দুটি বাহু বুক সর্বাঙ্গ দিয়ে সে পুরুষ আলিঙ্গন করবে তার নরম চিক্কণ সোনালী দেহ। প্রেমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। থরথর করে কাঁপতে লাগল। তীব্র একটা উত্তাপের ছোঁয়ার জন্যে সে যখন সতৃষ্ণ দুটো চোখের দৃষ্টি ফেলল জয়কিষণের মুখের ওপর তখন দেখল আশ্চর্য প্রশান্ত দুটি চোখ তার দিকেই চেয়ে আছে। সে চোখে আগুনের লকলকে শিখার মত ক্ষুধার চিহ্ন নেই। ঐ নীল আকাশের পূর্ণ চাঁদের মত তার দুর্বার আকর্ষণ। সে আকর্ষণে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ে সাগরের ঢেউ, কিন্তু আকর্ষণকারীর চিত্তের সামান্যতম আলোড়নও চোখে পড়ে না।

প্রেমা বলল, কি দেখছ আমার দিকে চেয়ে ?

উত্তেজনায় গলা কেঁপে গেল প্রেমার।

জয়কিষণ বললেন, গাছের পাতার একটা ভারী সুন্দর ছায়া পড়েছিল তোমার মুখের ওপর। খানিক আলো খানিক ছায়া এতক্ষণ লুকোচুরি খেলা খেলছিল। আমি তাই অবাক হয়ে দেখছিলাম। এখন যেই মুখ তুলে তাকালে অমনি খেলা ফেলে ওরা পালাল।

রুদ্ধ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল প্রেমার বুক ঠেলে। আর ঐ নিঃশ্বাসের মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমার মনের উত্তাল ঢেউগুলোও হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল।

প্রেমা বলল, জান জয়কিষণ পরিবেশ মানুষের মনে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। আমার তো মনে হয় পরিবেশ যেন এক নিপুণ যাদুকর। সে তার যাদু দণ্ড ডুলিয়ে তোমার চৈতন্যটুকু লুপ্ত করে দিয়ে তার ইচ্ছে মত কাজ তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে। সে যখন সরে যাবে আর তুমি চেতনা ফিরে পাবে তখন নিজের বোকামীর কথা ভেবে তুমি নিজেই লজ্জা পাবে।

জয়কিষণ চাঁদের আলো ধোওয়া দূর উপত্যকার রহস্যময়তার দিকে চেয়ে বললেন, ঠিকই বলেছ প্রেমা। আজ পরিবেশ সত্যি যাদুকর সেজেছে। আজ যদি ও আমাদের সমাজ সংসার বিবেককে মিথ্যে করে দেয় তাহলে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

প্রেমা তখন আর ভাবনার জগতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সে পরিবেশের কথা চিন্তা করতে করতে অনেক দূর চলে গেছে।

হঠাৎ প্রেমা বলল, একদিন দাঁড়িয়েছিলাম আরব সাগরের ধারে। দমকা বাতাস ধেয়ে এল। ঘনিয়ে উঠল মেঘ। কতকগুলো পাখি মেঘের সঙ্গে উড়তে লাগল। বাতাস ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় কতদূর তারপর বাতাস থামলে ওরা পাখা টেনে চক্কর দিতে থাকে। সে এক আশ্চর্য খেলা। আমি পাখি হয়ে গেলাম। আমার হাত দুটো ডানার মত বাতাসে ভাসিয়ে ভেজা বালির ওপর দিয়ে আমি দৌড়ে গেলাম কতদূর। তারপর হঠাৎ থেমে পাক দিয়ে দিয়ে ওদের মত ঘুরতে লাগলাম।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল অনেকদিন পরে একটা শ্রেষ্ঠ নাচ নাচলাম।

জয়কিষণ বললেন, তুমি আর পরিবেশ অভিন্ন প্রেমা। বিভিন্ন পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের মত। তুমি উত্তেজক সুরা। যে পাত্রে আশ্রয় নাও, তারই আকার পাও তুমি।

প্রেমা উঠে পড়ে জয়কিষণের হাত ধরে টান দিয়ে ওঠাল। বলল, এসো আমার সঙ্গে একবার নাটমণ্ডপে।

খেয়ালীর খেলার পুতুলের মত জয়কিষণ প্রেমাকে অনুসরণ করে চললেন মঞ্চের দিকে।

নাটমণ্ডপে ঢুকেই প্রেমা সামনের দর্শক আসনের একটিতে বসিয়ে দিল জয়কিষণকে। নিজে সিঁড়িতে পায়ের ছন্দ এঁকে এঁকে উঠে গেল মঞ্চের ওপর। মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, হৃষিকেশের গঙ্গার নাচ দেখেছ? ঐ যেখানে বিরাট বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গা আঁচল উড়িয়ে পাক দিতে দিতে ছুটে চলে যায়?

জয়কিষণ বললেন, গঙ্গার ও রূপ আমার দেখা।

তাহলে মিলিয়ে নাও।

কথাটা বলেই প্রেমা নাচের ভঙ্গীতে মঞ্চের একদিকে ছুটে গেল। তারপর যেন বিরাট এক বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে আশ্চর্য কয়েকটা পাক দিতে দিতে ছুটে গেল মঞ্চের আড়ালে। বাঁ হাতে উড়িয়ে দেওয়া সাদা আঁচলখানা ঠিক যেন ছলকে ওঠা জলের একটুকরো আঁচল বলে মনে হয়।

এত দ্রুতলয়ে প্রেমা নেচে চলে গেল যে জয়কিষণের মনে হল প্রেমা সাধারণ কোন নর্তকী নয়, সে খরপ্রবাহিনী গঙ্গা।

এবার নেমে এল প্রেমা দর্শক আসনের কাছে। জয়কিষণের মুখের অনেক কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল, কেমন দেখলে জয়?

প্রেমার হাত নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে জয়কিষণ বললেন, তুমি গঙ্গা প্রেমা।

নাচের পরদিনই পুরো দলটা রওনা হয়ে গেল। শুধু বাতিল হল প্রেমার যাত্রা। সারারাত দোলনের সে কি কান্না। সে জেগে বসে রইল প্রেমার বিছানার পাশে। নিজে ঘুমোতে গেল না প্রেমাকেও ঘুমোতে দিল না।

প্রেমার প্রথম প্রবোধ, আমি আসব দোলন।

না তুমি যাবে না, দোলনের গলায় বারণ উপচে উঠল।

আমি কি তোমাদের কাছে হাজার হাজার বছর থাকব বলে এসেছি? প্রেমার মনে হাসি, গলায় উত্তর শোনার কৌতুহল।

থাকবে। মোট কথা কাল তোমার যাওয়া হবে না।

আচ্ছা বেশ, রাত ভোর হতে এখন অনেক বাকী। তারপর সূর্য উঠবে।

এক ঘণ্টা অন্তর ঢং ঢং ঢং ঢং করে রাজবাড়ীতে চার চারটে ঘণ্টা বাজবে। তখন বেলা দশটা। গাড়ী আসবে গেস্ট হাউসে। মালপত্র বোঝাই হবে। তারপর খাওয়া দাওয়ার পালা। সে সব চুকে-বুকে যেতে প্রায় দুটোর কাছাকাছি। তারপর দলবল গাড়ীতে উঠে রওনা দেবে আগে। তারা স্টেশনে পৌছে লাগেজ ভ্যানে মাল তুলবে কতক্ষণ ধরে। তখন ধর, বেজেছে চারটে। তোমার বাবার গাড়ী এসে দাঁড়াল আমাকে নিয়ে যেতে।

না, বাবার গাড়ী আর আসবে না। তুমিও যাবে না।

তাহলে আমার সঙ্গীরা ট্রেনে বসে কি ভাববেন বল তো?

ওঁরা খুব ভাল লোক। ওঁরা কিছুই ভাববেন না। তাছাড়া যাবার আগেই তো ওঁরা জেনে যাচ্ছেন তুমি যাবে না ওঁদের সঙ্গে।

ওঁদের সঙ্গে আমাকে না দেখলে আমার বোন খুব দুঃখ পাবে দোলন। তোমার মত রাগ করতেও পারে।

ওঁকে আনিয়ে নেব আমাদের কাছে। তোমারও দুঃখ থাকবে না। আর তোমার বোনও রাগ করবে না আর।

দারুণ মেয়ে তো তুমি, এত সহজে সব সমাধান করে দিলে। আমার বুঝি বাড়ী-ঘর নেই? সেখানে টাকা পয়সার দরকার নেই?

কত টাকা চাই তোমার আণ্টি?

হেসে ফেলল প্রেমা। বলল, তোমার বুঝি অনেক টাকা আছে, আর লোককে তাই বিলিয়ে বেড়াও?

বল না আণ্টি তোমার কত টাকা চাই? কত টাকা পেলে তুমি আর আমাকে ছেড়ে যাবে না?

দোলন তার সর্বস্ব এই মুহূর্তে বিলিয়ে দিতে পারে তার আণ্টির জন্যে।

দারুণ হাসি পেল প্রেমার। তবু সে গম্ভীর গলায় বলল, তা মাস গেলে হাজার পাঁচেক পেলেই চলে যাবে আমার।

বাবাকে বলে তোমাকে সব টাকা দিয়ে দেব আণ্টি। তুমি কথা দাও আমার কাছে থাকবে।

প্রেমা এখনও নিষ্ঠুর। বলল, আচ্ছা, আগে তোমার বাবাকে বল, তারপর থাকা না থাকার কথা ভাবা যাবে।

দোলন অমনি বলল, বাবা ঠিক রাজী হয়ে যাবে।

প্রেমার মুখে মৃদু হাসি, মাথাটা অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।

এক লাফে প্রেমার বিছানা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল দোলন। দরজা

পেরিয়ে যেতেই খেয়াল হল প্রেমার। সে চেঁচিয়ে উঠল, যাচ্ছ কোথায় দোলন, শুনে যাও।

কে শোনে কার কথা। বাবাকে এনে হাতে-নাতে সে প্রমাণ করে দেবে যে তার কথার কত দাম।

বারান্দা পেরিয়ে প্রায় দৌড়ে বাইরের মহলে গিয়ে পড়ল দোলন। বড় বড় পামগাছগুলো তিন তলায় গিয়ে ঠেকেছে। তারা মাথা দুলিয়ে যেন জানতে চাইছে এমন নিশুতি রাতে এই নিষিদ্ধ এলাকায় দোলনের আগমনের কারণ।

দোলনকে দেখে রাতের পাহারাদার উঠে দাঁড়াল। দোলন ড্রইংরুম পেরিয়ে ঢুকে পড়ল বাবার শোবার ঘরে। দরজা ভেজান ছিল তাই বেল টিপে ওঠাতে হল না। দোলন ভেতরে ঢুকেই ডাক দিল, বাবা।

জয়কিষণ বসেছিলেন স্ত্রীর পালঙ্কে। তিনি আজ নিজের শয্যায় যান নি। ধূপ জ্বলছিল পেতলের ধূপদানিতে। শয্যার শিয়রে রাণী মধুবন্তীর বাঁধান ছবিতে মালা দেওয়া। জয়কিষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন সেই দিকে।

দোলনের ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকালেন জয়কিষণ। অসময়ে দোলনের আসাতে কিছুটা বিস্ময় চোখে মুখে ফুটে উঠল।

দোলন কাছে এসে বাবার গলা জড়িয়ে বলল, আমি আন্টিকে কথা দিয়েছি বাবা।

কোন ভণিতা নেই দোলনের কথায়।

জয়কিষণ বললেন, কথা যখন দিয়েই ফেলেছ তখন তা রাখতেই হবে।

জয়কিষণ জানতেও চাইলেন না কি কথা।

দোলন এবার বাবার একখানা হাত ধরে টান দিয়ে বলল, আমার সঙ্গে এসো না একবারটি।

জয়কিষণ বাধ্য ছেলের মত উঠে দাঁড়ালেন। দোলন তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল অন্দরমহলের দিকে।

শোবার ঘরের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন জয়কিষণ। মেয়েটার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। একেবারে টেনে আনল শোবার ঘরে। দোলন আবার টান দিয়ে বলল, এসো না বাবা আন্টির কাছে।

প্রেমা বিছানায় বসে জড়োসড়ো। নাইটির ওপর দামী র‍্যাপারখানা জড়িয়ে নিয়েছে সে।

জয়কিষণ বললেন, তোমার আন্টি ঘুমুচ্ছে দোলন, এখন তাকে ডিস্টার্ব করো না।

যদ্দূর সম্ভব নিজেকে আবৃত করে প্রেমা ভেতর থেকে বলল, আমি জেগেই রয়েছি। এসো ভেতরে।

জয়কিষণ সবুজ আলোর রাজ্যে ঢুকে এলেন।

প্রেমা বসতে বলল জয়কিষণকে।

জয়কিষণ বসলে প্রেমা বলল, কি খেয়ালী মেয়েটা না তোমার। রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে ধরে আনল তোমাকে।

না, আমিও জেগেছিলাম। কিন্তু দোলন কাকে যেন কি কথা দিয়েছে বলে আমাকে এখানে টানতে টানতে নিয়ে এল।

প্রেমা খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, ব্যাপারটা তোমার এখনও জানা হয় নি বুঝি?

দোলন বিজ্ঞের মত হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, আচ্ছা বাবা শোন, আন্টির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমি যদি আন্টিকে মাসে মাসে পাঁচ হাজার করে টাকা দি তাহলে আন্টি আর দেশে যাবে না, আমার কাছেই থেকে যাবে। আমি বলেছি দেব বলে।

প্রেমা হাসতে হাসতে খাটের ছত্রীখানা ধরে সামলে নিল।

জয়কিষণ বললেন, এই কথা। তা তুমি যখন কথা দিয়েছ আর তোমার আন্টিও রাজী হয়েছে তাহলে তো সব ফয়সালাই হয়ে গেছে।

আন্টি, তোমাকে বলেছিলাম না বাবা রাজী হবেই হবে।

প্রেমা বলল, হার মানছি। টাকা আমার আর চাই না। দোলন মুক্তি দিলে তবে আমার ছুটি।

দোলন এসে প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, লক্ষ্মী আন্টি। আমার স্কুল ক'দিন পরেই খুলে যাবে, তখন তোমার ছুটি। তার আগে নয়।

জয়কিষণ বললেন, যাবে প্রেমা মুসৌরী? ক'দিন সবাই মিলে ওখানে কাটিয়ে দোলনকে কনভেন্টে রেখে ফিরে আসা যাবে।

হৈ হৈ করে উঠল দোলন, দারুণ আইডিয়া বাবা। কালই যাই চল।

জয়কিষণ তাকালেন প্রেমার দিকে।

প্রেমা বলল, এখন তো আমার নিজের ইচ্ছা বলে কিছু নেই। দোলন যখন আমাকে কিনে নিয়েছে তখন ওর ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা।

জয়কিষণ মেয়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। প্রেমাকে বললেন, দেখ কেমন শক্ত জালে জড়িয়েছে তোমাকে দোলন। পালাবার পথটুকুও রাখে নি।

জয়কিষণের পূর্বপুরুষ গর্গেরা কেবল বিত্তবানই ছিলেন না, তাঁরা সম্পদের সদ্ব্যবহারও জানতেন। মুসৌরীতে বিরাট গ্রীষ্মাবাস তৈরী করিয়েছিলেন তাঁরা। কোম্পানী বাগানের পথে সে এক দর্শনীয় প্রাসাদ। ছোট দুর্গের আকারে তৈরী। প্রতিটি গৃহের শীর্ষদেশ বল্লমের আকারে সুচল। সব কটি ঘরের থেকেই তুষার পাহাড়ের ছবি দেখা যায়। ওদিকে লাল টিব্বার গায়ে থরে থরে উঠে গেছে পাইনের গাছ। ভ্যালির ওপারে গীর্জা।

একটি অবাক ভুলভুলাইয়া আছে সৌধটির ভেতর। বিশেষভাবে না অভ্যস্ত হলে ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ঘরের ভেতর ঘর আর করিডোর পেরিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে আর আসা যায় না।

নির্দিষ্ট ঘরখানাতে ঢুকেই ভারী ভাল লেগে গেল প্রেমার। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, এক টুকরো মেঘ ভ্যালির ওপারে গীর্জার চূড়ায় থমকে আছে। পাইন বনের মাঝামাঝি এক খণ্ড কুয়াশা পাতলা র‍্যাপারের মত জড়িয়ে আছে বনের গায়ে।

ছিমছাম সুন্দর ঘর। দোলন বেয়ারা দরোয়ানদের সঙ্গে কি যেন আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তার গলার সুরেলা আওয়াজ ভেসে আসছে।

যেন গায়ে কার উষ্ণ একটা নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগল। ছবি দেখায় তন্ময় প্রেমা সেই উষ্ণতার উৎস নিয়ে মাথা ঘামাল না।

পাশ থেকে কে যেন বললেন, জায়গাটা তোমার ভাল লেগেছে প্রেমা?

চমকে ফিরে চাইল প্রেমা। জয়কিষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে।

একটা দারুণ তৃপ্তির ছবি চোখে মুখে ফুটিয়ে প্রেমা বলল, এ ভাল লাগা তো ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না জয়কিষণ। তবে এটুকু বলব, এখানে না এলে অনেক দেখাই আমার অপূর্ণ থেকে যেত।

জয়কিষণ বললেন, আমার সবচেয়ে দুঃখ এ বাড়ীখানা গভর্নমেণ্টকে ছেড়ে দিতে হবে।

কেন? বিস্ময়ে দুঃখে যেন ভেঙে পড়ল প্রেমা।

কেনর তো কোন জবাব নেই। অনেকদিন অনেক সুখ-সুবিধে ভোগ করার পর বলতে পার এখন একটু ত্যাগ করা দরকার।

এ তো স্বেচ্ছায় ত্যাগ নয়। দুঃখ নিয়ে সরে যাওয়া।

তোমার বিশ্বাস করতে হয়ত বাধবে, কিন্তু আমি কোন কিছুতেই আর দুঃখ পাই না প্রেমা। আর তাছাড়া আমার একার সুখের চেয়ে দেশের মানুষের যদি কিছু উপকার হয় তাহলে মন্দ কি।

একটু থেমে আবার হেসে বললেন, বড় বেশী জনহিতের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আমার কথায়, তাই না। বলতে পার উপায়হীনের আত্মতুষ্টির চেষ্টা।

প্রেমা বলল, আইন হলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু আমার বাড়ী হলে সরকার বাহাদুরকে একটা অনুরোধ করতাম, এখানে একটা কলাভবনের প্রতিষ্ঠা হোক। আর তা যদি একান্ত নাও হয় তাহলে আব যা হয় হোক কিন্তু সরকারী কোন অফিস নৈব নৈব চ।

শুনছি একটা হাসপাতালের পরিকল্পনা আছে গভর্নমেণ্টের।

প্রেমা সোচ্ছ্বাসে বলল, সবকাব দীর্ঘজীবী হোক। হাসপাতালের পরিকল্পনাকে বরং আমবা স্বাগতম জানাতে পারি।

হঠাৎ কলাভবন ছেড়ে হাসপাতালের ওপব অনুরাগী হয়ে উঠলে যে বড ?

না, আমাব ফার্স্ট প্রেফাবেন্স কলাভবন। তা নইলে হাসপাতালকেই চাইতে পারি একমাত্র।

কেন?

এই জানালাগুলো দিয়ে বাইরে তাকালেই রোগীদের আদ্দেক রোগ ভাল হয়ে যাবে।

জয়কিষণ প্রেমার উচ্ছ্বাসের কাবণটা বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন।

হাসছ যে ?

কারণ আছে নিশ্চয়ই।

আমি কি অকারণে হাসছ বলে বলেছি।

জয়কিষণ বললেন, প্রথমত বোগ ব্যাপারটাই ভয়ের। তাই নিরুপায় না হলে মানুষ হাসপাতালে আসতে চায় না। দ্বিতীয়ত দেহের সামান্যতম যন্ত্রণা থাকলেও সৌন্দর্য উপভোগ সম্ভব নয়। তৃতীয় আর একটা কারণ আছে, তা হল, এখানকার রোগীরা এই প্রাকৃতিক দৃশ্যে অভ্যস্ত। তাই নতুন করে মনে সাড়া জাগানোর মত উপাদান এর ভেতর বড় একটা নেই।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে তার মত বদল করে বলল, তোমার কথাই ঠিক জয়কিষণ। বড় জোর এটা আফটার কিওর রেস্ট হাউস হতে পারে।

জয়কিষণ বললেন, তুমি কি জান, আমি একজন ডাক্তার ?

সন্দেহের চোখে জয়কিষণের দিকে তাকাল প্রেমা। বলল, শুধু ডাক্তার কেন, অনেক কিছুই হতে পার তুমি।

বিশ্বাস অবশ্য না হবারই কথা। আমাকে কোন দিন তো আর কলে বেরোতে দেখনি।

সত্যি বলছ জয়, তুমি ডাক্তার ?

কোন এক জন্মান্তরে হয়ত ছিলাম, এখন নয়। এখন আমি ঘোরতর ব্যবসায়ী।

ওকথা বল না। জয়কিষণ একজন রুচিবান ব্যক্তি। সে যে প্রফেসানের হোক না কেন তাতে কি এসে যায়।

জয়কিষণ বললেন, অভয় পেলাম।

প্রেমা আর কোন কথা বলল না। মুখে হাসি ফুটিয়ে চেয়ে রইল জয়কিষণের মুখের দিকে।

খাবার পরেই প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেল দোলন আর জয়কিষণ। কথা রইল ওরা ফিরে এসে আবার বেরুবে মার্কেটের দিকে প্রেমাকে নিয়ে। প্রেমা একা রইল দুর্গ-প্রাসাদে।

নিজের ঘরে খুব বেশী সময় বন্দী হয়ে থাকতে ইচ্ছে হল না তার। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটা ব্যালকনিতে। চোখ গিয়ে পড়ল প্রবেশপথের ওপর। কেউ কিছু খাবার ছড়িয়ে দিয়েছে। ধবধবে সাদা আর ব্রাউন রঙের অনেকগুলো পায়রা একসঙ্গে জট বেঁধে হুটপাট করে তাই খাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর সে আবার আর একদিকে চলতে লাগল। সামনের অনেকগুলো ঘরই বন্ধ। করিডোর পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরে একটা ঘোরানো সিঁড়ির দেখা মিলল। সিঁড়িটা একবারে ছাদের ওপর গেছে নাকি। ছাদ থেকে নিশ্চয় আশ্চর্য সুন্দর লাগবে চারদিকের ছবি। প্রেমা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। বেশখানিক উঠেই সিঁড়িখানা থেমে গেল এক চিলতে শ্বেতপাথরের ল্যাণ্ডিং-এ। প্রেমার চাঁপা রঙের দুটো পা শ্বেত পাথরের ওপর ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। যে কোন শিল্প রসিক সিঁড়ি থেকে প্রেমার পা বাড়িয়ে অবতরণ দৃশ্যটুকু মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখত। পায়ের গোছ থেকে কাপড় ঈষৎ তুলে সুঠাম আঙুলগুলো গোলাপের পাপড়ির মত বেঁকিয়ে নাচের ছন্দে সে যেন নেমে এল শ্বেত পাথরের মঞ্চে।

কেউ ছিল না সেখানে জাত নর্তকীর প্রতিটি ভঙ্গী চোখের ক্যামেরায় ধরে রাখার জন্যে। নির্বোধ দুটো পায়রা দেওয়ালের একটা ঘুলঘুলিতে বসে অপরিচিতার দিকে ভয় মেশান কৌতূহলের চোখে চেয়েছিল।

প্রেমা সামনের ঘরখানাতে উঁকি দিল। দামী ফরাস পাতা। বোধহয় এককালে জলসাঘর ছিল এটি। দেয়ালে নানারকম বাদ্যযন্ত্র ঝোলান। কোনটি আবরণ দেওয়া, কোনটি বা নিরাবরণ, ছিন্নতন্ত্রী। ফরাসের ওপর একটি সরোদ

রাখা আছে। তার পাশেই খোলা পড়ে আছে তবলা। এখানে বাতাসে ধূলোর বিশেষ কর্তৃত্ব নেই। তাই যন্ত্রগুলিতে ধূলো জমে ওঠেনি। আর তাই বোঝাও গেল না কতদিন আগে যন্ত্রী তাঁর শেষ রজনীর বাজনা বাজিয়ে গেছেন এই রাজবাড়ীর জলসাঘরে।

প্রেমার মনে হল আবছা আলো অন্ধকারে হঠাৎ বাজনাগুলো বেজে উঠল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র সব স্বর শুনতে লাগল। কিন্তু কোন শিল্পীকে তার চোখের সামনে দেখতে পেল না।

ঘোর কাটল এক সময়। আবার পা চালাল সামনের দিকে। এবার আঁকবাঁক সব বারান্দা। বারান্দার দেয়ালে সংলগ্ন অনেকগুলি তৈলচিত্র। কেউ অশ্বারোহী, কেউবা সভায় বসে ফরসিতে ধূমপানরত। পায়রা উড়ছে আকাশে। এক রাজবধূ প্রাসাদ অলিন্দ থেকে তাই দেখছেন। এক রাজকুমার বীণা বাজাচ্ছেন। অপূর্ব তাঁর দেহের গঠন।

চোখ তুলে কতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগল প্রেমা। এই গর্গ পরিবারের ছবি বলেই মনে হল তার। জয়কিষণের মুখের সঙ্গে তার পূর্ব পুরুষদের আদলের মিল খুঁজতে লাগল সে। একসময় কথায় কথায় অবাক করে দেবে সে জয়কিষণ আর দোলনকে। চুপি চুপি সব দেখে ফিরে যাবে সে নিজের ঘরে। তারপর আভাসে ইংগিতে এমন সব কথা বলবে যাতে বিস্মিত হয়ে যাবে ওরা।

ওদের ফিরে আসার আগেই প্রাসাদখানা ঘুরে দেখে নিতে হবে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নতুন নতুন রহস্যের সন্ধানে চলল প্রেমা। প্রতিটি ঘরই দর্শনীয়। প্রতিবাঁকে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। হঠাৎ যেন প্রকৃতির এক-একখানা জানালা খুলে যায়। বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা যায় মুসোরীর ছবি। আবার ঘর আবার করিডোর। নতুন নতুন রহস্য। অবাক করে দেওয়া সব আবিষ্কার।

একটা নেশার ঘোরে সে কতক্ষণ ঘুরে চলেছিল তা আর মনে নেই, হঠাৎ একটা ঘরের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকার নেই আলোও নেই। সবকিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু স্পষ্ট নয়। ঘরের দরজা আধখোলা। সাহসী প্রেমা পায়ে পায়ে ঢুকল ঘরের ভেতর। ঢাল তলোয়ার বল্লম বন্দুকে ঠাসা ঘরখানা। চারটে বড় বড় দেয়াল জুড়ে আশ্চর্য সব রেখাচিত্র। ব্লু পটভূমির ওপর ব্ল্যাক দিয়ে একদল চেয়ে থাকা বাইসনের দারুণ ছবি এঁকেছে শিল্পী। শিকারীকে দেখে যেন রুখে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে সারা দলটা। একটা হরিণ কান খাড়া করে

দাঁড়িয়ে। বিপদের গন্ধ পেয়েছে সম্ভবত। একটা গাছের বিশাল শাখা বেয়ে গুঁড়ি মেরে নেমে এসেছে একটা চিতা। লাফাবার পূর্ব মুহূর্তে থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে জানোয়ারটা, হিংস্র চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

এমনি জন্তুজানোয়ারের ছবিতে ভরা এ ঘরের দেয়ালগুলো।

দেয়ালের বেশখানিক ওপরে বাঘ বাইসনদের মাথাগুলো সাজান। শিকারীদের কৃতিত্বের সব সাক্ষর। ঘরে ঢোকার সময় পেতলের ঢাল উৎকীর্ণ দরজার মাথায় বিরাট শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের মত শৃঙ্গযুক্ত হরিণের একটি মুখ চোখে পড়ে।

প্রেমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সব। হঠাৎ তার মনে হল ছবিগুলো প্রাণ পেয়েছে। দারুণ শব্দ করে লাফিয়ে পড়ল চিতা হরিণটার ওপর। বাইসনগুলো লাল লাল চোখের বাতি জ্বেলে হুড়হুড় একটা শব্দ তুলে তেড়ে আসতে লাগল।

প্রেমার মনে হল সে একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। টিলার চারদিকে ভ্যালি। ভ্যালির ওপর ছোট ছোট ঝোপ আর ঝরণা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে শাখাবাহু মেলে কয়েকটা বড় বড় গাছ। ঐ ভ্যালিতেই চলেছে একটা ভয়াবহ নাটকের অভিনয়। প্রেমা যার একমাত্র দর্শক।

ভয় প্রেমার বুকখানাকে কোন দিনই কাঁপিয়ে তুলতে পারেনি, তাই আজও সে ভয় পেল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকের ভয়াবহ দৃশ্যগুলো দেখতে লাগল।

ঐ যে দরজার মাথায় বসান শতশৃঙ্গ হরিণটা কোথা দিয়ে যেন এসে গেল রঙ্গমঞ্চে। বিশাল দেহ তার। শিংগুলো যেন বিচিত্র অরণ্য-মুকুট। হাওয়ায় দেহখানা ভাসিয়ে সে যখন এসে দাঁড়াল জানোয়ারগুলোর সামনে তখন সচল মিছিলটা যেন স্টিল পিকচার হয়ে গেল। ঐ সুন্দর শক্তিমান পশুটিকে কোন অলৌকিক শক্তিসম্ভব দেহধারী বলে মনে হল।

দেবযোনি উদ্ভূত মৃগটিকে দেখতে দেখতে প্রেমার মনে হল সে যেন কথাকলি নৃত্যের আসরে বসে আছে। সুন্দর কান্ত এক রাজকুমার হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে প্রবেশ করেছে অরণ্যভূমিতে। মাতঙ্গের মত তার গতিভঙ্গী। রাজহংসের মত গ্রীবার সঞ্চালন। মাথায় কথাকলির কিরীটম। তার চক্রাকার বেষ্টনীর পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে বৃত্তাকারে সাজান তীরের তীক্ষ্ণ ফলা। নাচের মুদ্রায় হাত দুটিকে ঢেউয়ের মত আন্দোলিত করে সে এসে দাঁড়াল অরণ্যের মাঝখানে।

হঠাৎ কোথা থেকে তেড়ে এল রাক্ষসের দল। কৃষ্ণ মুখ রক্ত চক্ষু। আশ্চর্য ভঙ্গীমায় দেহখানা বেঁকিয়ে তূণীর থেকে শর তুলে ধনুতে সংযোজন করল কান্তিমান কুমার। অমনি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল রাক্ষসকুল। শুধু শরাহত রাক্ষসরাজ পড়ে রইল ভূমিস্পর্শ করে।

ছবি আবার বদলে গেল। বাইসনের দল পালাচ্ছে পিছু হটে। হরিণের উদ্যত শৃঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে ভয়ঙ্কর চিতার দেহখানা।

সব মুছে গেল ধীরে ধীরে। চোখের ওপর ভেসে উঠল দেবনের কথাকলি নৃত্যভঙ্গীমার ছবি। কি অনায়াস দক্ষতায় শরসন্ধান করে দেবন। যুদ্ধের সীনগুলোতে দেবনের পদবিক্ষেপ, দেহসঞ্চালন চেয়ে চেয়ে দেখে যেন আশ মেটে না। ও এমন দুর্লভ সুগঠিত দেহখানা পেল কি করে। বৃহৎ বেত্র দণ্ডের মত আশ্চর্য নমনীয় ওর শরীর। কি এক্সপ্রেসিভ ওর চোখের দৃষ্টি। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে এমন এক হয়ে যাওয়া শুধু বুঝি দেবনের পক্ষেই সম্ভব।

এই মুহূর্তে দেবনকে কাছে পেতে চাইল প্রেমা। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

কতক্ষণ পরে বুকের ভার কিছুটা হালকা হলে সে চোখ মুছে তাকাল বাইরের দিকে। সামনের জানালা দিয়ে তখন হিমেল একটা হাওয়ার সঙ্গে ঢুকে আসছিল তাল তাল ঘোলাটে অন্ধকার! প্রেমা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল জানালার বড় বড় গরাদ ধরে। মুসৌরীর দৃশ্য ভাসমান কুয়াশার বোরখায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। দূরে ভ্যালির ওপারে অস্তসূর্যের আলো পড়েছে গীর্জার সাদা চূড়ায়। ভ্যালি থেকে গীর্জা অবধি উঠে গেছে সারি সারি পাইন। পাইনের সবুজ গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কোমল হলুদ আলো। এক দঙ্গল কুমারী মেয়ে যেন বেলা শেষের আলোর প্রপাতে স্নান করছে। হঠাৎ একটা ছবি ফুটে উঠল। পাইন বনের গা বেয়ে উঁচু নীচু পথ। ঐ পথের ওপর দিয়ে সাদা পোশাকে দেহ ঢেকে নানেরা চলেছে চার্চে সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগ দিতে। তুষার ঝরা ঝর্ণার মত আঁকাবাঁকা পথে সারি দিয়ে চলেছে ওরা।

লুব্ধ চোখে প্রেমা দেখতে লাগল ওদের। ঈশ্বরের অলৌকিক করুণা প্রার্থনা করতে করতে অন্তর প্রার্থনার মত বেজে উঠল। সে দুটি হাত প্রার্থনার ভঙ্গীতে জড়ো করে হলের ভেতরে চলতে লাগল। তার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ঈশ্বরের মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা। প্রেমার মনে হল সে এমনি করে স্টেজের ওপর দিয়ে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। ঠিক আজকের এই মুহূর্তের ভাবটিকে সে চিরদিন অন্তরে অক্ষয় করে রেখে দেবে।

হলের ভেতরে একটা ভাবের গভীরে ডুবে এমনি পদ-চারণা করতে করতে কখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাল টেরও পেল না প্রেমা। হঠাৎ ঘোর ভাঙলে সে দেখল ঘরের সব ছবি এক হয়ে গেছে। সে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। করিডোরে তখনও ঘোলাটে আলো। সে দ্রুত করিডোর পার হয়ে কতকগুলো ঘরের সামনে এসে পড়ল। ঘরগুলো পার হতেই একটা বাঁকা পথ। পথের ধারে দেয়ালে সারি সারি ছবি টাঙান। প্রেমার মনে হল এই পথেই সে এসেছিল। এমনি দেয়ালটার গা জুড়ে ছিল অনেকগুলো ছবি। সে চোখের ভেতর অনেকখানি শক্তি জড়ো করে ছবিগুলোর ওপর ফেলল। না, এগুলো তো আগের দেখা ছবি নয়। লম্বা লম্বা পপলার এভিনিউ-এর তলায় দুটি ভিনদেশী প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে চলেছে। আর একটি ছবি মনে হয় কোন যুদ্ধ জাহাজের। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর জাহাজটা ডুবে গেছে প্রায় আদ্দেক।

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে তাহলে কি ঠিক পথে আসেনি। আরও খানিক পথ এগিয়ে গেল সে। ঐ তো সেই ঘোরান সিঁড়িটা। অনেকখানি আশ্বস্ত হল সে। সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে এল নীচে। নেমে এসেই করিডোর। এখান থেকে পথটা দেখা যায়। সন্ধ্যার আবছায়ায় প্রেমা পথের দিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু দুপুরের সেই পথের কোন চিহ্নই সে দেখতে পেল না। শুধু দেখল, একটা পাহাড়ী ঢাল অনন্ত অন্ধকারে গড়িয়ে গেছে।

সে সেই করিডোর পেরিয়ে আর এক প্রস্থে পড়ল। এখানে এক টুকরো ব্যালকনি ঘরের অতিরিক্ত অংশের মত বাইরে বেরিয়ে আছে। একদিকে টানা দেয়াল, তিনদিক আলসে দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের গায়ে একখানা ঘর। প্রেমা উঁকি দিয়ে দেখল আদ্যিকালের ঢাউস ঢাউস কটা সোফা পড়ে আছে। ঘরের দরজা আধখোলা। কারা যেন গল্প করতে করতে ঘর খোলা রেখে এইমাত্র বেরিয়ে গেছে।

প্রেমা এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। সেখানে লোহার ফ্রেমে আটকানো কাঠের একটি বেঞ্চ পাতা। প্রেমা ভেঙে পড়ল বেঞ্চের ওপর। সে হাঁপাচ্ছিল। কতক্ষণ চোখ বুজে থেকে তার মনে হল, সে এই বৃহৎ কেল্লা প্রাসাদের অনেক গভীরে হারিয়ে গেছে।

চোখ খুলে বাইরে তাকাল প্রেমা। তখন অন্ধকারে সব একাকার। কিন্তু অনেক অনেক দূরে কতকগুলো জোনাকীকে সে যেন ঝিলমিল করে উঠতে দেখল। ঠিক জোনাকী বলা যায় না। নীল, সবুজ, হলুদ, লাল আর সাদা রঙের

ঝিলিমিলি। দূর কোন উপত্যকা শহরের ছবি। এমন বিভ্রান্তিকর অবস্থার ভেতর প্রেমার হঠাৎ ছবিটা দারুণ ভাল লেগে গেল। সে কালো কার্পেটের ওপর হরেক রঙের বুটি তোলা একটা সুন্দর ঝলমলে কাজ নিপুণ রসিকার মত দেখতে লাগল।

প্রাসাদের এপার থেকে বোধহয় শহর দেখা যায় না। নইলে মুসৌরী শহরের আলো চোখে পড়ত।

প্রেমা অনেক সময় বাইরে বসে রইল। রাত বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল প্রচণ্ড একটা শীত তার দেহের সঞ্চিত উত্তাপটুকু ভ্যাম্পায়ারের মত শুষে নিচ্ছে।

সে উঠে এল ব্যালকনি সংলগ্ন ঘরেব সামনে। দরজায় অনুমানে হাত ঠেকাল। দরজা আধখোলা ছিল, পুরোপুরি খুলে গেল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় সে আগেই দেখে নিয়েছিল ঘরের চেহারাটা। দেয়াল ধরে ধরে সে এগোতে লাগল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। হাতে ঠেকল সোফা। প্রেমা বসে পড়ল তার ওপর। সোফার ভেতর আধখানা শরীর ঢুকে যেতেই প্রেমা আবাব ফিরে পেল তার দেহের উত্তাপ। সে ভাবতে চেষ্টা করল জয়কিষণ আর দোলনের কথা। এতক্ষণে তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে তাদের অতিথিকে। ইতিমধ্যেই হয়ত তোলপাড় করে ফেলেছে সারা মুসৌরী শহরটা। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে রয়েছে জয়কিষণের প্রাসাদের একেবারে অন্দরমহলে।

এই মুহূর্তে কিছুই আর ভাবতে ভাল লাগছে না প্রেমাব। একটা মানসিক উত্তেজনায় ভুগে সে এখন ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতে চাইছে। সে আর জোর করেও নিজেকে জাগিয়ে রাখতে পারছে না।

রাত কটা কে জানে। চাঁদ কখন পাহাড়ের মাথায় গুঁড়ি মেরে উঠে প্রেমা মেননের দিকে তার অতি ঠাণ্ডা আলোর হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে, তা ঘুমন্ত প্রেমা জানতেই পারেনি। একটি তরুণীর ঘুমে-ডোবা মুখ লোভীর মত দেখছিল কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদটা।

হঠাৎ মঞ্চের ভেতর নতুন অভিনেতার আবির্ভাব হল। ঘরের ভেতর সুইচ টেপার অতি মৃদু আওয়াজ হল। টের পেল না তন্দ্রামগ্ন তরুণীটি। একটা অল্প পাওয়ারের সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতর। তারপর কে যেন আবার আলোটা নিভিয়ে দিলে।

গায়ে পুরুষ হাতের ছোঁয়ায় চমকে জেগে উঠল প্রেমা। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় প্রেমা চিনতে পারল জয়কিষণকে। সে আবেগে জড়িয়ে ধরতেই

জয়কিষণ প্রেমাকে বুকের ভেতর লুফে নিলেন। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে প্রেমাকে অস্থির রুদ্ধবাক করে দিলেন জয়কিষণ।

ঠোঁট দুটি একটুখানি শিথিল করে জয়কিষণ শুধু অস্ফুটপ্রায় স্বরে বলতে লাগলেন, প্রেমা, আমার প্রেমা। এত কষ্টও দিতে পার তুমি। পাগলের মত খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে সারা বিকেল।

ততক্ষণে প্রেমার চোখ আকুল করা কুয়াশায় ভরে উঠেছে।

কেম্‌টি ফল্‌স-এর তলায় বড় বড় পাথরের স্তূপের ওপর বসে ঝর ঝর ঝরে-পড়া জলের কণায় গা ভেজাতে লাগল দুজনে। চেয়ে রইল ঝরে-পড়া জলধারায় তৈরী ইন্দ্রধনুর দিকে।

দোলন এখন কনভেন্টে। দেরাদুনে ফেরার আগের দিনটিতে কেম্‌টি ফল্‌সের জলে দুজনের স্নানলীলা। সরকারী বাস আসবে যাত্রী নিয়ে। ভীড় জমে যাবে এই ছোট্ট স্নানের জায়গাটাতে। এ সব জেনেশুনে সময় হিসেব করে বেরিয়েছে ওরা। পাহাড়ী পথে গাড়ী চালানোর অভ্যেস নেই প্রেমার। তবু স্টিয়ারিং ধরেছিল সে প্রায় আদ্দেক পথ। পাহাড়ী সংকীর্ণ বাঁকগুলো অবলীলায় ঘুরে সে বেশ কয়েকবারই বাহবা কুড়িয়েছে জয়কিষণের মুখ থেকে।

জয়কিষণ বলেছেন, তোমার দিকে তাকালেই বিস্ময় কথাটার যথার্থ অর্থ বোঝা যায়। তুমি সবদিক থেকেই বিস্ময়ে তৈরী প্রেমা।

গাড়ী চালাতে চালাতে প্রেমা সেই মুহূর্তে ব্রেক কষে গাড়ী দাঁড় করিয়েছে। হাত গাড়ীর বাইরে বের করে বলেছে, ঐ দেখ আসল বিস্ময়।

পাহাড়ের ঢালে পাইনগাছের ফাঁকে টুকটুকে লাল ছাদ দেওয়া একটি বাড়ী। পাহাড়ী গোলাপ, লতানে গোলাপে জায়গাটি মনোরম। কিন্তু তার গা ঘেঁষে সংকীর্ণ একটি পাঁচিল। আর ঠিক পাঁচিলের গা বেয়ে পাহাড়টা নেমে গেছে প্রায় হাজার দেড়েক ফুট নীচে। বিস্ময়ের ব্যাপারটা ওখানে নয়, বিস্ময় বিন্দুর মত লেগে আছে বছর তিন বয়সের একটি শিশুর পায়ে। সে ঐ সংকীর্ণ ভয়াবহ পাঁচিলের ওপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ির খেলা খেলছে। দর্শক তার চেয়ে কিছু বড় কিছু ছোট ছেলেমেয়ের দল। তারাও বিপদজনক জায়গাটায় পা দুলিয়ে দোল খাচ্ছে।

জয়কিষণ বলেছেন, তোমাদের চোখে এটা বিস্ময়। কিন্তু এখানকার পাহাড়ীরা এ ব্যাপারটাকে আদপেই বিস্ময় বলে মনে করে না। ঐ দেখ,

পাকদণ্ডীর পথে পাঁচিলের পাশ দিয়ে একদল মেয়েপুরুষ চলে যাচ্ছে। তারা ফিরেও দেখছে না ওদের দিকে। এটা ওদের কাছে যেন দর্শনীয় ব্যাপারই নয়।

প্রেমা আবার নিজের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলছে, তুমি বার বার আমার ভেতর বিস্ময়ের এত কি পাও জয়কিষণ?

জয়কিষণ হেসে বলেছেন, তুমি বিস্ময়ের পর্বত। প্রতিটি গুহা-গহ্বর শৈলশিরা অরণ্য স্রোতোধারায় নতুন নতুন বিস্ময়।

প্রেমা লজ্জা পেয়েছে যত উপভোগ করেছে তার চেয়ে বেশী। মনের ভাবটুকু গোপন করে মুখে বলেছে, আমি কিন্তু মোটেও পর্বতের সঙ্গে উপমিত হবার যোগ্য নই। আমার দেহের দিকে তাকিয়ে কি সেই প্রমাণ পেয়েছ?

জয়কিষণ হেসে বলেছেন, ভদ্রমহিলাদের দেহের দিকে তাকান আমার স্বভাব নয়।

প্রেমা গাড়ী চালাতে চালাতে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ছিল। দারুণভাবে সামলে নিয়ে ব্রেক কষেছে।

জয়কিষণের মুখের ওপর তীর্যক চোখের দৃষ্টি হেনে ঠোঁটে চাপা হাসি ফুটিয়ে স্থির হয়ে থেকেছে।

ভাবটা অতি স্বচ্ছ। একটি মেয়েকে ভুল-ভুলাইয়ার ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করে কে তার দুটো ঠোঁটের উত্তাপ শুষে নিয়েছিল মশাই। তখন বোধহয় কুমারবাহাদুরের খুব শীত করছিল। শাল-আলোয়ানে সামলায়নি।

জয়কিষণ প্রেমার চোখের তলায় মুখের রেখায় সবই পড়ে নিয়েছেন। তিনিও প্রেমার হাসিকে সমর্থন জানিয়েছেন নিজের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে।

কেমটি ফল্‌সের উৎসের দিকে চেয়ে প্রেমা বলল, দেখ একটা দুধ রঙের সাপ যেন এঁকে-বেঁকে নেমে আসছে ওপরের পাহাড় থেকে।

জয়কিষণ বললেন, ও সাপটা হল মায়া-নাগ। দেখছ না নিঃশ্বাসে জলের কণা উড়িয়ে কেমন রামধনু তৈরী করেছে।

প্রেমা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে বলল, আমি স্নান করব।

বেশ, তাহলে একটু থামো, আমি ক্যামেরাটা বের করি।

একজন নর্তকীর স্নানলীলার ছবি তুলতে চাও, তাই না?

জয়কিষণ বললেন, আপত্তি আছে?

না আপত্তি থাকবে কেন। তবে উপযুক্ত মূল্য চাই।

পাবে।

আমার চাহিদা না জেনেই কথা দিলে ?

প্রেমাকে তো জানি। আর কিছু জানার দরকার আছে কি ?

তুমি কোনদিন দারুণ রকম আঘাত পাবে কারু কাছ থেকে। এত বিশ্বাস ভাল নয়।

বিশ্বাস করে আঘাত পাওয়াতেও আনন্দ আছে।

প্রেমা বলল, যে সেধে আঘাত চায় তার আঘাত ঠেকায় কে।

এখন বল কি চাই তোমার ?

প্রেমা বলল, কিছু চাই না।

সে কি !

যে ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দেয় তার কাছে তো চাইবার কিছু নেই।

কথাটা বলেই প্রেমা যেনন শিলাস্তূপগুলোর ওপর দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে লাগল। ঝিরি ঝিরি জলকণাতে প্রথমে তার চুলে গুঁড়ি গুঁড়ি মুক্তোর দানা জমল। পরে বড় বড় মুক্তো গাল বেয়ে গড়াতে লাগল।

ছবি তুলতে তুলতে জয়কিষণ বললেন, চুল ভেজালে, পুরো ঠাণ্ডাটা মাথায় বসবে যে !

প্রেমা আরও বেশী করে ঝরে পড়া জলের আঁচলে চুল ভেজাতে ভেজাতে বলল, বেশ হবে। অনেকদিন কেরালা ফেরা স্থগিত হয়ে থাকবে।

জয়কিষণ প্রেমার একদিকে ভিজে যাওয়া দেহের একটা ছবি তুললেন। সাদা নাইলন জর্জেটখানা ঝরে-পড়া জলের ছোঁয়ায় যেন গলে গেল। আর অমনি শ্রেষ্ঠ কোন ভাস্করের হাতে তৈরী একটি মার্বেল পাথরের নারীমূর্তি চোখের সামনে আশ্চর্য মহিমায় ফুটে উঠল।

জয়কিষণ সেই দুর্লভ মুহূর্তের ছবি তুলে নিয়ে বললেন, তোমাকে আমার কাছে আটকে রাখার জন্যে আমি নিশ্চয়ই তোমার অসুস্থতা কামনা করব না প্রেমা। তবে স্বেচ্ছায় যে কদিন থাকবে সেই আমার লাভ।

নিজের দেহের পরিবর্তনের দিকে প্রেমার বিন্দুমাত্র হুঁস নেই। জলের ছোঁয়ায় সে যে আদি নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে সে চেতনা তখনও তার ভেতরে জাগে নি।

প্রেমা ওপর থেকে ঝরে-পড়া জলধারার নীচে শিলাখণ্ডের ওপর পদ্মাসনে বসল। বসেই বলল, আমি ধূর্জটি। দেখ জয়কিষণ গঙ্গাকে আমার জটাজালের ভেতর ধারণ করেছি।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আবার এই দেখ আমি ভগীরথ। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাকে নিয়ে চলেছি আহ্বান করে।

প্রেমার প্রসারিত বাহু, সুন্দর পদবিক্ষেপে গঙ্গা আহ্বানের ভাবটি ফুটে উঠল।

প্রেমা এবার তার চূড়া বাঁধা চুল খসিয়ে ফেলল। বিশেষ মুদ্রায় দক্ষিণ চরণের জানু স্পর্শ করল উত্তোলিত বাম পদ দিয়ে। এক হস্ত ত্রিবলীর ওপর সর্প ফণার মত স্থাপন করে অন্যহস্ত অভয় মুদ্রায় উত্তোলিত করে বলল, জয়কিষণ, এখন আমি গঙ্গা। স্বর্গভূমি থেকে নেমে এসেছি মর্তলোকে।

প্রেমার এইসব বিস্ময়কর ভঙ্গীর কালার ছবি তুলে নিলেন জয়কিষণ। এগুলি তাঁর অক্ষয় সম্পদ। সেদিন নাটমণ্ডপে মধুরাসের উৎসব-নৃত্যেরও প্রায় শতাধিক ছবি তুলেছেন তিনি। যখন প্রেমা আর লালসিয়া স্টেটে থাকবে না তখন এই ছবিগুলিই হবে তাঁর স্মৃতির মণিমুক্তা সঞ্চয়।

প্রেমা এখন সচেতন হয়ে উঠেছে। সে নারীর স্বাভাবিক সঙ্কোচ আর লজ্জা ফিরে পেয়েছে। জয়কিষণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের বিকশিত দেহটাকে আবৃত করার চেষ্টা করছে।

জয়কিষণ সরে গেলেন। খানিক দূরে গিয়ে প্রেমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভ্যালির দিকে চেয়ে রইলেন।

কতক্ষণ পরে প্রেমার হাতের ছোঁয়ায় জয়কিষণ চমকে ফিরে দেখেন, প্রেমা ভেজা কাপড়খানা নিংড়ে যদ্দূর সম্ভব জল ফেলে দিয়েছে। কিন্তু শীতের কামড়ে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে তার।

জয়কিষণ উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু সেই মুহূর্তে কি করা দরকার তা ভেবে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, প্রেমা একসেট পোশাক এনেছে তার সঙ্গে কিন্তু পোশাকগুলো রয়ে গেছে ওপরে গাড়ীর ভেতর।

জয়কিষণ বললেন, তোমার জামাকাপড়গুলো এক্ষুনি এনে দিচ্ছি দাঁড়াও।

প্রেমা শক্ত করে জয়কিষণের হাত ধরে বলল, অনেক ওপরে, যেতে আসতে অনেক সময় লাগবে। তুমি বরং তোমার কোটখানা—।

কথা শেষ করতে পারছিল না প্রেমা।

জয়কিষণ কোটটা খুলে ফেললেন তাড়াতাড়ি।

জড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন প্রেমার গায়ে। প্রেমা ইংগিতে বাধা দিয়ে লং কোটটা হাতে ধরে নিয়ে বলল, আমি পোশাক বদলে পরব।

জয়কিষণ আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন ভ্যালির দিকে। প্রেমা ভিজে পোশাক

সরিয়ে গরম লং কোটখানা গায়ে চাপিয়ে নিল। জয়কিষণ প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে পাকদণ্ডীর পথে অনেক কষ্টে তুলে আনলেন ওপরে। কারের ভেতর থেকে পোশাক বের করে পরেও প্রেমা জয়কিষণের গরম কোটখানা ছাড়তে পারল না।

গাড়ীর সবকটা গ্লাস উঠিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসেছেন জয়কিষণ। ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি বের করে প্রেমা ধরিয়ে দিল জয়কিষণের হাতে।

জয়কিষণ বললেন, কি হচ্ছে প্রেমা, আগে তুমি নাও। তোমারই ওটার দরকার সবচেয়ে বেশী।

না ওতো। আমাদের দেশের মেয়েরা কবে আবার আগে কিছু মুখে তুলেছে ছেলেদের না দিয়ে।

জয়কিষণ কথা বাড়ালেন না। তিনি চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করে ফেললেন প্ল্যাষ্টিকের কাপে ঢালা কফিটুকু।

দরজা খুলে কাপ হাতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রেমা বলল, বেরুচ্ছ কোথায়?

এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ কাপখানা ধুয়ে আনতে।

প্রেমা জয়কিষণের হাত থেকে কাপটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলল, ছেলেরা যত অকাজ করার ওস্তাদ। চুপটি করে বস তো।

কাপটা হাতে নিয়ে একটুখানি কফি ঢেলে ধোয়ার অভিনয় করল প্রেমা। বাইরে যা ফেলল তা ফোঁটা কয়েকের বেশী নয়।

জয়কিষণ বললেন, ব্যস হয়ে গেল ধোয়া?

কাপে কফি ঢালতে ঢালতে প্রেমা বলল, না তো কি। তুমি কি মনে করেছ এমন গরম কফিটা আমি কাপ ধুতে ধুতেই শেষ করে ফেলব।

একটু একটু করে গরম কফিটুকুতে চুমুক দিয়ে প্রেমা বেশ আরাম পেল।

জয়কিষণ বললেন, রোদ্দুরে একটু ভাল করে গা-টা তাতিয়ে নাও।

খিল খিল করে হেসে উঠল প্রেমা। হাসি থামলে বলল, এখনও যদি গাটা গরম না হয় তাহলে সে তো তোমার কোটেরই বদনাম।

তা হোক্। তবু তুমি গাড়ীর বাঁ-দিক ঘেঁষে বস। ওদিকে অনেক রোদ্দুর।

প্রেমা বলল, হিমালয়ের হাওয়ায় রোদ্দুরেরও গায়ে র‍্যাপার জড়ানোর জোগাড়।

জয়কিষণ বললেন, তাহলেও সূর্য সূর্যই। ওর জুড়ি কেউ নেই।

অন্যমনস্ক হয়ে গেল প্রেমা।

কি ভাবছ?

চমকে মাথা ঝাঁকাল প্রেমা।

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছিলে।

প্রেমা বলল, তোমার কথা শুনে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল।

কে তিনি ?

দেবন। আমরা একই সময়ে কলাকেন্দ্র থেকে পাশ করে বেরিয়েছি।

হঠাৎ তার কথা তোমার মনে পড়ল !

বলেছি তো, তোমার কথা শুনে। ঐ যে তুমি বললে সূর্য সূর্যই। ওর জুড়ি কেউ নেই। দেবনও সূর্যের মতই প্রখরতা আর প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে। আমি ও ধরনের শক্তি আর কারু ভেতর দেখি নি।

তুমি দেবনকে ভালবাস ?

কি করে এ ধরনের অনুমান তোমার হল ?

খুব স্বাভাবিক। দুই প্রতিভা চিরদিনই প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যখন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করছ তখন এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ভালবাসা।

দেবনকে আমি ভালবাসি জয়কিষণ।

দেবন তোমাকে নিশ্চয় ভালবাসে ?

জানি না।

কথাটা বলেই ছলছলিয়ে উঠল প্রেমার দুটো চোখ।

জয়কিষণের গলায় বিস্ময়, সেকি !

প্রেমা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দেবনের সঙ্গে বোধহয় ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। দেবন একেবারে আলাদা চরিত্রের।

জয়কিষণ অমনি বললেন, তাহলে তোমার সতীর্থ দেবন হয় অতিমানব নয় তোমার ভালবাসা পাবার যোগ্যতা তার নেই।

একথা বল না জয়কিষণ। সে একেবারে অনন্য, অসাধারণ। বরং তাকে তুলনা করতে পার নার্সিসাসের সঙ্গে। আমার মনে হয় সে নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসতে জানে না।

জয়কিষণ বললেন, এটা একজন যুবকের দাম্ভিকতা বলেই মনে হয়। তোমার মত একটি মেয়ের সান্নিধ্য পেয়েও যে তার সদ্ব্যবহার করতে চায় না।

ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল প্রেমার মুখে। বলল, সে যে কি চায় আর চায় না, তা বোধহয় নিজেই জানে না। বিত্তবানের ছেলে নয় সে যে অর্থের অহংকার করবে। সেরা নাচিয়ে সে কলাকেন্দ্রমের কিন্তু কোনদিন তার ভেতর

দম্ভ কি অহংকার দেখিনি। মঞ্চের বিচারকেরা যখন তার প্রাপ্য পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছে তখনও তাকে সবাই নিস্পৃহ দেখেছে। বন্ধুরা তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলেও সে হেসে বিষয়টাকে হাল্কা করে দিয়েছে। আমার মুখোমুখি হলে সে আমার নাচের প্রশংসা করেছে। আমি কতদিন আমার অন্যায়ভাবে পাওয়া পুরস্কার তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছি, এ পুরস্কার আমার নয়। তোমার পুরস্কার কেড়ে নিয়ে ওঁরা আমাকে পুরস্কার দেবার বদলে তিরস্কারই করেছেন।

দেবন অনেক যত্নে আমার ফেলে দেওয়া পুরস্কার কুড়িয়ে এনে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছে, তুমি কত ভাল পারফরমেন্স করেছ তা তুমি নিজেই জান না। আর যাঁরা বিচারকের আসনে বসেন তাঁরা সকলেই সমঝদার গুণী মানুষ।

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছি, চিরদিনই পুরুষ বিচারকেরা মেয়েদের জিতিয়ে দেয়।

ও অমনি হা হা করে হেসে উঠে বলেছে, একজন পুরুষ বিচারকের আসন এখনও খালি পড়ে আছে, সে এলে দেখবে সব মেয়েরাই হেরে গেছে।

একটানা দেবনের কথা বলে ক্লান্ত নয় প্রেমা। দেবনের প্রসঙ্গ উঠলে সে যেন অফুরন্ত কথার প্রবাহে ভেসে যেতে পারে।

প্রেমা কথায় খানিক ছেদ ফেলতেই জয়কিষণ বললেন, তুমি বিশ্বাস কর প্রেমা তোমার ঐ প্রতিভাধর বন্ধুটিও তোমাকে ভালবাসে।

একটুও না। প্রেমা সক্ষোভে বলল

এ তোমার অভিমানের কথা প্রেমা।

অভিমান নয় জয়কিষণ। পাথরের তৈরী ডেভিডের মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। তার দৃপ্ত পৌরুষকে ভাল না বেসে পারা যায় না, কিন্তু তার কাছ থেকে রক্ত মাংসের ভালবাসা পাওয়া তো সম্ভব নয়। দেবন একেবারে সেই পাথরের তৈরী আশ্চর্য মূর্তি।

জয়কিষণ হঠাৎ কি ভেবে বললেন, যদি ইচ্ছে কর তাহলে আধ ঘণ্টার ভেতর তোমাকে একটা জায়গায় ঘুরিয়ে আনি। হয়ত জায়গাটা তোমার ভাল লাগবে।

অন্যমনা প্রেমা বলল, যেখানে খুশি চল।

জয়কিষণ গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভ করে চললেন।

প্রায় দশ পনের মিনিট গাড়ীখানা চলল পাহাড়ী নানান আঁকবাঁক ওঠানামা পেরিয়ে। এদিকে পাহাড়ী বস্তি বাড়ীঘর বড় একটা দেখা গেল না।

এক সময় ওরা একটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরে এসে পৌঁছল এমন এক জায়গায় যেখানে দুটো পাইন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তার তলায় বাঁধান একটা পাথরের বেদী। পাশ দিয়ে একটা ঝোরা কিশোরী মেয়ের মত খিল খিল হাসি ছড়াতে ছড়াতে ছুটে নেমে চলেছে। নীচে বিস্তৃত ভ্যালি, ওপরে অনন্ত আকাশ। ভ্যালিতে নীলাভ কুয়াশা এখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

গাড়ী থেকে জয়কিষণ নামলেন। প্রেমার হাত ধরে নামালেন। এতক্ষণ প্রেমা কিংবা জয়কিষণের ভেতর কোন কথাই হয়নি। প্রেমা ডুবেছিল তার ভাবনার ভেতর। দেবনের প্রসঙ্গ ওঠার পর থেকেই সে একেবারে অন্যমনা। মুসৌরীর পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে সে কেরালার সমুদ্রতীরের স্বপ্ন দেখছে। দেবনের হাত ধরে সে চলেছে বালির ওপর দিয়ে। দুজনের পায়ের ছন্দে এত মিল! গতিতে এমন সামঞ্জস্য! মাঝে মাঝে শঙ্কর পার্বতীর মত দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে।

জয়কিষণ কথা বলে উঠতেই ধ্যান ভাঙল প্রেমার।

জায়গাটা বড় নির্জন তাই তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম।

প্রেমা চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, শুধু নির্জন নয় বড় সুন্দর।

এসো আমরা ওখানে একটু বসি। বলেই প্রেমার হাত ধরে পাইনগাছের তলায় গিয়ে পৌঁছলেন জয়কিষণ।

বাঁধান বেদীর ওপর পাশাপাশি বসল দুজনে।

প্রেমা বলল, আচ্ছা জয়কিষণ লোকালয় তো কোথাও দেখছি না, তাহলে এই দুটো গাছের তলায় বেদীটা বাঁধাল কে?

কোন সরকারী অফিসার নিশ্চয়ই। যাঁর চোখ বলে দুটো বস্তু আছে আর কোথায় বসে রূপ দেখা যায় সে সম্বন্ধে যাঁর ধারণা আছে।

কিছু সময় দুজনেই নীরব।

হঠাৎ জয়কিষণ বললেন, জান প্রেমা এখানে এলেই কেন জানি না আমার ফুজিয়ামার কথা মনে হয়।

আধ ডজন প্রশ্ন কলকলিয়ে উঠল প্রেমার মুখে।

তুমি জাপানের ফুজিয়ামা পর্বতের কথা বলছ তো? গেছ তুমি জাপানে? দেখেছ ফুজিয়ামা নিজের চোখে? ফুজিয়ামার সঙ্গে সামনের পাহাড়ের বিশেষ কি কোন মিল আছে? ছবি দেখেছি আমি, কিন্তু মিল তো খুঁজে পাচ্ছি না।

জয়কিষণের গলায় একটা গম্ভীর সুর বাজল, না তা নেই, তবু আমার কেন জানি না এখানে এলে ঐ পাহাড়ের কথাই মনে হয়।

আশ্চর্য তোমার ভাবনা তো। রূপের অমিল থাকলেও এক বলে মনে কর তুমি!

জয়কিষণ এবার প্রেমার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেললেন। ধীরে ধীরে বললেন, তুমি আজ যেখানটাতে বসে আছ অনেকদিন আগে ওখানে আমারই পাশে বসেছিল আর একটি মেয়ে। তার সঙ্গে তোমার আকৃতির কোন মিল নেই তবু এই মুহূর্তে তোমাকে দেখে কেন জানি না তার কথাই মনে পড়ছে। সেদিনের মেয়েটির সঙ্গে আজকের মেয়েটি একেবারে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

প্রেমা অনুমান করল মেয়েটি মধুবন্তী।

মুখে বলল, তুমি কবি জয়কিষণ। এমন করে কথা বলতে পারে কবিরাই।

জয়কিষণের মুখে ম্লান একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, কবিতা আমি কোনদিনই লিখিনি, কিন্তু কবিতা আমি ভালবাসি। হিন্দি, উর্দু, বাংলা, ইংরাজী, জাপানী এসব ভাষার বহু কবিতা আমার জানা। আমি জাপানী ভাষাও এক সময় শিখেছিলাম। ব্যবসার ব্যাপারে জাপানে যেতে হয়েছিল কয়েকবারই।

জাপান দেশটা খুব সুন্দর, তাই না?

সব দেশই সুন্দর প্রেমা। দেখার চোখ থাকলে সামান্যও অসামান্য হয়ে ওঠে। আমার দেশ কি কম সুন্দর।

আমি সে কথা বলছি না। সব দেশের নিজস্ব একটা রূপ আছে।

জয়কিষণ বললেন, সামনে ফুজিয়ামা, চেরীফুলের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কিমোনো পরা জাপানী মেয়ে। এমনি টুকরো টুকরো অজস্র ছবির দেশ জাপান।

তুমি ফুজিয়ামার ধারে গেছ?

ওপরে উঠেছি।

ওপরে!

আমি, আমার জাপানী এক বন্ধু আর তার লাভার, তিনজনে উঠেছিলাম।

কত সময় লাগল?

প্রায় তিনদিন।

রেস্ট নিচ্ছিলে কোথায়? তাঁবু ছিল সঙ্গে?

তাঁবুটাবু কিছুই ছিল না। পথে দু'এক জায়গায় অতি ছোট ডেরা আছে। ওখানে সামান্য রেস্ট নিয়ে উঠে চলা।

দারুণ এক্সাইটিং তো!

তা বলতে পার। চাঁদনি রাত ছিল, আমরা গান করে গল্প করে সময় কাটিয়েছি।

আমার খুব ইচ্ছে করে এমনি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে। দারুণ ভাল লাগত আমি যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারতাম।

একটা অ্যাকসিডেণ্টের হাত থেকে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।

তুমি। তোমার অ্যাকসিডেণ্ট?

বিস্ময় প্রকাশ করল প্রেমা উচ্চগ্রামী গলায়।

হাঁ, বন্ধু সাবধান করে দিয়েছিল আগে কিন্তু খেয়াল ছিল না আমার।

কি রকম অ্যাকসিডেণ্ট?

চিহ্নিত পথের ঠিক পাশেই অজস্র নুড়িপাথর পড়ে আছে। ভুলে একবার ওখানে পা পড়লেই হল। গড়াতে গড়াতে ঠেকাতে হবে কোন অতলে। বুঝতেই পারছ হাড়গোড়গুলো আর থাকবে না।

তুমি পড়ে গেলে?

ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছি কি গড়াতে লাগলাম নীচে।

দারুণ উত্তেজনা আর ভয় মেশান একটা আওয়াজ তুলল প্রেমা।

জয়কিষণ বললেন, ভাগ্য ভাল কিছুদূর গড়িয়ে একটা উঁচু জায়গায় ঠেকে গেলাম।

তারপর!

আমি তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের সামান্য উঁচু একটা শিরায় আমি আটকে আছি। আর ঠিক তার পরেই অনন্ত ঢাল। এদিকে নুড়ির ওপর দিয়ে আসল পথে ফেরার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কি করলে?

হেসে বললেন জয়কিষণ, জ্ঞান হারালাম। যখন জ্ঞান হল, দেখি বন্ধুর প্রেমিকাটির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি।

ফিরলে কি করে?

আমাদের কাছে পাহাড়ে ওঠার রোপ ছিল। আমার বন্ধুর প্রেমিকা কোমরে সেই দড়ি জড়িয়ে টেনে রাখল আর বন্ধু সেই দড়ি ধরে নামতে লাগল। পিছু না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে নুড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার। এদিকে ভেবে দেখ বন্ধুর প্রেমিকাটির অবস্থা। ভারী একটা বস্তুকে সারাক্ষণ টেনে রাখা কি অমানুষিক শক্তির ব্যাপার। তার ওপর তার মানসিক অবস্থা। বন্ধুটি পড়ে গেলে তার সর্বস্ব গেল। তাই হাতে না

ধরে সে কোমরে একেবারে গিঁট দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল দড়িটা। শক্তিতে না কুলোলে সেও পড়বে বন্ধুটির সঙ্গে একই অতলে। পরে শুনেছিলাম, বন্ধু তাকে কোমরে দড়ি বাঁধতে বারে বারে বারণ করেছিল কিন্তু মেয়েটি তার কথায় একেবারেই আমল দেয়নি।

প্রেমা হঠাৎ বলল, ওরা অসাধারণ। এমন একটা বিপদের ঝুঁকি ওরা নাও নিতে পারত।

ঠিক, কিন্তু একজন বন্ধুর জন্যে ওরা সব কিছুই করতে পারে।

তারপর ওরা কি করল ?

বন্ধুটি আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। আমি একেবারে জানতেই পারিনি! তারপর ও দড়ি ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেল। তারপর দুজনে মিলে অপেক্ষা করতে লাগল আমার জ্ঞান না ফিরে আসা অব্দি।

এক সময় জ্ঞান ফিরে এল আমার। দেখলাম, আমি দড়ির বাঁধনে বাঁধা পড়েছি। ওপরে চাইলাম। ওরা দারুণভাবে হাত নেড়ে উৎসাহ দিতে লাগল। আমি তখন সাহস ফিরে পেয়েছি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে লাগলাম। এমনি করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সেদিন ফিরে এসেছিলাম।

প্রেমা হঠাৎ বলল, ওরা এখন সুখী পরিবার নিশ্চয়ই।

জয়কিষণ কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন, না ওদের বিয়ে হয়নি।

সে কি !

বিয়ের আগে ছেলেটি অ্যাকসিডেণ্টে মারা গিয়েছিল। একটা স্টীল প্ল্যাণ্টে কাজ করত বন্ধুটি।

প্রেমা কোন কথা বলতে পারল না। একটা অবরুদ্ধ আবেগ তার কণ্ঠের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল।

জয়কিষণ একটু থেমে বললেন, বড় করুণ একখানা চিঠি লিখেছিল আমার বান্ধবীটি। চিঠির শেষে একটা মন্তব্য ছিল।

'যদি ফুজির ওপরে সেদিন আমাদের মৃত্যু হত তাহলে আজকের এই অসহনীয় জীবনের ভার বইতে হত না।'

প্রেমা বলল, তুমি কেন আমাকে এমন একটা দুঃখের কাহিনী শোনাবার জন্যে এখানে নিয়ে এলে ?

বিশ্বাস কর, কোন কাহিনী শোনাবার জন্যে তোমাকে এখানে আমি নিয়ে আসিনি। কথায় কথায় এসে পড়ল।

হঠাৎ প্রেমা এক কাণ্ড করে বসল। জয়কিষণের মাথাটা বুকের কাছে টেনে এনে বলল, কান পেতে শোন কি রকম শব্দে ওঠানামা করছে।

একেবারে নির্বিকার কিশোরী হয়ে গেছে প্রেমা।

জয়কিষণ বললেন, ওঠ প্রেমা আমাদের ফিরতে হবে।

প্রেমা দূরের উপত্যকার দিকে চেয়ে জয়কিষণের একখানা হাত চেপে রেখে বলল, আর একটু বসি। ওদের কথাটা কিছুতে ভুলতে পারছি না জয়কিষণ।

জয়কিষণ বললেন, এইখানেই ভালবাসার মূল্য প্রেমা। পাত্রপাত্রী সরে যায়, কিন্তু ভালবাসা দাঁড়িয়ে থাকে একই জায়গায়। সৃষ্টির আগে কবে তার জন্ম হয়েছিল কে জানে কিন্তু তার মৃত্যু নেই। শুধু আছে আবির্ভাব। সে যেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্প পোস্ট। যে তার পাশ দিয়ে যায় সে হঠাৎ আলোর ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার তার পাশ থেকে সরে গেলেই সারা অন্তর জুড়ে অন্ধকারের হাহাকার।

প্রেমা হঠাৎ বলল, তুমি ঐ মেয়েটির চিঠির উত্তর দিয়েছিলে?

দিয়েছিলাম।

একটু থেমে প্রেমা বলল, যদিও কৌতূহলটা অন্যায় তবু জানতে ইচ্ছে করে কি লিখেছিলে তুমি।

শুধু একটি কবিতায় উত্তর দিয়েছিলাম। ওরই দেশের এক কবির কবিতা। যদিও তা সব দেশের সব কালের প্রেমের বেদনাকে ছুঁয়ে আছে। তোমার আমার মধুবন্তী দেবন কিংবা ঐ বেহালাবাদক সবার মনের অনুচ্চারিত প্রেমের যন্ত্রণার কথা।

কবিতাটা মনে আছে তোমার?

কবির নাম, ফুজিওয়ারা নো য়োশিৎসুনে। একটু বস, কবিতাটা তোমাকে তর্জমা করে লিখে দি।

জয়কিষণ একটু নীচে নেমে গাড়ীর কাছে গেলেন। ব্যাগ খুলে প্যাড আর পেন বের করে গাড়ীর ভেতর বসে কবিতাটা লিখলেন। হাতে একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে আবার বসলেন প্রেমার পাশে।

কি লিখলে পড়।

জয়কিষণ স্বচ্ছন্দ গলায় পড়ে গেলেন:

নরম সবুজ এই ঘাসে
কবে যেন আমাদের
পায়ের পাতার ভর পড়েছিল,

চারিদিকে ফুলের উৎসব :
আজ তুমি কাছে নেই
অনেক দূরের কোন দেশে,
চিহ্ন সব গেছে মুছে
সবুজ ঘাসের ঐ নরম শরীরে,
ফুলেরা এখন শুধু শব।

কবিতাটা পড়া হলে জয়কিষণ প্রেমার হাতে কাগজখানা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, চল ওঠা যাক। হয়ত আর কোনদিন এখানে আমরা একসঙ্গে আসব না।

কুট্টানাড়ম পুঞ্চইলে
কচ্চ্ পেন্নে কুইলাল্লে
কুট্টাভেনম্ কুঁভাভেনম্
পুভাভাভেনম্
ও তিত্তিত্তাগা
তিত্তিথেই
তিথেই
তাগদাই তোম্।

তালে তালে ওয়াঞ্চীপাট চলেছে। জল কেটে ছুটছে তীরের গতিতে এক সারি চুণ্ডন ভাল্লম্। কায়েলের জল শত শত দাঁড়ের ঘায়ে কাচের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দুই তীরে উৎসুক দর্শকের মিছিল।

আশি থেকে একশো বিশ ফুট অব্দি নৌকোগুলো সাপের মত হিল হিল করে এগিয়ে যাচ্ছে। চোদ্দ ফুট আমরম উঁচু হয়ে জেগে আছে নৌকোর পেছনে। সাজান হয়েছে কাপড় আর মালা দিয়ে। নীচে বিরাট ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে গায়কেরা করে চলেছে ওয়াঞ্চীপাট। উৎসাহে কায়েলের জলের মত ফুঁসছে ভাল্লমের দাঁড়িরা।

ওনাম উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ এই বোট রেস।

আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ঘরে ঘরে উঠে গেছে পরিপূর্ণ ফসল। সুখী সম্পন্ন কেরালাবাসীর মনে তাই উৎসবের ঢল নেমেছে। প্রতিটি বীড অথবা কেটেডমের আঙিনা ফুলের আল্পনা আর মালায় মালায় সাজান। নীলা ভিল্লাক্কু জালিয়ে তার চারদিকে গানের সঙ্গে করতালি দিতে দিতে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে বিভিন্ন মহল্লার মেয়েরা। দোলনায় দুলছে তরুণী, কিশোরী। কেউ ফুলে ফুলে সাজিয়েছে দোলনা। কেউ সখিকে ধাক্কা দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিতালি পাতাবার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে শূন্যে।

রাজা এসেছেন ওনামে। কেরাল'বাসীদের চিরদিনের সব সেরা লোকপ্রিয়

রাজা মহাবলী। অসুর মহাবলী মহাদাতা। শ্রীর নিত্য স্থিতি তাঁর রাজ্যে। প্রজারা সুখী সম্পন্ন এমন রাজার রাজত্বে।

ঈর্ষায় জলতে লাগল দেবতাদের অন্তর। অসুর হবে লোকপ্রিয়, এ যে অসহ্য। বিষ্ণুকে দেবতারা জানালেন মনের ক্ষোভ। বিষ্ণু অমনি ধরলেন বামন রূপ। মহাবলীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন ত্রিপাদভূমি। সঙ্গে সঙ্গে দাতা করলেন গ্রহীতার প্রার্থনা মঞ্জুর। ধীরে ধীরে বামন বিষ্ণু ধরলেন বিশাল কায়া। এক পদে ঢেকে ফেললেন পৃথিবী। অন্য পদে অন্তরীক্ষ—রসাতল। বললেন, বল মহাদাতা এখন আমার তৃতীয় চরণ কোথায় রাখি। স্থান তো আবৃত হয়ে গেছে।

মহাবলী বললেন, আমার বাক্য তো ফিরবে না। রাখ আমার মস্তকে।

বিষ্ণু মহাবলীর মাথায় পা দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন চির অন্ধকারের রাজ্য রসাতলে।

কিন্তু ভক্ত প্রজারা ধরলেন বিষ্ণুকে, এ কেমন কথা, আমরা দেখতে পাব না আমাদের রাজাকে।

স্থির হল বছরের প্রথম দিনটিতে পাতাল থেকে রাজা মহাবলী আসবেন তাঁর দেশে। দেখা দিয়ে যাবেন ভক্ত প্রজাদের। দেখে যাবেন তাদের সমৃদ্ধ জীবন।

রাজা এসেছেন তাই সারা দেশ মেতেছে উৎসবে। চোখের আড়াল থেকে রাজা দেখছেন সব। তাই ঘরের ভেতরে বাইরে সব জায়গাতেই উৎসব। তিনি দেখবেন প্রতিটি ঘর। প্রতিটি মানুষের মুখ।

উৎসব উৎসব। আনন্দের রোশনাই সারা কেরালা জুড়ে। প্রবাসীরা এসেছে ঘরে। পরেছে নতুন পোশাক। চলেছে ভোজের আদান-প্রদান। উৎসবের সব সেরা অনুষ্ঠান বোট রেস দেখতে ছুটেছে আলেপ্পি।

রেস শুরু হয়ে গেছে। দ্রুত লয়ে ওয়াল্লীপাট চলেছে :

কুট্টানাড়ম পুঞ্চইলে

কচ্চ্ পেন্নে কুইলাল্লে···

তরুণী বউ তার মানুষটিকে বলছে, এমন সোনার ফসল ফলেছে তুমি আমাকে কিছু দেবে না? একটি সুন্দর বাকস একটি শাড়ী আর বর্ষার দুরন্তপনা থেকে বাঁচার জন্যে একটি ছাতা। দেবে না?

ওয়াল্লীপাটের ভেতর ঐ সামান্য চাওয়ার সুরটি অসামান্য হয়ে বাজছে।

সব মানুষের উদ্দাম চীৎকারের ভেতর একটি মানুষ নিজেকে সরিয়ে রেখেছে

সবার চোখের আড়ালে। সে সারি সারি নারকেল অরণ্যের ভেতর পায়ে চলা পথে আপনার খুশীতে নেচে চলেছে। ওয়াঞ্চীপাটের তালে তালে সে নাচ কম্পোজ করে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে।

কুট্টানাড়ম পুঞ্চইলে

কচ্চ্ পেয়ে কুইলায়ে

কুট্টাভেনম্ কুঁভাভেনম্…

সে সারা দেহে অজস্র মুদ্রা ফুটিয়ে অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে জনহীন নারিকেল বীথির ছায়া পথে। পাশেই কায়েলের জল মুক্তো ছড়াচ্ছে হাজার বৈঠার ঘায়ে। হাজার দাঁড়ির গলায় বেজে উঠছে ওয়াঞ্চীপাটের স্বর।

শরৎকাল। আকাশে তবু বড় আকারের ক'টি জলশূন্য মেঘ থমকে থেমে আছে। দুপুরে কায়েলের আর্শিতে তারা প্রতিবিম্ব দেখছিল। একটু পরেই নৌকোয় নৌকোয় কায়েলের জল কালো হয়ে উঠল। মেঘগুলো তাই বুঝি বিস্মিত স্তম্ভিত হতবাক। এখন সন্ধ্যা নেমেছে। যে যার ঘরের পথে রওনা হয়ে গেছে। দূরে কোথায় যেন উদ্দাম উল্লাস চলেছে। তার শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

আলেপ্পির নির্জন পথে কটি নারকেল গাছের তলায় প্রেমার প্রিমিয়াব প্রেসিডেন্ট খানা দাঁড়িয়ে। গাড়ীর হেড-লাইট নিভিয়ে প্রেমা ঐ দূরাগত উল্লাসের শব্দটা শুনছে। যারা জয়ী হয়ে ট্রফি জিতেছে তাদেরই আনন্দ কলরব বলে মনে হয়।

একটা সেতার প্রেমার মনের কোথায় যেন চাপা কোন দুঃখের সুর অতি ধীরে বাজিয়ে চলেছে। সে জয়ী হয়েছে বহু জায়গায়। কিন্তু জীবনের কোথায় যেন একটি হার তার পিছু নিয়েছে। ভালবাসা পেয়েছে সে অযাচিত দানের মত। কিন্তু হাওয়ার ঘায়ে জেগে ওঠা তরঙ্গের মত আবেগে উচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হয়ে তা আবার কখন স্থির হয়ে গেছে। যেন কোনদিন দেহের তটে কোন ঢেউ আছড়ে পড়ে নি। একেবারে চরণচিহ্নহীন মসৃণ শান্ত বেলাভূমি।

বেলা শেষের একটা ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠতেই বিবশ দেহটা নড়ে চড়ে উঠল প্রেমার। সরিতা আর ইন্দ্রকে সে চোখের সামনে দেখেছে। ঐ উল্লাস উন্মাদ জনতার ভেতর ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। মাঝে এক সময় সরিতার বাঁ হাতখানা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরছিল ইন্দ্রের কোমর।

ভোর রাতের কথাটা মনে করে হাসি পেল প্রেমার। দু' বোনে পাশাপাশি

খাটে শুয়েছিল। সরিতার খাটটা শব্দ করে উঠল। প্রেমা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল তাদের কথা যারা তার জীবনকে ছুঁয়ে গেছে, যারা হয়ত আর কোনদিনও ফিরে আসবে না তার জীবনে। হঠাৎ তার ভাবনা ভাঙল সরিতার খাটখানা নড়ে ওঠার শব্দে।

সরিতাই কথা বলল, কিরে দিদি জেগে আছিস নাকি?

কি করে বুঝলি?

সদ্য ফিরেছিস সাউণ্ড অব মিউজিকের দেশ থেকে। এত সহজে কি আর সে সব সুর ভোলা যায়।

আমার চেয়ে ক'বছরের ছোট বল তো তুই?

এখন অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি। এখন সমান সমান।

খিল খিল করে হেসে উঠল প্রেমা।

যা একখানা ডেঁপো চূড়ামণি হয়েছিস না।

সরিতা আদুরে গলায় বলল, বল না দিদি, কুমারবাহাদুরের সঙ্গে কদ্দূর অব্দি গড়িয়েছিল?

প্রেমা বলল, সে অনেক পথ, অনেক বাঁক। তবে বিশ্বাস কর সর্বহারা হয়ে ফিরি নি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সব হারালে তো আর ফেরার পথ থাকে না।

প্রেমা কথান্তরে গেল, এ ক'দিনের ভেতর হোটেলে গিয়েছিলি?

ওরে বাবা ও-সবের ভেতর আমি নেই। ওটা প্রেমা মেননের রাজ্যের এলাকাভুক্ত।

কতদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে এভাবে এড়িয়ে বেড়াবি? এদিকে তো বলছিস অ্যাডাল্ট হয়ে গেছিস।

তোমার ঐ গোমড়ামুখো ম্যানেজার যতদিন ওখানে থাকবে ততদিন ওমুখো হচ্ছে না সরিতা মেনন।

কেন রে, মিঃ রায় তো তোফা ভদ্রলোক। তাছাড়া দারুণ অনেস্ট। দেখ না হোটেলের ইনকাম কি পরিমাণ বেড়ে গেছে।

সরিতা বলল, ঐ জন্যেই তো বলেছিলাম ভদ্রলোক বড় কঠিন ঠাঁই। বান্ধবীদের কোনদিন হোটেলে নিয়ে গেলে জানিস দিদি একেবারে চিনতেই পারে না। কড়ায় গণ্ডায় পাওনা আদায় করে তবে ছাড়ে।

প্রেমা খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, এ মাস থেকেই মিঃ রায়কে দুটো ইনক্রিমেণ্ট দিতে হবে।

সরিতার গলায় বিস্ময়ের সুর, কেন ?

তোকেও যখন ছাড়ে নি তখন তার অনেস্টি আনকোয়েশ্চেনেবল। আর তাই ডবল ইনক্রিমেন্ট দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করা উচিত।

খুব যে মালিকানা দেখাচ্ছিস।

প্রেমা বলল, তুই ইনডাইরেক্টলি সার্টিফাই করলি যে।

সরিতা বলল, অমন মানুষকে সার্টিফাই করতে আমার ভারী বয়েই গেছে।

তুই একটুতে ক্ষেপে যাস কেন বল তো! মানুষটা নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে কতদূরে এসে পড়েছে। তার কথাটা তো একটু ভাবতেই হবে।

সরিতা বলল, তুই যত খুশি ভাব আর দরাজ হাতে দান করে যা। আমার ওসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। হ্যাঁ শোন, আজ কি প্রোগ্রাম তোর ?

সকালবেলাটা ঘরে থাকব, দুপুরে একটু বেরুবো।

কোথায় ?

সম্ভবত প্যালেস হোটেলের দিকে।

ব্যস আর কোথাও না ?

ভাল লাগছে না রে।

সরিতা অমনি বলল, তা হলেই হয়েছে। মেজাজ সরিফ না থাকলেই তো তুই বারে ঢুকবি।

তুই কি ভগবান, সব জানতে পারিস ?

সরিতা বলল, নিজের হোটেলে তো বার রয়েছে সেখানে ড্রিঙ্ক করতে পারিস।

প্রেমা বলল, জমে না। স্থান মাহাত্ম্য আছে তো। পরকীয়া প্রেম চিরদিনই বেশী আকর্ষণীয়।

তোর ফিলজফি নিয়ে তুই থাক, আমি একটু বেরুবো।

তা যা যেখানে খুশি। রাতে ফিরবি তো ?

না ফিরে উপায় আছে ?

কেন ?

তুই কি অবস্থায় ফিরিস তা দেখতে হবে তো।

প্রেমা আবার হাওয়ায় মিষ্টি শব্দ ছড়িয়ে হাসল।

হাসি থামলে বলল, তুই যা হুল্লোড়বাজ, বন্ধুদের সঙ্গে জমে গেলে আর ঘরে ফেরার কথা মনে থাকবে না।

সে দেখা যাবে। আমি একটু আলেপ্‌পির দিকে যাব।

আলেপ্‌পি!

তুই যেন বিলেতে আছিস বলে মনে হচ্ছে। আজ যে ওনামের বোট রেস রে।

সত্যি আমি একটা যা তা হয়ে গেছি না রে? দেশের ঐতিহ্য টৈতিহ্য সব ভুলে মেরে বসে আছি।

এসব প্রতিভার লক্ষণ।

বল বল। আমার যখন বলার কিছু নেই তখন তোর বুকনিগুলো শোনা ছাড়া উপায় কি।

সরিতা এত ভোরে বিছানা ছাড়ে না। কিন্তু আজ ক'দিন ধরে সে খুব সকাল সকালই উঠছে। ঘরের সামনে তিন চারটি কাজের মেয়ের সঙ্গে সেও উৎসবের ফুল সাজায়।

প্রেমার ওসব ব্যাপারে ঔৎসুক্য কম। সে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ক্রিয়াকলাপগুলো দেখে। সেদিন পাড়ার মেয়েরা সরিতার ডাকে ওদের ঘরের আঙিনায় জড়ো হয়েছিল। তারা ঘুরে ঘুরে নেচেছিল কৈকট্টিকলি। প্রেমা ওদের সঙ্গে যোগ দিতেই ওদের নাচে যেন আনন্দের তুফান উঠেছিল। প্রেমাকে ওরা একটু আলাদা চোখে দেখে। ওর দেশজোড়া নাম ওকে ওর বয়েসী মেয়েদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের আচার আচরণ দৃষ্টিপাতে প্রেমার ওপর তাদের সম্ভ্রমের পরিমাণ বোঝা যেত। সেই প্রেমা যখন সাধারণ নাচের আসরে এগিয়ে এসে ওদের হাত ধরল তখন ছোট্ট আসরে উৎসাহের বান ডেকে গেল।

অনেকক্ষণ সেদিন হাততালি দিয়ে সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নেচেছিল প্রেমা। সরিতাও নাচে যোগ দিয়েছিল কিন্তু গানের গলা তার উঠেছিল সবার ওপরে।

নাচতে নাচতে প্রেমা তো প্রায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এত ভাল গলা সরিতার! সরিতা মাঝে মাঝে গানের চর্চা করে তা সে জানে। তার নাচের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বাঁধা ধরা গানও সে সুন্দর গলায় অবলীলায় গেয়ে যায়। কিন্তু এ গলা যে একেবারে নতুন। সম্মোহনী মন্ত্রের মত এই গলায় গাওয়া 'গান শ্রোতাকে মুহূর্তে আবিষ্ট করে ফেলে। গলায় এ যাদু কি করে আয়ত্ত করল সরিতা!

সেদিন তার কৌতূহলের সন্তোষজনক কোন উত্তরই সে সরিতার কাছ থেকে পায় নি কিন্তু আজ তার কাছে সব স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ভালবাসার ছোঁয়ায় মনের ভেতর ধূলো জমে পড়ে থাকা অলখ বীণা আশ্চর্য সুরে বেজে ওঠে। এ সুরের সঙ্গে গায়কের কোন পূর্ব পরিচিতিই নেই। তার ভেতর দিয়ে অন্য কোন নামী শিল্পী যেন গেয়ে যায়। বাল্মীকির হঠাৎ পাওয়া শ্লোক যেমন তার অনুশীলনের ফল নয় ঠিক তেমনি ভালবাসার স্পর্শে যে রাগিণী জন্ম নেয় তাও গায়কের পরিশীলিত গলার সৃষ্টি নয়। সে হঠাৎ পাওয়া এক অভাবনীয়।

সরিতা তাহলে ইন্দ্রকে ভালবাসে। শুধু খবর গোপন রাখার জন্যে তার সঙ্গে মিথ্যার একটুখানি মিষ্টি অভিনয়। সৎ সুন্দর সুশোভন এই বাঙালী তরুণটি। এর সঙ্গে সরিতার একান্ত প্রিয় সম্পর্ক গড়ে তোলার বাধা কি আছে।

ওকে দেখতে পায়নি ওরা। বোট রেসের শেষে ওরা চলে গেল হাত ধরাধরি করে। প্রেমা তার গাড়িটা দিতে চেয়েছিল সরিতাকে কিন্তু সরিতা নিতে চায়নি। হেসে বলেছিল, তোর গাড়ির নম্বর দেখলেই তোর ফ্যানেরা ছুটে এসে গাড়িখানা ছেঁকে ধরবে তারপর যখন গাড়ির ভেতর তোকে পাবে না, তখন মারতে মারতে আমাকে থানায় নিয়ে যাবে।

থানায় কেন ?

গাড়ি চোর বলে। ভি আই পি-র গাড়ি হাওয়া করে দেওয়ার অপরাধে।

মজা করে কথাগুলো বললেও প্রেমার গাড়ি কিন্তু নেয়নি সরিতা।

বলেছিল, আমি বন্ধুদের গাড়ি ম্যানেজ করে নেব। অন্যকে অয়েল করে তার তেল পোড়াব।

প্রেমা হেসেছিল, কোন কথা আর তখন বলেনি। পরে প্যালেস হোটেলের বার থেকে বেরিয়ে মনে হল তার, সরিতাকে আলেপ্পি থেকে গাড়িতে তুলে নিলে মন্দ হয় না। এসেও ছিল। কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে ডিসটার্ব করতে ইচ্ছে হল না। ওদের একান্তে চলে যেতে দিল প্রেমা। না, কোন বান্ধবীর গাড়িতেই ওরা ফিরল না। হয়ত বাসে ফিরবে অথবা ট্যাক্সি ধরে নেবে পথে। যে করেই ফিরুক, প্রেমা এই মুহূর্তে ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইল। ভালবাসার মুহূর্তগুলোতে মানুষ ইচ্ছে করেই দুঃখ পেতে চায়। রোজকার সুখ-সুবিধেগুলোকে এড়িয়ে চলাতেই আনন্দ।

ওদের ভালবাসার আবীর ছড়ান আকাশের দিকে চেয়ে প্রেমা কিছু সময় দারুণ খুশী হয়ে উঠেছিল। তারপর ধীরে ধীরে একটা বিষণ্ণতা দূর

কোন পল্লীর ধূসর সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়ার মত তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। একটা ঘর বাঁধার স্বপ্ন সে কেন এতদিন দেখল না। শুধু জীবনটাকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলল ডালে ডালে। ঝরিয়ে দিল গাছের তলায়। সবাই বাহবা দিল ফুল ফোটানর খেলা দেখে। কেউ বা কুড়িয়ে নিল গাছের তলার ফুল। গন্ধ শুঁকল মুঠিভরে। তারপর! তারপর দু' দণ্ডের আনন্দ উল্লাসের শেষে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

প্রেমা তার ভাবনার আকাশে হঠাৎ ভেসে-আসা একটুকরো কালো মেঘকে এড়িয়ে যাবার জন্যে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি একটা নির্জন রাস্তা পেরিয়ে এসে পড়ল মেন রোডে। সামান্য কিছু সময় চলার পর আবার কায়েলের ধার দিয়ে রাস্তা শুরু হল। নারকেলের বন চলেছে পাশে পাশে। একটু ভেতরের দিকে লোকালয়।

হঠাৎ সমবেত গলায় একটা গানের সুর ভেসে এল। গাড়ি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সুরটাও অনেক কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। পরিচিত সেই ওয়াল্লীপাটের সুর। গাড়িখানা আসরের কিছু দূরে কতকগুলো নারকেল গাছের আড়ালে রেখে দিল প্রেমা।

গাঁয়ের মানুষেরা ঐ বিশেষ পরিচিত গানের সুর ধরেছে, আর সেই ওয়াল্লীপাটের সুরে নাচছে একটি মানুষ। চেণ্ডা বাজছে। বাজছে ইলত্তালম্ আর মাদলম্। দ্রুত লয়ে নাচছে নর্তক। পাশে জ্বলছে লম্বা পেতলের ভিলক। তার মরা হলুদ আলোয় ভাল করে দেখা যাচ্ছে না নর্তকের মুখ। কিন্তু প্রেমার অভিজ্ঞ চোখ ধরে ফেলেছে এ সাধারণ জাতের নর্তক নয়।

নাচের ভেতরে ঘন ঘন করতালি পড়ছিল। নাচ থামলে হৈ হৈ করে উঠল গ্রাম্য মানুষগুলো।

তারপর নর্তককে দারুণ ভাষায় সাধুবাদ জানাতে জানাতে মানুষগুলো সব চলে গেল। যাবার সময় সম্ভবত কিছু প্রীতি-দর্শনী দিয়ে গেল নর্তককে।

ভিলক জ্বলছিল। নাচের শেষে মানুষটি তার মুখের রঙ তুলে আটপেটিতে গোছগাছ করে তুলছিল পোশাক-আশাক।

প্রেমা গাড়ি থেকে নেমে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে ভাবতে পারেনি তার জন্যে এতবড় একটা চমক অপেক্ষা করে আছে।

হাঁ, দেবন। অনেক আগেই তার চেনা উচিত ছিল। এমন অনায়াস দক্ষ নর্তকের অন্য নাম দেবন।

প্রেমার দিকে পিঠ রেখে বসেছিল দেবন। একটি একটি করে খুলছিল পায়ত্তিকা মণি, কারুত্তারম্, কোল্লারম্, পাভি আরপ্পানম্।

হস্তকটবম্ খোলাব জন্যে বামবাহু দক্ষিণ মণিবন্ধে স্পর্শ করাব সঙ্গে সঙ্গে প্রেমা পেছন থেকে ধরে ফেলল দেবনের হাতখানা। চমকে ফিরে তাকাল দেবন।

বিস্ময় চোখে, বিস্ময় গলার স্বরে, তুমি! প্রেমা!

কি মনে হচ্ছে? প্রেমা অনেক বদলে গেছে?

না, সে-কথা নয়। বরং মনে হচ্ছে তুমি বদলে যাওনি। সারা দেশের কাগজে যার ছবি, সে হঠাৎ যদি এই অখ্যাত জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তাহলে তার পরিবর্তন হয়েছে কি করে বলি।

দেবন তার নিজস্ব ধারায় আবার গোছগাছে মন দিল।

প্রেমা বলল, তোমার কি দু' দণ্ড স্থির হয়ে কথা বলারও সময় হবে না দেবন?

দেবনের হাত বন্ধ হয়ে গেল। চুলে ভরা মাথায় একবার আঙুল চালিয়ে দেবন উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, এত প্রশংসার কথা শুনেও কি তোমার তৃপ্তি হয়নি প্রেমা? ভাল খাবার খেতে খেতে মানুষের যখন মুখ বদলের দরকার হয় তখন তারা অতিসাধারণ খাবার খেতে চায়। তোমার কি তাই?

প্রেমা বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি দেবন, তোমার কথ শুনতেও নয়। আকস্মিকভাবে চলার পথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চিনতে না পারলে চলে যেতাম। কিন্তু সে-কথা থাক। বন্ধু বলেও তো আমরা দু-চারটে কথা বলতে পারি।

দেবন অনেক কাছে এগিয়ে এসে অসংকোচে প্রেমার হাত ধরল।

তুমি তেমনি অভিমানী রয়ে গেছ প্রেমা।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, তুমি ঠিক তেমনি অহংকারী।

দেবন বলল, আমি বুঝি দারুণ দাম্ভিক?

তোমার আচরণ তাই বলে।

দেবন অকৃত্রিম গলায় বলল, বিশ্বাস কর প্রেমা নাচ আমি ভালবাসি, কিন্তু নাচের ব্যাপারে গর্ব করার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

প্রেমা সহজ হল। সে বলল, আজ দৈবাৎ তোমার সঙ্গে দেখা, কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমি দারুণভাবে চাইছিলাম তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাক।

দেবন কৌতুকের হাসি হেসে বলল, তোমার উত্তর ভারত বিজয়ের খবর পেলাম জন্মভূমি পত্রিকায়।

বিজয় বলছ কেন দেবন। বলতে পার দেশ দেখে বেড়ালাম।

মিঃ পিল্লাই তোমার দারুণ শুভানুধ্যায়ী। তিনি জন্মভূমিতে তোমার লালসিয়া বিজয়ের খবর সবিস্তারে লিখেছেন। তোমার সোনার মুকুট পাওয়ার খবরও পেয়েছি।

ফিরে এসে মিঃ পিল্লাই-এর সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। মনে হয় সরিতার কাছ থেকে খবর সব পেয়েছেন।

দেবন বলল, তোমার দেখা পাওয়া যত কঠিন, তোমার খবর পাওয়া তত সোজা।

প্রেমা অমনি বলল, তুমি এত দুর্লভ যে তোমার দেখা অথবা খবর কোনটাই পাওয়া সম্ভব নয়।

দেবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দুর্লভ বলতে চাও বল। তবে সমঝদারের চোখের সামনে থেকে আমি অনেক দূরে সরে এসেছি। এখন আমার চারদিকে যারা ভিড় করে আসে, তারা অতিসাধারণ মানুষ প্রেমা। সারাদিন নৌকো বাইবার পর অথবা ক্ষেতখামার চষার পর তারা আকণ্ঠ কোল্লম গেলে। তারপর আসে আমার নাচ দেখতে। ভাল লেগে গেলেই হৈ-হৈ করে ওঠে। ওরা আমাকে পুরস্কারও দেয়। নাচের শেষে আমি না চাইলেও ওরা আমাকে ছাড়ে না। পাকড়াও করে কাঁধে তুলে নিয়ে ওদের জেলে বস্তি আর কিষাণ পাড়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। জান প্রেমা, ওদের বাড়ির মেয়েরা আমাকে কত যত্ন করে খেতে দেয়। নিজেদের রান্নাকরা খাবারের ভাগ থেকে টেনে নিয়ে আমার খাবার থালা সাজায়।

তুমি ভাগ্যবান দেবন। সত্যিকারের ভালবাসার স্বাদ তুমি পেয়েছ। কিন্তু···

কথাটা বলতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ থেমে দাঁড়াল প্রেমা।

প্রেমাকে থামতে দেখে দেবন বলল, কিন্তু কি প্রেমা ?

ক্ষোভে অভিমানে সেই মুহূর্তে জল এসে গেল প্রেমার চোখে। সে ঝড়ের বেগে ভেতরে জমে থাকা রুদ্ধ আবেগটাকে মুক্ত করে দিয়ে বলল, কি অধিকার আছে তোমার এমনি করে নিজেকে নষ্ট করার। এই কি তোমার জায়গা ? তাহলে এত কষ্ট করে এত সব নাচের মুদ্রা শিখেছিলে কেন ? ওরা তোমাকে ভালবাসতে পারে কিন্তু তোমার ঐ নাচের মর্যাদা দেবার কাণাকড়ি ক্ষমতাও ওদের নেই।

তা আমার অজানা নয় প্রেমা।

কান্না আর ক্ষোভ মিশে গেছে প্রেমার গলায়, তবে এখানে পড়ে থাকা কেন ?

গুণীজনেরা আমাকে কি চায় প্রেমা ?

কেউ না চাইলেও একজন তোমার প্রতিভাকে ঠিকই চিনে নিয়েছিল দেবন। আর সে প্রায় প্রতিদিন তোমাকে সারা হৃদয় ঢেলে তার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে।

দেবন প্রেমার ছেড়ে দেওয়া হাতখানা আবার নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে বলল, সে আমার অচেনা নয় প্রেমা। আর সে আমার মনের থেকে বেশী দূরেও নয়।

প্রেমা এবার নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দেবনের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে ঈশ্বরই আমাকে পাঠিয়েছেন দেবন।

কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও প্রেমা ?

আপাততঃ আমার কাছে, তারপর ভারতের শ্রেষ্ঠ সমঝদারদের চোখের সামনে। আমি তাঁদের জানাতে চাই প্রতিভাবান তদ্বির কিংবা তোষামদের দাস নয়। প্রতিভাকে খুঁজে পেতে হয়, আবিষ্কার করতে হয়।

তুমি আমার জন্যে এত ভাব প্রেমা ?

প্রেমার চোখে জল মুখে হাসি। সে মাথা নেড়ে জানাল, একটুও না।

দেবন হাসল। হাসিটা অনেকখানি মেঘের ফাঁক থেকে করুণ আলোর মত ফুটে উঠল।

কিন্তু।

আর কোন কিন্তু নেই দেবন।

কথা দিচ্ছি তোমার সঙ্গেই যাব প্রেমা। তবু যাবার সময় এই মানুষগুলোকে ভুলতে পারছি না। আমার দুঃখের দিনে এরাই আমাকেভালবাসা আর প্রেরণা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সবাই একদিন ভুলে যায় প্রেমা, কিন্তু এই মানুষগুলো একবার কাউকে বুকের মাঝখানে টেনে নিলে মরার আগে আর ভোলে না।

তোমার কথাগুলো সত্যি দেবন, তবু ওদের ছেড়ে চলে যেতে হয়। শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কখনও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। এর জন্যে চিরদিনই গুণীর নিক্তির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। গুণীর সামান্য একটুকরো প্রশংসা সাধারণের হাজার হাততালির চেয়ে অনেক দামী দেবন।

মানি, কিন্তু তেমন গুণী কই যাঁর চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ভক্তিতে আপনিই মাথাটা নুয়ে আসে। তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলে নিজেকে ছোট বলে মনে হয় না।

আছে দেবন, তবে সংখ্যায় তাঁরা অনেক কম। যাঁরা মুরুব্বি সমঝদার সেজে হাঁকডাক করে বেড়ান, তাঁরাই আজ বাজার জাঁকিয়ে বসে আছেন। আমাদের কাণাকড়ি দরকারও তাঁদের কাছে নেই। গুরু পাণিক্কর, মাধবী আম্মার মত গুরু যতকাল আছেন আমাদের সাধনার বস্তুগুলো নিয়ে বার বার তাঁদেরই কাছে যাচাই-এর জন্যে যেতে হবে।

আমার আর কোন কথা নেই প্রেমা। এখন থেকে তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা মিলে গেল। চল যেখানে নিয়ে যেতে চাও।

প্রেমা আজ জয়ী হয়েছে। যাকে ঘিরে তার এতদিনের স্বপ্ন তাকে সে নিজের ইচ্ছার পথে চালাতে সমর্থ হয়েছে। এত বড় একটা প্রতিভাকে বিনষ্টির হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরে একটা গভীর তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে তার মন। মূল্যবান একখণ্ড হীরেকে সে আসল জহুরীর কাছে যাচাই করে ফিরবে। তাদের বলতে হবে, এ হীরে সহজে পাবার নয়। তখন মহামূল্য মণির মত সে তাকে তুলে নেবে তার শিরোভূষণ করে। সে আর কিছু চায় না, শুধু দেবনকে চায়। তার সম্পদ তার সম্মান তার সাধনার সকল সঞ্চয় সে নির্দ্বিধায় দেবনের হাতে তুলে দেবার জন্যে প্রস্তুত।

এই মুহূর্তে প্রেমার মনে হল, বিচিত্র জীবনের বহু অভিজ্ঞতার পথ পেরিয়ে সে এখন এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দুচোখ আকুল আবেশে বন্ধ হয়ে আসতে চাইল।

সারা ভারত থেকে শিল্পী নির্বাচন করে আনতে হবে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর চেয়ে প্রতিশ্রুতিবান শিল্পীর দরকারই বেশী। পরিকল্পনা চলতে থাকে। নতুন দল গড়ার উত্তেজনায় দৈনন্দিন জীবনের রুটিনগুলো দমকা হাওয়ায় কোথায় উড়ে যায়। দেবন আর প্রেমা বেরুবে দিগ্বিজয়ে। তার আগে চাই উপযুক্ত সৈন্য নিয়ে বাহিনী গঠন। ওরা দুজনে ঘুরে বেড়াবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ক্ল্যাসিক্যাল নাচের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে লোকনৃত্য। দলে চাই সব রকম শিল্পী। শিল্পী নির্বাচন সবচেয়ে বড় কথা। তার সঙ্গে

সঙ্গে বিপুল অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব। পর্বত প্রমাণ সমস্যা। কিন্তু তাকে অতিক্রমের ইচ্ছা আকাশ ছোঁয়া।

দেবনকে দেওয়া হয়েছে সান-অ্যাণ্ড-সী হোটেলের প্রশস্ত একখানা ঘর। ওখানেই প্রেমা পরিকল্পিত নতুন দলের অফিস। রাত দিন দুই শিল্পী ওখানে বসে প্ল্যান তৈরী করে চলেছে। নতুন ব্যালে গ্রুপের নামকরণ করা হয়েছে 'সঙ্গম'। পরিকল্পনায় প্রেমা মেনন আর রূপকার দেবন।

উত্তরে হিমাচল দক্ষিণে সাগর। তার মাঝে উপবীতের মত মিলন সূত্রটি বেঁধে দিয়েছে গঙ্গা। গোমুখ থেকে বেরিয়ে পাহাড় পর্বত পার হয়ে সমভূমিতে নেমে এসেছে নদী। তারপর সাগর সঙ্গমে সে পেয়েছে তার পূর্ণতা।

প্রাচীন পুরাণের ভগীরথ উপাখ্যান দিয়ে শুরু এদের ব্যালে। পর্বত আর নদী তীরের বিচিত্র জীবন-ছন্দ রূপায়িত হবে নৃত্যের মাধ্যমে। এখানে পাহাড়ী স্রোতোধারার মত অজস্র লোকনৃত্যের ধারা এসে মিলবে মূল কাহিনীর নৃত্যরূপের সঙ্গে। নদী যেখানে নগর ছুঁয়ে আসছে সেখানে ক্ল্যাসিক্যাল নাচের রাজকীয় সমৃদ্ধি। সাগর সঙ্গমে ভারতের সব রকম নৃত্যের চুম্বক প্রদর্শিত হবে। তারপর চলবে সমুদ্র মন্থন লীলা। এর পরেই অমৃত নিয়ে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। সব শেষে নৃত্য মঞ্চে মোহিনীর আবির্ভাব। নৃত্যে বিমোহিত করে অমৃত নিয়ে প্রস্থান। নীলকণ্ঠের নৃত্য। মোহিনী মায়ায় মোহগ্রস্ত শিবের মোহিনীর সঙ্গে যুগল নৃত্য। শেষে মোহিনী আর শঙ্করের মিলনে শাস্তার জন্ম। আইআপ্পানের পূজারতিতে নৃত্যের সমাপ্তি।

প্রেমা বলে, তুমি ভগীরথ।

দেবন অমনি বলে, তাহলে তুমি গঙ্গা।

আমি কি তোমার নমস্য?

প্রতিটি নারীই প্রবাহিনী। গঙ্গা গোদাবরী নর্মদা কৃষ্ণা কাবেরী। প্রতি নদী নমস্য।

ব্যালের শুরুতে তুমি ভগীরথের ভূমিকা নিলেও শেষে তোমার ভূমিকা কিন্তু শঙ্করের।

দেবন বলে, আর তুমি মোহিনী।

প্রেমা আশ্চর্য মোহিনী দৃষ্টি হানে। মনে মনে বলে, চিরদিনই আমি যেন তোমার চোখে মোহিনী মায়ার অঞ্জন পরাতে পারি দেবন।

পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি নয়, এ যেন তপস্যা। দুজনের সীমাহীন উত্তেজনা,

অন্তহীন ভাবনা। আরব সাগরের উদ্বেলিত তরঙ্গের নিরন্তর উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে পড়ার মত।

অনেক রাতে ঘরে ফেরে প্রেমা। হোটেলে দেবন আর সে একই সঙ্গে কাজের ফাঁকে ডিনার শেষ করে নেয়।

সেদিন রাতে ঘরে ফিরে এল প্রেমা। তখন রাত গভীর। সে একখানা চিঠি পেয়েছিল হোটেলের ঠিকানায়। দেবন তখন নৃত্য কাহিনীর ভেতর কোথায় কি ধরনের নাচ দেওয়া যায় তাই নিয়ে মগ্ন ছিল চিন্তায়। পাশে বসে তাকে সাহায্য করছিল প্রেমা। হোটেলের বেয়ারা চিঠি দিয়ে গেল। খামের পাশে প্রেরকের নাম চোখে পড়তেই চঞ্চল হয়ে উঠল প্রেমা। চিঠিখানা সে তখন না খুলেই রেখে দিল ব্যাগের ভেতর। এক উত্তেজনার তরঙ্গের ওপর আছড়ে পড়ল আর এক উত্তেজনার ঢেউ। মগ্ন দেবন কিছু জানল না, প্রেমাও নির্বাক হয়ে নিজের চিন্তার ভেতর ডুবে রইল।

ডিনারের পরে প্রেমা বলল, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে দেবন।

দেবন হেসে বলল, সরিতা আবার না তোমার শরীরের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

প্রেমা ম্লান একটুখানি হেসে উঠে পড়ল।

সে কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরে ফিরল না। গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলল প্যালেস হোটেলের দিকে। বারে ঢুকে একটা কোণ বেছে নিয়ে বসল। ড্রিঙ্কের অর্ডার নিয়ে সার্ভ করে গেল ওয়েটার। স্তিমিত আলোয় জয়কিষণের চিঠিখানা খুলল সে।

প্রেমা,

তোমার নামের আগে একটা কিছু বিশেষণ বসাব বলে অনেক ভেবেও কুল না পেয়ে নিরাভরণই রাখলাম। ভাবছি, আভরণের দরকারই বা কি। তোমার নাচের প্রতিটি মুদ্রা প্রতিটি একসপ্রেশানই তোমার আভরণ।

কবে তুমি যেন এখান থেকে চলে গেলে। তারপর একটা শূন্যতা লালসিয়া স্টেটের চরাচরের ওপর স্থির হয়ে রইল। নাটমণ্ডপ নিস্তব্ধ। কত যুগ আগে যেন নূপুরের ধ্বনি উঠেছিল। তারপর হঠাৎ থেমে গেছে সবকিছু। নটী তার চঞ্চল পায়ের নূপুর খুলে রেখে চলে গেছে। স্মৃতির নিঃশব্দ যন্ত্রণায় ভুগছে নাটমণ্ডপ।

যে শাল অরণ্যের ভেতর আমরা শেষের ক'টি দিন হাতে হাত রেখে ঘুরেছি, পাতার প্রলাপ শুনেছি, এখন তারা একেবারে নির্বাক। বেলা শেষে ঘোড়া নিয়ে ওপথে ফিরে আসার সময় আমি দ্রুত পথটুকু পেরিয়ে আসবার জন্যে ঘোড়া ছুটিয়েছি, কিন্তু তাতে নিঃশব্দ অরণ্যের বুকের ধ্বনির মত শুনিয়েছে ঘোড়ার খুরের শব্দ।

তোমার লালসিয়া ছেড়ে চলে যাবার দিনটির কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ট্রেন পর্যন্ত সারাটা পথ আমার বুকের ভেতর তোমার চুলে ভরা মাথাটা রেখে দিয়েছিলে। একটা মিষ্টি গন্ধ পাপড়ি খোলা ফুলের মত আমার সমস্ত চেতনাকে স্পর্শ করছিল, আচ্ছন্ন করছিল।

তুমি হঠাৎ এক সময় বলে উঠলে, তোমার মন থেকে মধুবন্তীর স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যাক, এ আমি চাই না জয়কিষণ। তাই নিজেকে সরিয়ে রাখছি তোমার কাছ থেকে।

আমি কোন উত্তর দিতে পারি নি। মধুবন্তীর কাছে যেমন চরম অপরাধী হতে চাই নি, তেমনি চাই নি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে সেই মুহূর্তে বুকে চেপে ধরতে। যতদিন ভালবাসা সীমাহীন উত্তেজনায় দেহের তটে না আছড়ে ভেঙে পড়ে ততদিনই ভালবাসার পরমায়ু প্রেমা। তাই সমস্ত দেহমন ধরে রাখতে চাইলেও তোমাকে যেতে দিয়েছি। আমাদের অনুচ্চারিত ভালবাসাকে (যদি তুমি একে ভালবাসা বলে মনে কর) অনেক দিন ধরে বুকের মধ্যে পুষে রাখার জন্যে।

এই দেখ তো চিঠির শুরুতেই ভালবাসার দর্শন নিয়ে আলোচনা জুড়ে দিয়েছি।

দোলনকে তুমি চিঠি লেখ আর আমি লোভীর মত তার প্রতিটি ছত্র পড়ে পড়ে দেখি। যদি দোলনের চিঠিতে জয়কিষণের সামান্য প্রসঙ্গও কর্পূরের শেষ সুরভির মত লেগে থাকে।

দোলন তোমাকে চিঠি লেখে। সে লেখা আমি দেখতে পাই না। কিন্তু তোমার চিঠি এলে দোলন আমার টেবিলে রেখে যায়। অমনি আমার নির্জন নিঃসঙ্গ দিন তোমার উপস্থিতিতে ভরে ওঠে।

সেদিন হঠাৎ দোলনের কনভেন্টের কি যেন একটা ছুটি ছিল। ও আমাকে অবাক করে দিয়ে একাই এসে হাজির হল। আসতে হলে আমার কেয়ার-টেকারকে সঙ্গে নিয়েই ও আসে। কিন্তু একেবারে একলা এই ওর প্রথম।

আমি মনে মনে অবাক হলেও মুখে ওকে বাহবাই দিলাম। ও আমার বড দুঃসাহসী মেয়ে। কিন্তু মনটা ওর ঐ গঙ্গার মত। করুণায় ভরা।

ও এসেই আমাকে অনেকক্ষণ আদর করে তোমার চিঠি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ বাবা।

চিঠিখানা পড়লাম। ঐ চিঠিতেই তোমার ব্যালে গ্রুপ গড়ে তোলার খবর পেলাম। সারা ভারতে এমন কি ইণ্ডিয়ার বাইরেও যে তুমি দল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখছ তা জানতে পারলাম।

তোমার চিঠির শেষে তুমি লিখেছ, এত বড একটা কাজের ঝুঁকি নিয়ে হয়ত তুমি সময় মত দোলনকে চিঠি লিখতে পারবে না। তাতে ও যেন কিছু মনে না করে।

দোলন কিছু মনে করবে কিনা জানি না তবে আরও কেউ দোলনের কাছাকাছি আছে যে কিছু মনে করতে পারে। তোমার কাছ থেকে সে মানুষটা আর কিছু চায় না শুধু তোমার ধাপে ধাপে এগিয়ে চলার খবরটুকু ছাড়া।

আর এক জায়গায় তুমি ছোট্ট একটু রসিকতা করেছ। যদিও ছোট তবুও তাকে কৌতুক বলে ফেলে দিতে পারলাম না। তুমি লিখেছ লালসিয়ার পাহাডগুলোর মত যদি আমার টাকার পাহাড় থাকত তাহলে আমি আমার নাচের দলবল নিয়ে চাঁদের দেশেও চলে যেতে পারতাম।

তোমার ঐ সামান্য কথার সূত্র ধরে আমাকে কি একটুখানি ধৃষ্টতা দেখাতে দেবে প্রেমা? দোলনের সঙ্গে বেলা শেষে বেড়াতে বেরিয়ে ঐ শাল জঙ্গলের ভেতরে বসে তোমার চাঁদের দেশে যাবার পাথেয়র কথা তুললাম। দোলন অমনি বলল, তুমি না মায়ের নাট মণ্ডপের জন্যে অনেকগুলো টাকা আলাদা করে রেখেছিলে। তাই দাও না আন্টিকে।

বিশ্বাস কর প্রেমা এ আমার কথা নয়, তোমার অনেক আদরের দোলনের কথা। ও সত্যিই তোমাকে ভালবাসে।

আমি জানি তুমি এখন তোমার কাজের ভেতর ডুবে আছ, তাই চিঠিকে আর দীর্ঘ করতে চাই না। তবে আবার একবার শুধু এটুকু বলার অনুমতি দাও যে প্রেমার কাজে জয়কিষণ সামান্য কিছু অংশ নিতে পারলেও নিজেকে সুখী মনে করবে।

তোমার জয়।

কয়েক বার চিঠিখানার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রেমা এক সময় উঠে দাঁড়াল। প্যালেস হোটেলের বাইরে তখন অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের কোন এক তিথি। চাঁদ তখনও আকাশের আসরে এসে পৌঁছয়নি। হোটেলের প্রবেশ প্রাঙ্গণে একটা আলো কর্তব্যনিষ্ঠ প্রহরীর মত অন্ধকার লুঠেরাদের কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছে।

প্রেমা গাড়ী চালাল বাড়ীর পথে। দু' পাশের নারকেল অরণ্য পিছলে সরে যাচ্ছে পেছনে। এক একটা টিলা এগিয়ে আসছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। স্পীডে গাড়ী চলছে। বাঁকগুলোতে গাড়ীর আওয়াজ উপচে উঠছে।

প্রেমার মনে হচ্ছে তার পাশে বসে আছে জয়কিষণ। সে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চলেছে লালসিয়ার পাহাড়ী পথে।

প্রেমা ভাবছে সে আর প্রেমা মেনন নয়, সে লালসিয়া স্টেটের কুমারবাহাদুর জয়কিষণের নতুন পারণীতা বধূ প্রেমা গর্গ। সদ্য মুসৌরী থেকে হানিমুন সেরে ফিরছে লালসিয়া। জয়কিষণ, জয়কিষণ, জয়কিষণ। বুকের ভেতরে ভেতরে ক্রমাগত বাজছে ঐ নামটা। একটা উদ্বেল সুখ আরব সাগরের ঢেউ-এর মত আছড়ে আছড়ে পড়ছে সোনালী জম্বরে ঢাকা বুকের ওপর। ভিজিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

সামনের পথ আবছা হয়ে উঠতেই প্রেমা ব্রেক কষল। সুখের কুয়াশায় কখন ভিজে উঠেছে চোখের পাতা।

চোখ মুছল প্রেমা। স্বপ্নের জগৎ থেকে এখন ফিরে এসেছে সে। জয়কিষণ নেই। নির্জন পথ। নিস্তব্ধ চরাচর। ঘড়ি দেখল। কয়েক মিনিট পরেই মধ্য যামে গড়িয়ে যাবে রাত। প্রেমা আবার গাড়ীতে স্টার্ট দিল। সামান্য সময়ের ভেতরেই সে এসে পড়ল তার ডেরায়।

ওপরের ঘরে আলো জ্বলছিল। সরিতা এখনও ঘুমোয় নি। মেয়েটা বড্ড ঘুম কাতুরে। সাড়ে দশটার ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়ে পড়াশোনা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে। আজ ও জেগে রয়েছে এতক্ষণ! প্রেমা একটু অবাক হল বৈ কি।

গাড়ী থেকে নেমে সোজা উঠে গেল ওপরে। সরিতা বিছানার ওপর বসে কি যেন একটা বই পড়ছিল। প্রেমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে বই রেখে তাকাল।

কিরে তুই যে বড় এতক্ষণ জেগে?

সরিতা বলল, তোর জন্যে।

আমার জন্যে আবার তুই কবে জেগে থাকিস ?

জাগিনা, তবে আজ জেগে আছি।

কি ব্যাপার বল তো ? প্রেমেটেমে পড়েছিস নাকি ? সমাধান করতে পারছিস না একা একা ?

কথা বলতে বলতে প্রেমা সরিতার পাশে বসে তার পিঠে হাত রাখল। সরিতা হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। সে প্রেমার একখানা হাত টেনে নিয়ে তার পাতায় মুখখানা ঢেকে ফেলল। প্রেমা হাতখানা সরাতে গিয়ে দেখল সরিতা শক্ত করে ধরে আছে।

কি হল তোর পাগলী ! বল না আমাকে ?

অন্য হাতখানা দিয়ে জড়িয়ে ধরল সরিতাকে।

সরিতা কোন কথা বলতে পারল না। সে প্রেমার হাতে মুখখানা ঘষতে লাগল।

আমি জানি তুই ইন্দ্রকে ভালবাসিস। বিয়ে করতে চাস, এই তো ?

আরও জোরে প্রেমার হাতখানা মুখে চেপে ধরল সরিতা।

যখন হাত সরিয়ে নিতে পারল প্রেমা তখন চোখের সামনে একটা স্থলপদ্ম ফুটে উঠল। লজ্জা আর অনুরাগের যুগল আভায় সারা মুখখানা স্থলপদ্মের রূপ নিয়েছে।

সরিতা অন্য দিকে চেয়ে বলল, তুই বিয়ে না করলে আমি কক্ষনো বিয়ে করব না দিদি।

আবার প্রেমা হাত রাখল সরিতার পিঠের ওপর। বলল, শিল্পীরা সবার মত ঘর বাঁধতে পারে না সরিতা। শিল্পের সঙ্গেই তাদের মিলন হয়। সমাজের মন্ত্র পড়া বাঁধনে তাদের মন বাঁধা পড়ে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যেখানে সুন্দর সেখানেই তাদের মনের যোগ। কিন্তু সেও তো স্থায়ী নয়। এক সুন্দর থেকে আর এক সুন্দরে তার উড়ে উড়ে ফেরা। তাই আমার বিয়ের কথা তুই ভাবিস না সরিতা।

সরিতার চোখ দুটো জলে টলটল করে উঠল।

প্রেমা তার মুখখানা নিজের দুটো হাতের পাতায় তুলে ধরতেই কয়েক ফোঁটা তপ্ত ধারা গড়িয়ে পড়ল প্রেমার হাতে।

প্রেমা বলল, তুই এত ভাবছিস কেন বল তো ? সুখী হওয়া তৃপ্তি পাওয়া নিয়েই তো কথা। একজন মানুষের মন যেখানে এসে সুখ পায় সেখানেই তার সব সেরা আশ্রয়।

সরিতা বলল, সারা জীবন তুই এমনি করে কাটাবি, আমি ভাবতেও পারি না। এতে তুই সত্যিই কি সুখ পাবি দিদি?

প্রেমা একটু চিন্তা করে বলল, সুখ পাই কিনা তা বলতে পারি না সরিতা। তবে বার বার এক একটা মানুষের মনের কাছ থেকে সরে সরে আসার সময়ে যে দুঃখ পাই তা নতুন সৃষ্টির জোয়ার এনে দেয়। এ আমার এই সামান্য জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

সরিতা এবার প্রেমার চোখের ওপর তার কাতর দুটো চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, আঘাতে আঘাতে একদিন ঝাঝরা হয়ে যাবে বুকখানা। তখন কি আর তোর সৃষ্টির শক্তি থাকবে?

প্রেমা হেসে বলল, সেদিন তুই না বলেছিলি মালী আমাদের বাগানের অনেকদিনের গোলাপ গাছটা তুলে ফেলে দিয়েছে। আমরা সেদিন দুঃখ পেয়েছিলাম গাছটার কথা ভেবে। কতদিন ঐ গাছের আধ ফোটা ফুল চুলে গেঁথে নিয়ে কত অনুষ্ঠানে গেছি। সে বারে বারে ফুল ফোটানর খেলা দেখিয়ে আমাদের অবাক করে দিয়েছে। কিন্তু একদিন যখন তার খেলা থেমে গেল তখন তাকে সরে যেতে হল বাগান থেকে। ও যে এতকাল তার বুকের পাঁজর ফাটিয়ে রক্তের মত তাজা গোলাপ ফুটিয়েছিল সে কথা বড় বেশী করে কেউ মনে রাখবে না। তবে আমরা যে ওর দেওয়া ফুল মাথায় গুঁজে অনেকের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছি ওখানেই ত ও সমঝদারের স্মৃতির মধ্যে বেঁচে রইল সরিতা।

তুই কি কাউকে জীবনে গভীর করে ভালবাসিস নি?

প্রেমার দৃষ্টি এবার নিজের গভীরে ডুব দিল। সে বলল, ভালবাসার স্বাদ আমি পেয়েছি সরিতা। যখন যাকে ভালবেসেছি তখন গভীর করেই বেসেছি। সেখানে কোন ছলনা বা খাদ ছিল না। কিন্তু আমি এটুকু অনুভব করেছি, কোন একজনকে সারা জীবন ভালবাসা যায় না। কারণটা আমি মনে মনে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়েছে কোন একটি মানুষের ভেতর ভালবাসা আকর্ষণের সব উপাদান নেই। বোধহয় থাকা সম্ভবও নয়। ডেভিডের ভেতর কিংবা মিঃ পিল্লাই অথবা জয়কিষণের ভেতর ভাল লাগার অনেক উপাদান আছে কিন্তু একজনের ভেতর তো সব পাওয়া যাবে না। এদিকে মনের চাহিদার তো শেষ নেই। ওদের ভালবেসেছি খণ্ড খণ্ড সময়ের এক একটা নির্জন সীমার ভেতর। আবার মন কখন ভেঙে বেরিয়ে গেছে ঐ সীমার গণ্ডী। ঠিক প্রজাপতির সোনালী গুটি ভেঙে বেরিয়ে আসার মত।

সরিতা বলল, তুই দেবনকে ভালবাসিস না দিদি?

এখনও তার মনের পুরোপুরি ছবিটা আমি দেখতে পাই নি, বোধহয় তাই তাকে ঘিরে এখন আমার মন ভালবাসার সোনালী জাল বুনছে। আর তাছাড়া…।

কথার মাঝখানে থেমে গেল প্রেমা।

তাছাড়া কি?

তদ্গত প্রেমা বলল, দেবন নিজেকে এমন একটা জায়গায় সরিয়ে রেখেছে যেখানে সবাই যেতে পারে না। ওর সাধনার সেই জায়গায় পৌঁছে করাঘাত করলেও যে দ্বার খুলবে এমন সম্ভাবনা কই!

সবিতা বলল, আমার মনে হয় তোর বন্ধু দেবন সবার চেয়ে স্বতন্ত্র।

সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না সবিতা। ও দেবতার মত স্থির। বলতে পারিস ওকে ঘিরে আমাদের উৎসব। ও নিজের মনের আনন্দ থেকে ফুটে ওঠা একটা ফুল। ওর চারদিকে ভালবাসার প্রজাপতিরা শুধু নেচে নেচে ফিরে যায়।

সরিতা বলল, বিশ্বাস কর দিদি দেবনকে মুখোমুখি দেখলে মনে হয় ও যেন সূর্য। সামনে এলে মুখে একটা হাসির আভা দেখা যায় কিন্তু ভাল করে দেখলে বোঝা যায় ও হাসি কারু জন্য নয়। ও ওর মনের ভাবনার ছড়িয়ে পড়া দীপ্তি।

প্রেমা উত্তর করল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

প্রসঙ্গে ছেদ ফেলে এক সময় বলল, এখন দেবনের কথা থাক, ইন্দ্রের কথা বল।

সরিতা বলল, ও অতি সাধারণ দিদি।

প্রেমা বলল, সাধারণই জীবনে সুখ দিতে পারে সরিতা। যত ব্যথা অসাধারণকে বুকে ধরার স্বপ্ন দেখলে।

সরিতা হঠাৎ বলল, তুই কি করে ইন্দ্রের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা জানতে পারলি দিদি?

প্রেমা হাসল। বলল, তুই যে আমার বোন। এক রক্ত শরীরে। তাই তোর মনের কথা জানা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

ও সব কথা ছাড়। সত্যি করে বল না দিদি কি করে আঁচ করলি?

বার বার আমি ইন্দ্রের কাজের যখন প্রশংসা করি তখন তুই খালি খুঁত ধরিস। তখনই মনে হয়েছে কোথায় যেন একটা লুকোচুরি চলেছে। আর তাছাড়া পৃথিবীটা গোলাকার বলে দু'জন ভিন্ন দিকে চলা শুরু করেও একদিন এক জায়গায় মুখোমুখি হলাম।

মানে ?

মানে খুব সোজা। ওনামের বোট রেস দেখতে তুই বন্ধুকে নিয়ে পালালি আর আমি প্যালেস হোটেল থেকে বোনকে গাড়ী করে আনব বলে ছুটলাম আলেপ্‌পির দিকে। সেখানেই ভীড়ের ভেতর দেখলাম যুগল মিলন।

সরিতা দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

প্রেমা বলল, ভেবেছিলি খুব ধুলো দিলাম দিদির চোখে। কিন্তু নাচ শিখে আর কিছু হোক বা না হোক চোখের যে উন্নতি হয়েছে সেটা বেশ বুঝেছি ভীড়ের ভেতর তোদের আবিষ্কার করে।

সরিতা চোখের থেকে হাত নামিয়ে বলল, ডাকলি না কেন ?

আমি কি বাল্মীকির ব্যাধ যে বেরসিকের মত দুটি কূজনরত পাখির দিকে বাণ ছুড়ব।

সরিতা হঠাৎ প্রেমার হাত ধরে ভেঙে পড়ে বলল, এখন আমি কি করি দিদি।

ভাবছি। প্রথমেই ইন্দ্রের কিছু সাজা হওয়া দরকার। ওকে হোটেল থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরাতে হবে।

চমকে উঠল সরিতা। চোখে মুখে ফুটে উঠল অসহায় একটা ছবি। কথাগুলোকে ভেঙে জড়িয়ে বলল, বিশ্বাস কর, মানে ইন্দ্রকে তুই ভুল বুঝবি না। ও বেচারার কি দোষ বল। আমি তো ওকে ভালবেসেছি। কতদূর থেকে এসেছে তোর কাছে চাকরী নিয়ে। এখন চাকরী গেলে বেচারার কি হাল হবে। দোষ আমার, তুই আমাকে শাস্তি দে।

প্রেমা বলল, একেবারে হাবুডুবু যে রে! তা ইন্দ্র ছেলেটা বেশ। যেমন দেখতে তেমনি কাজের। তবে ওকে তো আর হোটেলে রাখা চলবে না। বোনের বর হতে চলেছে তার সম্মান নেই। লোকে বলবে ম্যানেজারের সঙ্গে মালিকের বিয়ে হল। আগে ম্যানেজারকে মালিক করি তারপর বিয়ে দেব বোনের সঙ্গে।

কোথায় পাঠাবি ইন্দ্রকে ?

সে ভাবনা আমার। মোট কথা দেশান্তরী করব না। তবে আপাততঃ কিছুদিন সরিতা মেননের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাতটা বন্ধ থাকবে।

মরে যাব তাহলে।

সে কি রে! এত ঘন ঘন দেখা হতে থাকলে যে সবকিছু চটপট পুরোনো হয়ে যাবে।

সরিতা আঙুলে আঙুল বেঁধে চুপচাপ বসে রইল দেখে প্রেমা বলল, ঘাবড়াস কেন। গাভী তো রয়েছে আর আরব সাগরটাও উধাও হয়ে যাচ্ছে না। গাভী নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবি দুজনে। রাতে ইচ্ছে হলে সমুদ্রের ধারে বালির ওপর বসে গল্প ফাঁদবি। মোট কথা সবার চোখের সামনে নয়।

সরিতা এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, তাহলে সব ঠিক আছে।

প্রেমার চোখে লাগল এবার ভাবনার ছোঁয়া। বলল, নতুন একটা ফিসারি তোর আর ইন্দ্রের নামে করে দেব ভেবেছি। ওটা ইন্দ্রই ম্যানেজ করবে। ও এখন কিছুদিন ফিসারি গড়ার কাজে থাক কোচিনে। মাঝে মধ্যে ও আসুক, তুইও যাবি।

দারুণ মজা হবে। সরিতা কলবলিয়ে উঠল।

প্রেমা অমনি বলল, মজা বলে মজা! রায় অ্যাণ্ড মেনন ফিসারিজের লঞ্চে বসে আরব সাগরের জলে মাছ ধরার অছিলায় যখন গভীর জলে ডুব দিবি দুই পার্টনার তখন আর যা হোক অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্যে নিরীহ মাছগুলো বেঁচে যাবে।

সরিতা ছেলে মানুষের মত হেসে উঠে প্রেমার হাতখানা টেনে ধরে বলল তোকেও একদিন তোর লাভারের সঙ্গে ঐ লঞ্চে তুলে দেব ঢেউয়ের ওপর দোল খাবার জন্যে।

প্রেমা বলল, আমার লঞ্চের দরকার হবে না। স্টেজের ওপরেই পার্টনারের সঙ্গে ইচ্ছে হলে দোল খাব।

প্রেমা শেষ রাতে বিছানা ছেড়ে উঠল। চাঁদের একটুকরো আলোয় দেখল ঘুমন্ত সরিতার মুখখানা। ঘুমের ভেতরও সুখের একটা ছবি ফুটে উঠেছে সরিতার মুখে। প্রেমার এত আনন্দ হল যে চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল।

প্রেমা পাশের ঘরে গিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জেলে চিঠি লিখতে বসল।

তুমি চিরদিন আমার কাছে একটা বিস্ময়চিহ্ন হয়ে রইলে। কয়েকটা বিহ্বলকরা রাতের স্মৃতি আমাকে আজও অবাক করে দেয়। সেই হরিদ্বারে গঙ্গার শব্দ শুনতে শুনতে রয়েল হোটেলে পাশাপাশি ঘরে রাত কাটান। ঘুম ছিল না কারু চোখে। মুসৌরীর সেই হারিয়ে যাওয়া রাতে ঘুম ভাঙল তোমার কোলে মাথা রেখে। তোমার উদ্বেগ আর আনন্দেভরা বুক থেকে বেরিয়ে আসা তপ্ত একটা নিঃশ্বাস আমার মুখের ওপর এসে পড়ল। তারপর

জালসিয়াতে কটি রাতের স্মৃতি। দোলন নেই। বিরাট মধুবন্তী মহলে মুখোমুখি বসে জীবনের কত টুকরো গল্প বলে যাওয়া। দূর উপত্যকায় কুয়াশা আর জ্যোৎস্নার আলোর জড়িয়ে থাকার ছবি দেখা। সত্যি সে যেন এক রহস্যের যাদু মহল পেরিয়ে পেরিয়ে আমাদের কটি দিন কটি রাত পাশাপাশি চলা। তখন নিজেকে মনে হত একটি মোমের পুতুল। তোমার বুকের উত্তাপে গলে নিজের সবকিছু হারিয়ে ফেলব।

কিন্তু তুমি তা হতে দাওনি। তোমার বুকের শব্দে আমি আমার সুখের মৃত্যুর ডাক শুনেছি। যখন মরণটাকে বরণ করে নেবার জন্যে তৈরী তখন তুমি অমিত বীর্যবান কোন পুরাণ পুরুষের মত নিজেকে সরিয়ে রেখেছ।

আমি কথার ছলে জেনেছি অতিথিকে উৎসবমঞ্চে ডেকে এনে তুমি কোনরকমেই তাকে অসম্মানিত করতে চাও না। যদিও আমি তাকে অসম্মান বলে কোনদিনই মনে করতাম কিনা জানি না।

কিন্তু আমিও পুরোপুরি এগিয়ে যেতে পারলাম কই জয় আমার মোহিনী-মায়ার অমোঘ অস্ত্রগুলো নিয়ে। কাছে গিয়েও দেখেছি তোমার আমার মাঝখানের ছোট ব্যবধানটুকু ভরে রেখেছে আর একটি অদৃশ্য সত্তা। সে তোমার মনের লীলাসঙ্গিনী মধুবন্তী। তাকে উপেক্ষা করার শক্তি তোমার ছিল না আর তাকে পেরিয়ে যাবার সাহসও আমি কোনদিন পাইনি।

জয়, ওটা আমাদের চিত্ত জয়ের একটা সাধনপর্ব বলে ধরে নাও না কেন। ওতে হয়ত আমাদের হেরে যাবার দুঃখ কিছুটা লাঘব হবে।

এবার তোমার আর একখানা ছবির পাশে এসে দাঁড়াতে হল। তুমি তোমার অযাচিত সাহায্যের হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছ আমার দিকে। তোমার দান উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। তবু একটা কথা শুধু জানিয়ে রাখি আমার বাবা দুবোনের জন্যে যা রেখে গেছেন তা অফুরন্ত না হলেও একেবারে পরিমিত নয়। তাই আমাকে আগে আমার সঞ্চয়গুলো কাজে লাগাবার সুযোগ দাও। তারপর তোমার অক্ষয়দানে আমার হাত পড়বে।

দোলন যে তার বাবার যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে তা সোনার শিরোপা পাবার দিনেই বুঝেছিলাম। সে যে এবার তার মাতৃধন আমার হাতে তুলে দিতে চাইছে এতে আমি তার আকাশের মত মন আর আলোর মত উদার হাতে সর্বকিছু বিলিয়ে দেবার পরিচয় পাচ্ছি। যাকে আদর জানাতে পারলাম না তার প্রতিনিধিকে বুক উজাড় করা ভালবাসা জানালাম।

তোমার প্রেমা

প্রেমা আর দেবন পুরোপুরি একটি বছর সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ মঞ্চগুলোর পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াল। কখনো তাদের দেখে মনে হল পুষ্পিত বসন্তের রঙীন সজ্জায় পুষ্পধনু রতি ; কখনো বা যুগল যোগাসনে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি পার্বতী। আবার কখনো শরত আকাশে উড়ে চলা হংসমিথুন।

দর্শক বিহ্বল। সংবাদপত্র গুণী শিল্পী যুগলের প্রশংসায় সরব। সবচেয়ে আশ্চর্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দর্শকেরা দুজনকে অভিন্ন যুগল শিল্পী বলে ধরে নিয়েই তাদের অনুষ্ঠান দেখতে লাগল।

এ হল প্রেমা আর দেবনের শিল্পী আর অর্থ সংগ্রহের অভিযান। সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতকারে তারা জানাল তাদের প্রাণ-গঙ্গার পরিকল্পনার কথা। সাগর সঙ্গমে ভারতাত্মার পূর্ণ রূপের কথা। তারা আবার আসবে তাদের সঙ্গম ব্যালে গ্রুপ নিয়ে। তাদের ধ্যানের ভারতবর্ষকে তারা রূপ দেবে নৃত্য কাহিনীর ভেতর দিয়ে।

শিল্পী সংগ্রহ করল তারা পঞ্চনদের দেশ থেকে। গঙ্গা বিধৌত উত্তর ভারত থেকে। গুজরাটের শস্যক্ষেত্রের শিল্পীরা এল তাদের দলে। মণিপুরের গোপরাস আর কর্তাল চোলম, পাঙ্গ চোলমের কৃতি শিল্পীরা তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে। শিল্পীতে শিল্পীতে ঈর্ষা নয়, অভিন্ন হৃদয়ের মিলন। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের শিল্পী সমন্বয়ে এক অখণ্ড ভারতের সংস্কৃতি-সত্তা।

যেন উত্তরের হিমবক্ষের তরঙ্গিত তুষারের ঢল কল্লোল উচ্ছ্বাসে নেমে এল দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্র লক্ষ্য করে। প্রেমার হোটেল রূপান্তরিত হল ব্যালে গ্রুপের সাময়িক আবাসে।

স্থগিত রইল ইন্দ্রের কোচিন যাত্রা। সরিতার লোক দৃষ্টির আড়ালে প্রিয় অভিসার। তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শিল্পী সঙ্ঘের পরিচর্যার ভার নিজেদের হাতে তুলে নিল।

রাতে ঘুম ভেঙে যায় প্রেমার। চিন্তার মুকুলে দেহ রোমাঞ্চিত। পাশে শুয়ে সরিতা। আজকাল দিদির সঙ্গে একই বিছানায় তার বিশ্রাম। বড় চঞ্চল হয়ে গেছে সরিতার ঘুম। প্রেমার পাশ ফেরার আওয়াজে সে জেগে উঠল।

কত রাতে শুলি। এখুনি ঘুম ভেঙে গেল তোর ! কি করে ভোরে নাচের রিহার্সেল দিবি বল ?

জোরে একটা শ্বাস ফেলে প্রেমা বলল, ঘুম আসছে না সরিতা। বার বার মনে হচ্ছে এতবড় একটা কাজ পণ্ড না হয়ে যায়।

তা কেন হবে। দেবন আর তুই দেখছিস নাচের দিক। আর আমরা দুজন ম্যানেজমেণ্টের দিকটা। বেশ তো এগিয়ে চলেছে। এখন এমন নার্ভাস হয়ে পড়লে চলে।

প্রেমা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এক সময় বলল, সরিতা, আমার বুকের ভেতরটা একবার হাত দিয়ে দেখ। কেমন দ্রুত ওঠা-পড়া করছে।

কেন তুই আবার এমন করছিস বলতো ?

প্রেমা বলল, শোন, দেবনের জন্যে বড় ভাবনায় পড়েছি।

কেন, কি হল তার ?

দেবনের ধ্যান ভাঙাবার জন্যে তরুণী শিল্পীরা একযোগে যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

তাই বুঝি ! কিন্তু দেবনকে কাছে থেকে দিনের পর দিন দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে, দেবন অপরাজেয়।

প্রেমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হয়ত তাই। কিন্তু···।

কিন্তুটা আবার এলো কোত্থেকে ?

সেদিন দেখলাম ওর গলায় কাগজের ফুল দিয়ে তৈরী একটা মালা।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় পেলে ?

ও অমনি দারুণ খুশীর বান তুলে বলল, সুদর্শনা দিয়েছে।

বললাম, সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে।

শিশুর মত সরল হাসিতে ভরে উঠল ওর মুখ। আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ওর রুমের ভেতর। বাক্স খুলে বের করল একটা ধুতি উত্তরীয় আর মাথার পাগড়ী। বলল, এও সুদর্শনা দিয়েছে।

বললাম, বড় ছিমছাম সুন্দর পোশাক। কিন্তু উপলক্ষটা কি দেবন ?

মনে হল দেবন লজ্জা পেয়েছে। এক সময় ও বলল, ডিসেম্বর আমার জন্ম মাস। সেদিন কোভালম বীচে বেড়াবার সময় ওরা কথায় কথায় জেনে নিয়েছিল। তাই সুদর্শনা এগুলো দিয়েছে। অবশ্য জন্মতিথি আমার তিরুআদিরা, এখনও সে তিথি আসে নি।

হেসে বললাম, এ পোশাকগুলো পরে তুমি আবার না মণিপুরী হয়ে যাও।

দেবন বলল, কর্তালচোলমে সেদিন আমি অংশ নিয়েছিলাম, এই পোশাক পরে। ভ্রমরের মত ঘুরে ঘুরে যখন নাচ হচ্ছিল তখন সুদর্শনারা খুব হাততালি দিলে।

নীলকণ্ঠ শর্মা বলল, আশ্চর্য ! তুমি এমন তাল লয় রেখে নাচলে কি করে ?

বিশ্বাস কর বহু বছরের সাধনা না হলে এমন ময়ূর খঞ্জন পদক্ষেপ আর দেহ-ভঙ্গীমায় নাচা সম্ভব নয়।

আমি বললাম, তোমরা আমাকে যে নাচের পোশাক পরিয়ে দেবে কয়েক বার দেখেই আমি অবিকল ঐ নাচ নেচে যাব।

আমি তখন দেবনকে বললাম, তুমি তো কোনদিন আমাকে তোমার জন্ম দিনের কথা বল নি।

দেবন আবার লজ্জা পেল। বলল, আমি কি ক্ষণজন্মা পুরুষ যে সবাই আমার জন্মদিনের কথা জানবে।

সুদর্শনাদের সৌভাগ্য তারা তোমার জন্মদিনের খবর পেয়েছে। মনে হচ্ছে সুদূর মণিপুর থেকে তারা এসেছে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে।

অমনি দেবন কি বলল জানিস? বলল, ওরা বড় ভাল তাই না প্রেমা?

বললাম, কতটা ভাল জানি না, তবে আমার চেয়ে যে ভাল তা বলতে পারি।

ততক্ষণে ও বুঝল, এটা আমার অভিমানের কথা।

ও আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কারু তুলনা অন্তত আমি করতে যাব না প্রেমা। তোমাকে যারা চেনে না তারা যা খুশী তাই করুক।

এতবড় কমপ্লিমেণ্টের যোগ্য আমি নই দেবন।

নিজের যোগ্যতা বিচারের ভার নিজের হাতে নাই বা তুলে নিলে। ওটা থাক না আমাদের হাতে।

আমি ও প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম সেদিন।

সরিতা বলল, কিন্তু এতে দেবনের ধ্যান ভাঙার কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে কি?

হয়ত নয় সরিতা তবে রিহার্সেলের শেষে মেয়েরা ওকে বাঁচে ধরে নিয়ে গেলে ও বেশ খুশী হয়েই ওদের সঙ্গে চলে যায়।

সরিতা বলল, এটা তোর ঔদার্যের অভাব। অনেক দূর জায়গা থেকে সবাই এসেছে। ওরা একজন তরুণ গুণী শিল্পীর সঙ্গ যদি চায় কিছুক্ষণ তাতে অন্যায়ের কি আছে।

প্রেমা আত্মমগ্ন গলায় বলল, আমি দিন দিন মনের দিক থেকে বড় ছোট হয়ে যাচ্ছি, তাই না রে! আমি তো কোনদিন এমন ছিলাম না।

সরিতা বলল, লক্ষণটা শুভ। দেবনই এনে দিয়েছে তোর মনে ঈর্ষার বীজ। ঈর্ষা নইলে ভালবাসায় জোয়ার জাগবে কি করে।

প্রেমা এবার হাসল। বলল, এরই ভেতর এত অভিজ্ঞতার আগুন হয়ে বসে আছিস!

তা কিছু কিছু হয়েছে বই কি। সে যাক। কিন্তু তুই ও তো যেতে পারিস দেবনের সঙ্গে বীচে বেড়াতে। সবার থেকে তুই আলাদা হয়ে থাকিস কেন।

সবাই যা পারে আমি তা পারি না সরিতা। তুই কোনদিন আমাকে দেখেছিস দল বেঁধে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াতে? মনের ভেতর আমার একটা নিঃসঙ্গ জগৎ আছে। সেখানে আমি একা থাকতেই ভালবাসি। মনের মত কোন মানুষ পেলে কেবল তাকেই সেখানে ডেকে নি। আমার সবকিছু উজাড় করে দেওয়া শুধু তার কাছেই।

সরিতা বলল, দেবনকে তেমন করে ডাকলে সাধ্য কি তার তোকে উপেক্ষা করে।

প্রেমা জানালার বাইরে চোখ রেখে কি যেন ভাবল। এক সময় বলল, শুধু আমাকে এগিয়ে যেতে হবে সরিতা আর কেউ এগিয়ে আসবে না আমার দিকে?

সরিতা এর কোন জবাব দিল না। প্রেমাকে সে জানে। চিরদিনই একা থাকতে প্রেমা ভালবাসে। তার গুণগ্রাহীর সংখ্যা যত বেশী বন্ধুর সংখ্যা তত কম। একটুখানি হুল্লোড়ের মাঝখানে পড়ে গেলেই সে হাঁফিয়ে ওঠে। নাচের ভেতর সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। একা থাকলে আপন মনে অনেকখানি সময় সে নাচের মুদ্রাগুলো অনুশীলন করে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জনতার মাঝখানে তাকে কেমন যেন দিশেহারার মত দেখায়। প্রেমা যথার্থই নির্জনতা ভালবাসে। তার নির্জন জগতে একান্ত মনের মানুষ ছাড়া আর কারু আমন্ত্রণ নেই। প্রেমার চরিত্রের এসব খবর সরিতার অজানা নয়। সে আরও জানে, প্রেমার দেহ সম্বন্ধে কোন সামাজিক সংস্কার নেই। তার ভাল লাগার মানুষের কাছে সে বিনা বিচারে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে লীলা তার ক্ষণিকের। দেহসুখের পরেও যে বৃহৎ একটা আনন্দের আশ্রয় আছে সেখানে তার নিত্য বিহার। তাই মানসিক বিকারের শিকার তাকে কোনদিনই হতে হয় নি।

সরিতা বলল, দুজনেই তোরা শিল্পী। তোদের মিলন তো সহজ হবার কথাই রে। আর্টের খাতিরে দুজনকেই তো এগিয়ে আসতে হবে। সেদিন রিহার্সেল রুমে দেবন আর তুই যখন মোহিনী আর শংকরের নাচ নাচতে নাচতে

এক দেহ হয়ে গেলি তখন কে বলবে তোরা স্বামী স্ত্রী নয়। দেবনের মুখে চোখে সে কি উগ্র কামনার ছবি। কাউকে পাবার জন্যে উতলা না হলে তো এমন ছবি ফোটে না।

প্রেমার চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো হাসি। বলল দেবন ফিনিশড আর্টিস্ট। সে মোহিনী মায়ায় বদ্ধ কামনায় কাতর শিবের ভূমিকা নিয়েছে। সুতরাং সে তখন দেবন নয়, কামার্ত শঙ্কর। আবার যখন নাচে সম পড়ল আর দেবন ঢুকল গ্রীণরুমে তখন তার অন্য চেহারা। অবুঝ শিশুর মত একটা হাসি মুখে লেগে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখে কৌতূহলী একটি কিশোরের মত বলে উঠল, যারা সব দেখেছিল বসে বসে তাদের রিমার্কগুলো জানতে পারলে?

বললাম, দর্শকের রিমার্ক জানবার আগে তোমার নিজের পারফরমেন্স সম্বন্ধে ধারণা কি তাই বল?

ও বলল আমি তো সাধ্যমত মহাদেবের ভূমিকাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

বললাম, ব্যস ওতেই সাকসেস। আমরা নিজেরা তুষ্ট হলেই হল।

আমার ঐ কথাতে দেবন একটা শিশুর মত খুশী হয়ে উঠল। চোখে তার ভালবাসার কোন ছবিই ফুটল না।

এখন ভেবে দেখ সরিতা দেবনের কামনা কাতর চোখ এই মুহূর্তে যে ছবি ফোটায় পরমুহূর্তে তার কোন চিহ্নই আর থাকে না। এ যেন অন্য চোখ ভিন্ন দৃষ্টি। আগের চোখ দুটি যেন দেবন রেখে এসেছে নৃত্য মঞ্চের কোন এক কোণায়।

সবিতা হাসি হাসি মুখ করে বলল, উত্তাপের ছোঁয়া পায় নি কোনদিন। তাপ লাগলেই ওর তুষার তপস্যা গলে ঝরে প্রবল বন্যার আকার নেবে।

প্রেমা কথায় ছেদ টেনে বলল, ঐ আশাতেই থাক। ওর ওপর জীবনের ভার রাখা আর জলের ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা একই কথা।

সামনে আসছে তিরু আদিরা। শ্রীসম্পদদায়িনী আদ্রা তিথি। ধনু মাস। পৌষের পূর্ণিমায় মহাদেবের জন্ম লগ্ন। পার্বতীর নিরম্বু উপবাস। পবিত্র পুণ্য মাস।

ঐ উৎসব শেষ হলেই 'সঙ্গম' গ্রুপের শুরু হবে ভারত পরিক্রমা। এই কটি দিনের অপেক্ষা।

গ্রুপের সবাই গেছে কন্যাকুমারী দেখতে। ট্রি-সী লজের দুটো ফ্লোর বুক করা হয়েছে দুদিনের জন্যে। ওখান থেকে ফিরে এলে প্রেস শো হবে প্যালেস হোটেলের অডিটোরিয়ামে।

এখন সান-অ্যাণ্ড-সী হোটেল শূন্য। এ সিজিন-এ কোন ট্যুরিস্টকেই হোটেলে স্থান দেওয়া যায় নি।

উজ্জ্বল ডিসেম্বরের দুপুর। চারদিকে সবুজের সমারোহ। ওনাম শস্যের ঋতু। তিরু আদিরাতেও ফসলের দ্বিতীয় সমারোহ। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী কেরালার ঋতুপর্বে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাল। ঝকঝকে রোদ্দুর, প্রকৃতির সবুজ। রাতের ঈষৎ আমেজী শীতলতা।

প্রেমা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সরিতা আর ইন্দ্র এ দুদিন একটুখানি শ্বাস নেবার জন্যে গাড়ী নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়েছে।

প্রেমার এই ডিসেম্বরের দুপুরটা বড ভাল লাগছে। সে গাড়ী নেয় নি। ঘর থেকে হোটেলের পথটুকু দেখতে দেখতে যাবে সে। কতদিন পায়ে হেঁটে একটু বেড়িয়ে বেড়ান হয় নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে এসে দাঁড়াল খামার বাড়ীর সামনে। কটি মজুরণী কাজ করছে। সম্ভবত কোন একটা ফসল ঝাড়াইএর কাজ। কাঞ্জির সঙ্গে মুরে মিশিয়ে খাচ্ছে ওদেরই কটি ছেলেমেয়ে। পান্তা আর ঘোল খেতে পেলে ওরা আর কিছু চায় না। দিনে ক'বার ধরেই চুক চুক করে খায়। পাশে পাতা ঢাকা চারুয়ম খুলে মা কিছুটা কাঞ্জি তুলে দিল ছোট ছেলেটির পাত্রে। ওরা সারাদিন কাজ করছে। কতটুকুই বা দিনমজুরী পায় তবু ছেলেমেয়ে নিয়ে এই কর্মব্যস্ত দুপুরে ওরা কত সুখী।

প্রেমা সেখান থেকে পা চালিয়ে এসে পড়ল বড় রাস্তায়। রাস্তা বড় কিন্তু মানুষজন বড একটা নেই। এই দুপুরে হয় অফিস ঘরে নয় তো ক্ষেত খামারের কাজের ভেতর রয়েছে ওরা।

বাঁদিকে কায়েলের জল চকচক করে উঠল। সূর্যের কিরণগুলো জলের ওপর রূপোলী মাছের মত ঝলকাচ্ছে। মাথায় বিশাল টুপি পরে ছোট্ট এক ডিঙিতে কডুম্বু ভাল্লমে চেপে মাছের আশায় কায়েল চুড়ছে এক তোপিকোড়া।

প্রেমা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কি আশ্চর্য ব্যালেন্স ওদের। ডোঙার কানায় কানায় জল। একটু নড়াচড়া করলেই ডোঙাটা নির্ঘাত ডুবে যাবে কায়েলের থৈ থৈ জলে। কিন্তু ওরই ভেতর নিখুঁত ভারসাম্য রেখে লোকটি প্রয়োজনের কাজটুকু সেরে নিচ্ছে।

প্রেমার মনে হল, সে যখন বাম চরণ দক্ষিণ জানুর ওপর তুলে এক পায়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তখন এমনি অনায়াস দক্ষতার ভাবটি নিজের ভেতর আনা দরকার।

তারপর মনে হল জীবনের জটিল সমস্যা আর ঝুঁকির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমনি স্থির হয়ে থাকতে পারলে সব সমস্যাই সহজ হয়ে আসে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে প্রেমার মনে হল সে অনেকখানি মুক্ত, অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে।

আবার চলতে লাগল প্রেমা পথের ওপর দিয়ে। পাশের নারকেল বাগানে ঠক ঠক করে কটা গুটি ঝরে পড়ল। এই অকিঞ্চিৎকর শব্দটুকুও কান থেকে এড়িয়ে গেল না প্রেমার। চেল্লিতে ডাবের গুটি কুরে কুরে কেটে ফেলছে। ভোমরার মত উড়ে এসে নিঃশব্দে তাদের ধ্বংসের কাজ করে চলেছে।

জীবনের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দেহ সংশয় চেল্লি কীটের মত মনের ভেতর এসে পড়ে। তারপর অলক্ষ্যে কুরে কুরে বুকখানাকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে চলে যায়। কত সবুজ সুন্দর ভাবনা ছোট নারকেলের গুটির মতই পুষ্ট হবার আগে খসে ঝরে যায়।

একটা আশ্রমের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। সবুজ নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে ওর কলসাকৃতি মগুড়ম পানপাতার মত শীর্ষ নিয়ে পবিত্র এক ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে। একটি মেয়ে মাথায় পীচিপুর সাদা মালা পরে তেপ্পা তপ্পমের ভেতর দিয়ে ঐ মন্দিরের দিকেই চলেছে। প্রেমা অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। যতক্ষণ না মেয়েটি ঘন নারকেল গাছের বনে অদৃশ্য হল ততক্ষণ ও চোখ ফেরাতে পারল না। ও এখন চলতে চলতে ভাবতে লাগল মেয়েটির কথা। প্রিয় কোন মানুষের স্বপ্ন বুকে ভরে নিয়ে ও হয়ত দেবতার কাছে তার মনের প্রার্থনা জানাতে চলেছে।

প্রেমা ঐ মেয়েটির ইচ্ছা পুরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানাল।

ও যখন হোটেলে এসে পৌছল তখন একমাত্র পাহারাদার সুগদন বাইরে বসে। প্রেমাকে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। প্রেমা খোঁজ নিয়ে জানল দেবন ঐ নারকেল বাগানের পথ ধরে সী বীচের দিকে গেছে।

প্রেমা এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। নারকেল বাগানের ভেতর এদিক ওদিক কতকগুলো বেতের চেয়ার সাজান আছে। হোটেল থেকে এই ব্যবস্থা করে রেখেছে ইন্দ্র। যে সব টুরিস্ট হোটেলে আসবে তারা যাতে নির্জন

ছায়াচ্ছন্ন নারকেল কুঞ্জে সঙ্গিনীদের নিয়ে সমুদ্র উপভোগ করতে পারে তারই ব্যবস্থা।

দূর থেকে প্রেমা দেখল দেবন বসে আছে একখানা সাদা রঙের চেয়ারে, পা এলিয়ে। পেছন থেকে ওর এক রাশ চুলই কেবল চোখে পড়ছে। কাঁধটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘ স্কন্ধ দেবন। চুলগুলো কাঁধে এসে যখন পড়ে তখন প্রেমার কেন জানি না ওর চুল নিয়ে খেলা করতে ভারী ইচ্ছে করে।

প্রেমা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দেবনের কাছাকাছি। মনে হল দেবন কোন কিছু ভাবনায় ডুবে আছে। ভারী রাগ হয় প্রেমার ওকে ভাবনার ভেতর তলিয়ে যেতে দেখলে। সারা ভারত ঘুরে ওর যখন শিল্পী সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিল তখনও দেবনের ঐ একই রূপ। কত নিভৃত অবসরে প্রেমা প্রত্যাশা করেছে তার সতীর্থের কাছ থেকে উত্তপ্ত আহ্বান পেতে, কিন্তু সেই একই মগ্নতা। শিল্পী অথবা শিল্পের কথা নিয়ে বিভোর দেবন। সে যেন এই মাটির পৃথিবীর মানুষই নয়। প্রেমের দেবতা শুধু কি ওকে রূপই দিয়েছেন. একটু প্রাণ দেন নি। যে প্রাণ চঞ্চল হয় ফাল্গুন দিনের নতুন পাতার মত। রঙীন হয় বসন্ত দিনের বনভূমির মত। যে প্রাণ জোয়ারের স্রোতের মত ভাসিয়ে ডুবিয়ে দেয় দুই তীর।

অনেক সময় মনে হয়েছে দেবন চেতনাহীন কোন মূর্তির মত। ওকে দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু জীবনের সঙ্গে জড়াবার কথা ভাবাই যায় না। তবু সরে আসতে পারছে কই প্রেমা দেবনের কাছ থেকে। এমন অবহেলা বলেই কি এত আকর্ষণ।

প্রেমা একেবারে কাছে এসে দেখল দেবন ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকের ওপর দুটি হাত আড়াআড়ি পড়ে। নারকেল গাছের দীর্ঘ পাতাগুলো ছায়া ফেলেছে দেবনের মুখে। একফালি আলো একফালি ছায়া। যেন শিল্পীকে নাচ দেখাচ্ছে দ্বিপ্রহরের নির্জন প্রকৃতি। চোখ বন্ধ করে তদ্গত হয়ে দেবন সেই নাচ মনের গভীরে রূপালী পর্দায় দেখছে।

সমুদ্রে এখন হাওয়ার দস্যুতা নেই। ঢেউগুলো চুপি চুপি গোপনচারিণী অভিসারিকার মত চুম্বন এঁকে দিয়ে যাচ্ছে সোনালী বেলাভূমিতে।

দেবনের কাছে নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে বসল প্রেমা। তার মনে হল দেবন যেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি। আর সে এসেছে পার্বতীর মত তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করতে।

সমুদ্র থেকে হঠাৎ বয়ে এল এক ঝলক হাওয়া। নারকেলের ডাল পাতা কাঁপিয়ে একটা শব্দ সৃষ্টি করে সে হাওয়া বয়ে চলে গেল। দেবনের বুক আর মুখের ওপর পড়ে থাকা লম্বা লম্বা ছায়ার তারগুলো হঠাৎ যেন প্রাণ পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল আড়াল থেকে প্রেমের যাদুকর পুষ্পধনু তীর ছুঁড়েছে দেবনকে লক্ষ্য করে।

সত্যি ঘুম ভেঙে গেল দেবনের। সে চমকে সোজা হয়ে চেয়ারে উঠে বসতে গিয়ে প্রেমাকে পাশে দেখতে পেল।

কখন এলে প্রেমা? আরে আরে মাটিতে বসে যে।

দেবন চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত ধরে তুলল প্রেমার। তখন জ্যোৎস্নার মত একটা মূর্ছা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে প্রেমার চৈতন্য।

দেবন প্রেমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসিয়ে দিল পাশের চেয়ারে। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, খারাপ বোধ করছ প্রেমা?

প্রেমা শুধু মাথা নাড়ল। কোন কথা না বলে স্থির চোখে চেয়ে রইল সমুদ্রের ঢেউগুলোর দিকে।

দেবন জানে প্রেমার এই ধরনের ভাবান্তরের মুহূর্তগুলোতে কথা বলা নিরর্থক। সারা ভারত ভ্রমণের সময় বেশ কয়েকবারই সে প্রেমার এরকম মানসিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে।

চুপচাপ বসে রইল দুজন পাশাপাশি। এখন আবার হাওয়ার খেলা শুরু হয়েছে সমুদ্রে। ঢেউগুলো আবেগে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। প্রেমার শ্যাম্পু করা চুলগুলো তার কপাল আর গালের ওপর নাচের খেলা শুরু করে দিয়েছে। সেদিকে খেয়াল নেই প্রেমার। সে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু দৃষ্টি তার সেখানে নেই। সে তার বুকের বেলাভূমিতে দেখছে একটা ছবি। দেবন ঢেউ-এর মত দুটো বাহু দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে তার বুকের তটভূমি লক্ষ্য করে।

এখন কেমন বোধ করছ প্রেমা?

চমকে চূর্ণ চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে প্রেমা বলল, ভাল। খু-উ-ব ভাল।

তুমি ভীষণ রকম মুডি প্রেমা। নিজের ভেতর যখন থাক নাগাল পাওয়া যায় না।

হেসে তাকাল প্রেমা দেবনের মুখের দিকে। বলল, কোনদিন আমার মনের খোঁজ নিতে এসেছ কি দেবন?

আবার দেবনের সারা মুখে সেই অসহায় অবুঝ ছবির রেখা পড়ল। সে শুধু মৃদু হাসল। কোন উত্তর দিতে পারল না।

প্রেমা এবার কথান্তরে গেল।

তুমি তো ওদের সঙ্গে গেলে পারতে দেবন। এখানে একা একা থাকার কোন মানেই হয় না।

দেবন যেন ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, একা একা কেন, তুমি তো রয়েছ।

মনে মনে হাসল প্রেমা। দেবনের হাতখানা টেনে নিয়ে বলল, পরীক্ষা করে দেখত প্রেমা নামের মেয়েটি তোমার কাছে আছে কিনা।

দেবন প্রেমার হাতখানা ধরে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। বলল, একেবারে বিশ্বকর্মা শিল্পীর হাতখানা গড়ে তোমার শরীরে যেন বসিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য তোমার আঙুলের গড়ন।

প্রেমা খুশী হল, দেবনের মুখে তার দেহ-সৌন্দর্যের কথা শুনে। কিন্তু হতাশ হল তার মনের কথাটা বুঝল না বলে।

প্রেমা বলল, যে কোন পুরুষ তোমার ঐ আকৃতি পেলে বিশ্বজয় করতে পারে।

দেবন বলল, সবাই বলে আমার দাদুর শরীরের সঙ্গে নাকি আমার অদ্ভুত সাদৃশ্য। সেদিন তোমার মত রোশেনারাও ঐ কথা বলেছিল।

প্রেমা দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল মনে মনে। কথকশিল্পী রোশেনারারও চোখ পড়েছে দেবনের ওপর।

মুখে শুধু বলল, যারা সুন্দর সব মেয়েই তাদের পূজারী হয়।

দেবন সঙ্গে সঙ্গে বলল, মেয়েরাও তোমার মত রূপ পেলে ছেলেরা তাদের জন্যে পাগল হয়।

প্রেমা অমনি বলে উঠল, তারও ব্যতিক্রম আছে।

কি রকম?

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। তুমি কি কোনোদিন কোন আকর্ষণ বোধ করেছ কারু জন্যে?

দেবন আজ নিবিড় চোখে তাকাল প্রেমার মুখের দিকে। বলল, বাস্তব জগতের অনেক আইনকানুনই আমার অজানা প্রেমা, কিন্তু তা বলে আমার নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাব হয়ত এতটা নির্বোধ আমি নই।

প্রেমা বলল, তুমি অহংকারী দেবন। সীমা মেনে চলা তোমার একটা ছলনা।

সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখাতে যদি কোন দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় তাহলে আমি দাম্ভিক। আর সীমা মেনে জীবনের পথে চলার নাম যদি ছলনা হয় তাহলে আমি নিঃসন্দেহে কপট।

প্রেমা সহজ হল। দেবনের হাতখানাতে নাড়া দিয়ে বলল, তোমাকে আজ বড চঞ্চল করে তুলছি না? তোমার মুখে ক্ষোভের ছায়াতো কোনদিন দেখিনি তাই একটু দেখতে ইচ্ছে হল বলে এত কথা বললাম।

দেবন বলল, কিছু মনে কর না, একটা সত্য আমাকে বলতে দাও। আমি তোমাদের মত সম্পন্ন পরিবারের ছেলে নই। কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষা-দীক্ষাও নেই আমার। ছেলেবেলা থেকে শুধু একটা শিল্পকে আঁকড়ে ধরে সান্ত্বনা পেয়েছি মনে মনে। তাই বিশ্বাস কর সব ভুলে আমি আমার শিল্পের ধ্যানেই সময় কাটাতে শিখেছি। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সান্ত্বনা বল আর সঙ্গীই বল এই নাচটুকু।

প্রেমা এবারও আর গভীর কোন আলোচনার দিকে গেল না। সে হঠাৎ আলোচনায় ছেদ টেনে দিয়ে বলল, তুমি আমার বন্ধু দেবন, ব্যস। এর চেয়ে বড় পরিচয় তোমার আর কিছু নেই।

দেবন বলল, তোমাদের স্বীকৃতিতেই আমার সান্ত্বনা। ভাবব আমার বন্ধুভাগ্য ভাল।

প্রেমা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে এল।

বোশেনারার পারফরমেন্স তোমার কেমন লাগছে?

ওর পায়ের কাজ দর্শকদের চোখকে টেনে রাখবে। তাছাডা মোগল কসটিউমে ওর চক্করগুলো দেখবার মত।

অনসূয়া পাণিগ্রাহীর ওডিষি?

দেবন বলল, করীহস্তকরণ মুদ্রায় ও যখন সম্বলপুরী লাল শাড়ীতে সেজে রূপোর ঝকঝকে অলংকার পরে দাঁড়ায় তখন ওকে কল্পনার উর্বশী বলে মনে হয়। পদ্ম মুদ্রায় যখন হাতের আঙুল পদ্মের পাপড়ির মত গোল করে মেলে ধরে ঈষৎ হেসে স্থির দৃষ্টিতে তাকায় আর আলোর রশ্মিটা এসে পড়ে মুখের ওপর, তখন মনে হয় সূর্যের ছোঁয়ায় সারা মুখখানা ওর পদ্ম হয়ে গেছে।

আর সুদর্শনার মণিপুরী?

ওর স্থানক মুভমেণ্টের অনায়াস কাজগুলো দেখার মত। শাড়ীর ওপর স্বচ্ছ সাদা উত্তরীয়খানা কোমরে জড়িয়ে চোলির ওপর লাল সাদা ফুলের মালাটি ঝুলিয়ে যখন চলতে থাকে, তখন শ্রীরাধার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে হয়।

ঐ সুন্দর মালাটিই তো তোমাকে উপহার দিয়েছে সুদর্শনা, তাই না?

দেবন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমার হাত ধরে বলল, এস আমার সঙ্গে।

ওরা এক সময় এসে ঢুকল দেবনের ঘরের ভেতর। নির্জন হোটেল। ততোধিক নির্জন ঘরখানা। দূরের সমুদ্র দেখার জন্যে একটি জানালা খোলা। শেষ বেলার সোনালী উত্তরীয় কাঁপছে সামনের নারকেল পাতার ঝালরে।

দেবনের উদ্দেশ্য প্রেমার অজানা। একটা কৌতূহল কাঁপছে তার চোখের তারায়।

দেবন বাকস খুলে সুদর্শনার দেওয়া মালাখানা বের করে প্রেমার দিকে তুলে ধরে বলল, নাও এ মালা। এতে আমার কোন প্রয়োজনই নেই।

প্রেমা বলল, আমি কারু উচ্ছিষ্ট নেওয়াতে অভ্যস্ত নই দেবন।

এখন এ মালা আমার। একে খুশীমত বিলিয়ে দেবার অধিকারও আমার।

প্রেমার এই মুহূর্তে দারুণ আঘাত দিতে ইচ্ছে করল দেবনকে। কিন্তু পরমুহূর্তে সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, প্রাণের থেকে যে পুরস্কার দেবে সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পাওয়া। যদি কোনদিন সে পুরস্কার জোটে তাহলে কেবল সেদিনই আমি তোমার সে পুরস্কার অনেক আদরে অনেক মান দিয়ে বুকে তুলে রাখব দেবন।

দেবনের চোখের দৃষ্টি নত হল। সুদর্শনার দেওয়া মালাটা সে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিতে প্রেমা এগিয়ে গিয়ে সে মালা কুড়িয়ে এনে দেবনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, একটা হৃদয়কে তুমি এভাবে উপেক্ষা করতে পার না দেবন। সে তোমার জন্মদিনকে স্মরণ করে এ ভালবাসার উপহারটুকু দিয়েছে।

দেবন অভিভূতের মত সে মালা আবার হাতে তুলে নিল।

প্রেমা বলল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে আজ দেবন? বলতে পার দারুণ এক খেয়ালীর দাবী।

বল।

সেদিন তুমি মণিপুরী পোশাক পরে নেচেছিলে। আমি তোমার সে বেশ দেখিনি। একবার সুদর্শনার দেওয়া সেই ধুতি উত্তরীয় পরে আসবে আমার ঘরে?

দেবন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। একসময় বলল, বেশ যাও তোমার ঘরে, আমি এখুনি আসছি।

হোটেলে প্রেমার জন্যে নির্দিষ্ট একখানা ঘর। ঘরখানা বেশ বড়। বার্মা

টিকের পালিশ করা বড় গোল একটা টেবিলের চারদিকে ক'খানা লাল গদী আঁটা সুদৃশ্য চেয়ার। এই টেবিল ঘিরে বসে গুণী শিল্পীরা প্রতিদিন তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনায় মাতে। ছোটখাট নানা রকম পরিবর্তন ও সংযোজন এই ঘরে বসেই স্থির হয়। প্রেমা যে এই গ্রুপের শুধু পরিচালিকাই নয় মধ্যমণি সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু প্রেমা সব কাজেই দেবনকে সামনে এগিয়ে দেয়। কোন বিষয়ে মতামত যাচাই-এর সময় দেবনের মতই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয় প্রেমা। নিজের কিছু পরিকল্পনা থাকলে আগেই আলোচনা করে রাখে দেবনের সঙ্গে। কিন্তু সবার মুখোমুখি বসে নিজের মত জাহিরের চেষ্টা করে না সে।

ঘরে এসে ঢুকল প্রেমা। ঘরের কোণে পড়ে থাকা একখানা চেয়ারে বসল সে। থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে দরজার দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল।

প্রেমা যেন প্রেক্ষামঞ্চের এক নিবিষ্ট দর্শক। প্রতীক্ষা করে আছে শ্রেষ্ঠ কোন শিল্পীর আগমনের।

ঘরে এসে ঢুকল দেবন। পলক পড়ছে না প্রেমার চোখে। অনাবৃত ঊর্ধ্ব অঙ্গ। একখানা সুন্দর মণিপুরী কাজকরা সাদা স্বচ্ছ উত্তরীয় বুকের দুই প্রান্ত দিয়ে প্রপাতের মত নেমে গেছে জানু পর্যন্ত। পরণে তেমান শুভ্র ধুতি। হাতে ঝুলছে মালা।

চেয়ার থেকে উঠে এল প্রেমা। দেবনের পাশে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ দেখল তাকে। একসময় দেবনের হাত থেকে মালাটা নিয়ে বলল, এটা হাতের অলংকার নয় দেবন, গলায় দোলাবার জন্যে তৈরী।

মালাটা দেবনের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, সুদর্শনা থাকলে সেই তোমার ত্রুটিটুকু শুধরে দিত কিন্তু সে যখন নেই তখন শিল্পের খাতিরে তার হয়ে এ কাজটুকু আমাকেই করতে হল।

দেবন প্রেমার একখানা হাত নিজের দু'হাতের মুঠোয় ধরে নিয়ে বলল, তোমার অভিমান কোনদিনও ভাঙবে না প্রেমা!

সকাল থেকেই সকলে নীরবে কাজ করে চলেছে। একটা ব্যস্ততা কোভালম হোটেলের প্রতিটি ঘরে। সুদর্শনা রোশেনারা অনসূয়ার দল পায়ের নূপুরের বাঁধন পরীক্ষা করছে। শাড়ী নির্বাচন করে সাজিয়ে রাখছে পাশে পাশে। পুরুষ শিল্পীরা মালাগুলো গেঁথে নিচ্ছে। মুল্লি কোন্নায়মে সূচের স্টিচ দিয়ে বাঁধন শক্ত করে তুলছে। কেউবা আয়রণ করে নিচ্ছে ধুতি উত্তরীয় পাগড়ী।

আজ প্যালেস হোটেলে প্রেস শো। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথির সামনে

'সঙ্গম' ব্যালে গ্রুপ তাদের ভারত পরিক্রমার আগে নাচ পরিবেশন করবে। বিখ্যাত পত্রপত্রিকার কলাসম্পাদকেরা থাকবেন উপস্থিত।

মিঃ পিল্লাই-এর ব্যস্ততার শেষ নেই। তিনি এইমাত্র প্রেমার ঘর থেকে দ্রুত পায়ে কি একটা জরুরী কাজ সেরে বেরিয়ে গেলেন।

সরিতা ইন্দ্রের কাছে এসে বলল, নিউজ এডিটার রিপোর্টার মিলে প্রায় তিরিশজনের লাইট রিফ্রেশমেণ্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইন্দ্র স্টেজের ভেতরের ডেকরেশান সম্বন্ধে দুটি লোককে নির্দেশ দিচ্ছিল। সরিতার কথায় পেছন ফিরে বলল, আরও কয়েকটা বাড়তি প্লেট রেখে দাও।

কেন? অন্য কোন নিমন্ত্রিতের জন্যে তো কফি ছাড়া আর কিছু রাখা হবে না ঠিক হল।

ইন্দ্র লোক দুটিকে শেষ দু চারটে কথা বলতে তারা কাজ বুঝে নিয়ে চলে গেল।

ইন্দ্র সরিতার কথার উত্তরে বলল, কটি বিদেশী ট্যুরিস্ট এসেছেন। তাদের ভেতর নাকি লেখক শিল্পী সাংবাদিক রয়েছেন কয়েকজন। এসেছেন ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। প্যালেস হোটেলের ম্যানেজার জানিয়েছেন ওঁদের অডিটোরিয়ামে নাচ দেখার জন্যে ইনভাইট করলে ভাল হয়।

আমি দুখানা কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই বলছিলাম আরও খান কয়েক প্লেটের ব্যবস্থা রাখ।

সরিতা চলে যেতে যেতে দুষ্টুমি করে বলল, বিদেশিনী কজন?

ইন্দ্র অমনি বলল, একমাত্র সরিতা মেনন।

একটা কিল বাতাসে ঠুকতে ঠুকতে অদৃশ্য হয়ে গেল সরিতা।

প্রেমা এসে ঢুকল দেবনের ঘরে। হাতে একখানা কাগজ। কোন সীনে কোন আর্টিস্ট মঞ্চে আসবে তারই তালিকা। একবার দেবনকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবার ইচ্ছে। ভুলচুক থেকে যেতে পারে।

দ্রুত পায়ে এসেছিল প্রেমা কিন্তু থমকে থেমে দাঁড়াতে হল।

দেবন ধূপদীপ জেলে পুজার আসনে স্থির হয়ে বসে আছে। সামনে মহাদেবের ছোট্ট একটি মূর্তি।

হঠাৎ প্রেমার মনে পড়ল, আজ 'তিরু আদিরা'। মহাদেবের জন্মদিন। পার্বতীর উপবাস। সারা কেরালার সীমন্তিনী মেয়েরা আজ স্বামীর কল্যাণে উপবাস করবে। কুমারী বিবাহিত সবাই আজ মাঝ রাতে সমবেত হবে মন্দির সংলগ্ন পুষ্করিণীর সোপানে সোপানে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে। সারা

রাত হস্তভাড়নার বিচিত্র এক ধরনের শব্দ তুলবে তারা। ভোরের আগেই উঠে আসবে জল থেকে। শুভ্রবস্ত্রে দেহ আবৃত করে তারা চোখের পাতায় দেবে অঞ্জনের প্রলেপ। কপালে আঁকবে তিলক। চুলে দেবে সুগন্ধী ফুলের মালা জড়িয়ে। নববধূরা খোঁপায় দেবে দশপুষ্পম। প্রেমের দেবতা মদনের গান গাইবে মেয়েরা সমবেত গলায়। তাম্বুলের রঙে রাঙা করবে সুচারু ঠোঁট দুটি। ঘরে ঘরে বাঁধা হবে সজ্জিত দোলনা। ওনজালে দোল খেতে খেতে স্পর্শ করবে তারা পৃথিবীর মাটি আর শূন্যলোক। মনে হবে শূন্য থেকে দেবপরীরা একবার নেমে আসছে মর্ত্যে আবার হাওয়ায় পাখা দুলিয়ে উড়ে চলেছে শূন্যলোক লক্ষ্য করে।

দেবনেরও তো আজ জন্মদিন। তাই বুঝি ও আজ বসেছে পূজার আসনে ইষ্ট দেবতার বিগ্রহ সামনে রেখে। অচঞ্চল নিবিষ্টমূর্তি।

প্রেমা পায়ে পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দেবনের ঘর থেকে। তার মনে হল আজ সেও এই পবিত্র দিনটিকে উদযাপন করবে পার্বতীর মত উপবাসী থেকে।

প্যালেস হোটেল অডিটোরিয়ামে শুরু হয়েছে নাচ। বিখ্যাত আলোকসম্পাত শিল্পী রায়ারিচ্চন আলো ফেলছেন। একটা হেভি গ্লাসের তৈরী সিঁড়ি আলোর প্রবাহে মনে হচ্ছে স্রোতস্বিনী। তার পাশে পাশে উপল ছড়ান। নীচে একটা হলুদ আলোর বৃত্তে ভগীরথরূপী দেবন তপস্যারত। রৌদ্রের মত হলুদ বসন পরিধানে। ঊর্ধ্ব অঙ্গ অনাবৃত। ঝুঁটিবদ্ধ কেশগুচ্ছ। একটি উজ্জ্বল দীপ্তিমান তপস্যা বলে মনে হচ্ছে দেবনকে। আকর্ষণীয় দেহভঙ্গী তরুণ তাপসের।

ঐকতান সংগীতের সুরে চকিত হল প্রেক্ষামঞ্চ। সুরলোক থেকে নেমে আসছেন গঙ্গা। শুভ্র বসন পরিধানে। কেশগুচ্ছের পুষ্পিত সুষমা। তরঙ্গিত বাহু। ভক্তের আহ্বানে নেমে আসছেন তরঙ্গিনী।

প্রেক্ষামঞ্চে করতালি ধ্বনি উঠল। প্রেমা মেননের দিব্য আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছে দর্শককুল।

প্রপাত থেকে যখন গঙ্গা এসে দাঁড়ালেন প্রেক্ষামঞ্চে তখন ভক্ত ভগীরথ উঠে দাঁড়াল তার আকাঙ্ক্ষিত দেবীর সামনে নমস্কার নিবেদনের ভঙ্গীতে। প্রসন্ন দেবী হাত তুলে ভক্তের প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করলেন।

শুরু হল ভগীরথের নৃত্য। এত দুঃখের পথ পরিক্রমার পরে সে আজ করবে তার অভিশপ্ত পূর্বপুরুষদের উদ্ধার। সংশয়ের মেঘছায়া সরে গেছে

মনের ওপর থেকে। এখন রোদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভগীরথের প্রসন্ন অন্তর। নৃত্যের ভেতর সেই পরমপ্রাপ্তির লীলা। তার অবয়বের আকৃতি বার বার সকৃতজ্ঞ প্রণতির রূপ ধরে নিবেদিত হচ্ছে দেবীর উদ্দেশ্যে।

কি অনায়াস দেহচালনা দেবনের। হস্তনয়ন চরণের মুদ্রাগুলি যেন দেহের শাখায় শাখায় ফুটিয়ে তুলছে নানা আকৃতির কুসুম।

নাচের মুদ্রাগুলি শেষ করে যখন তার সঙ্গে আসার জন্যে ভগীরথ আহ্বান জানাল দেবীকে একটি বাহু প্রসারিত করে তখন শুরু হল আবার করতালিধ্বনি। দেবনের অতি স্বচ্ছন্দ নৃত্যভঙ্গিমার প্রতি দর্শকদের সাদর স্বীকৃতি।

এরপর অভাবনীয় আলোর লীলা। শঙ্খমুদ্রায় হাতদুটিকে ওষ্ঠে স্থাপন করে ভগীরথ লীলাভরে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করছে। আর তার পশ্চাতে দেবী সুরধুনী চলেছেন এঁকে বেঁকে। যেদিক দিয়ে যাচ্ছেন সেইদিকে তাঁর চরণে আলোর জলরেখা সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

পরিকল্পনাটি এত দৃষ্টিসুখকর যে ভগীরথ আহ্বান করে গঙ্গাকে যখন উইংসের পাশ দিয়ে নিয়ে চলে গেল তখন দর্শককুল ফেটে পড়ল করতালিধ্বনিতে। তখনও মঞ্চের ওপর আলোয় আঁকা হয়ে আছে জলের আবর্তিত প্রবাহ।

প্রথম মঞ্চে অবতরণের পর প্রেক্ষাগৃহ থেকে যে কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে তা উৎসাহজনক।

রোশেনারা ছুটে এল দেবনের কাছে। প্রণাম করে দাঁড়াল। অপূর্ব তোমাদের নাচ। এখন আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। এর পরেই আমার স্টেজে নামার পালা।

একটু দূরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রোশেনারা আর দেবনের ছবি দেখতে পাচ্ছিল প্রেমা। স্ক্রীনের ভেতরে তবলায় বোল উঠেছে। কথক-নর্তকী প্রস্তুত। উইংসের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যবনিকা তোলার অপেক্ষায়। ছুটে গেল দেবন তার পাশে। রোশেনারার পায়ের নূপুর শক্ত করে বাঁধা হয়নি। লক্ষ্য এড়ায়নি দেবনের। নীচু হয়ে বসে সে ক্ষিপ্রহাতে বেঁধে দিল তার পায়ের নূপুর।

আর একজনের দৃষ্টি এড়াল না। দেয়ালের প্রসারিত আয়নায় কিছুক্ষণ এ ছবি ধরা রইল। তারপর ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীন উঠল। তবলা তরঙ্গের তালে তালে নূপুরের ধাতবধ্বনিও মিশে গেল। ছবি মুছল দেয়াল আয়নার ওপর থেকে কিন্তু নায়িকা প্রেমা মেননের মনের আয়না থেকে সে ছবি সহজে মিলিয়ে গেল না। সে ভারতনাট্যমের প্রসাধন নিতে ঢুকে গেল ড্রেসিংরুমে।

কে যেন ওপাশের উইংস থেকে কিছু বলতে চাইছিল তাকে কিন্তু প্রেমা দূরের অস্পষ্ট ধ্বনির মত উপেক্ষা করল সে ডাক।

মেয়েদের ড্রেসিংরুম থেকে সবাই এখন বেরিয়ে গিয়ে গ্রীনরুমে ছড়ান চেয়ারগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। প্রত্যেকের হাতে একখানা করে ছাপা প্রোগ্রাম।

প্রেমা ড্রেসিংরুমে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। দেবনের জন্যে সে উপবাস করে আছে। কেউ জানে না তার আজকের এই তিরু-স্বাদিরা ব্রতের কথা। পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম সাগরে ডুবে গেলে তবেই ব্রতভঙ্গ হবে তার।

কেন জানি না অনুষ্ঠানের সবটুকু উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে এল প্রেমার মনের ভেতর। সে গালে হাত রেখে বসে রইল আর দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার বুকের ওপর।

ধ্যান ভাঙল সরিতার ডাকে। প্রসাধনের ছলনা করে তোয়ালেতে মুখখানা মুছে নিয়ে তাকাল সরিতার দিকে।

সরিতা একখানা কার্ড প্রেমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, অসাধারণ। একেবারে অ্যাপোলো মূর্তি। গ্রীক আর্টিস্ট। নিজে এসে কার্ড দিয়ে গেল।

সরিতা দাঁড়াল না। কথাকটি বর্ষণ করেই সে যেন বিদ্যুৎ হেনে বেরিয়ে গেল।

প্রেমা দেখল সাদা কার্ডের ওপর অরেঞ্জ কালারের ফেল্ট পেন দিয়ে তারই নাচের একটা ভঙ্গীর অবিকল স্কেচ। নীচে লেখা—বিস্ময়কর অনুষ্ঠান।

সবশেষে নাম সই করেছে আর্টিস্ট—মাইরন।

কার্ডগুলো বোধহয় ছবি এঁকে বাইরে পাঠানোর জন্যে তৈরী। কার্ডের কোণে ঠিকানা লেখা প্যালেস হোটেলের। থার্ড ফ্লোর। রুম নাম্বার—সেভেন। ঠিকানাটা আগে লেখা হয়েছিল বলে মনে হল প্রেমার। কারণ ওটা ফেল্ট পেনের কালিতে লেখা নয়।

কার্ডখানা যত্ন করে ব্যাগের ভেতর ভরে নিল প্রেমা। এই মুহূর্তে একটা অসাধারণ প্রেরণা উত্তেজক সুরার মত তার বিধ্বস্ত মনটাকে জাগিয়ে তুলল।

প্রেমা নিজেকে সাজাতে বসল। বেশ কিছু সময় পরে তার পারফরমেন্স। তাই সময় নিয়ে ধীরে ধীরে ভারতনাট্যমের নর্তকীর ভূমিকায় সাজল সে। সাহায্যকারিণী এল। রক্তজবা রঙের শাড়ী বিশেষ ভঙ্গীতে পরা হল। বেণীবদ্ধ কেশগুচ্ছ সাজান হল গোলাপী আভার ফুলে। মুক্তোর ঝুরি দেওয়া সিঁথিমৌর আর কর্ণাভরণ সুদৃশ্য সোনার ব্রোচ দিয়ে আটকান হল

কেশকলাপের সঙ্গে। তিলকে চর্চিত হল ললাট। পদচিত্রণ পূর্বাহ্ণেই সাঙ্গ করে রাখা হয়েছিল। তার ওপর বাঁধতে লাগল নূপুর। বাঁধতে গিয়ে হাতখানা একবার স্থির হয়ে গেল প্রেমার। ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসির রেখা ফুটে উঠল। রোশেনারার সৌভাগ্য তার দেবনের হাতের স্পর্শ পেয়েছে। হঠাৎ সমস্ত শরীরটা পরণের রক্তাম্বরের মত জ্বলতে লাগল। মুখে ফুটে উঠল স্থলপদ্মের রক্তোচ্ছ্বাস। ঈর্ষার কাঁটার মাঝখানে যেন ফুটে রয়েছে একটি গোলাপ।

পরক্ষণেই অনুশোচনায় ভরে উঠল প্রেমার মন। ছিঃ ছিঃ এত ক্ষুদ্র সে। যদি দেবনের মনকে রোশেনারা কিংবা সুদর্শনা আকর্ষণ করতে পারে তাহলে সেটা নিশ্চয় তাদের ক্ষমতারই পরিচয়। সে যদি এ ক্ষেত্রে ওদের কাছে হার মানে তাহলে ঈর্ষা দিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে যাবার মত ক্ষুদ্রতা আর কিছুতে নেই।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া সরে গেল প্রেমার মুখের ওপর থেকে। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটা উদার প্রসন্নতা। কিছু পরেই মনের ভেতর থেকে উঠে আসতে লাগল সর্বজয়ী একটা ভাব। আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে উদ্বোধিত হল প্রেমা মেনন।

দুটো নাচ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। শিল্পীরা সম্বর্ধিত হয়েছে করতালি-ধ্বনিতে। কোন কিছু কিন্তু কানে এসে পৌঁছয়নি প্রেমার। সে এতক্ষণ ডুবেছিল নানা চিন্তার আবর্তে। ইতিমধ্যে পরে গেছে ড্রপ সীন।

সরিতা ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুই এখনও বসে। ওদিকে সারা স্টেজ তোলপাড় করে তোকে খোঁজা হচ্ছে। সংগতকারীরা সব বসে গেছে মঞ্চে। এখুনি ঘণ্টা পড়বে। বেরিয়ে আয় চটপট। আমি চললাম। সোল্লু-কুট্টুর বোল তুলতে হবে।

সরিতা বেরিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়াল প্রেমা। নিজেকে মনে হল বহু যুগ-পূর্বের অপূর্ব স্থাপত্য খচিত কোন মন্দিরের দেবদাসী। নাটমণ্ডপের চারদিকে জ্বলছে নিলা ভিলাক্কু। বসে আছেন পুরোহিত পারিষদ পরিবৃত তরুণ রাজা। আলোছায়ার রহস্যময় অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে সে নর্তকীর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি হলেই মঞ্জীরের ঝঙ্কার তুলে এগিয়ে যেতে হবে নাটমণ্ডপের দিকে। তরুণ রাজার সঙ্গে হবে তার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়।

ঘণ্টা বেজে উঠল। প্রেমা বিদ্যুৎচালিতের মত গিয়ে দাঁড়াল স্টেজের ওপর। বেজে উঠল মৃদঙ্গ মন্দিরা তিস্রম মিশ্রম তালে। সরিতার গলায় শুরু হয়ে গেছে

সোল্লু-কুট্টুর বোল। উঠে যাচ্ছে আরব সাগরের মত নীল তরঙ্গিত ক্লীন। দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা ঈষৎ বিযুক্ত পায়ে জানু দুটি বহির্ভাগে নত ও প্রসারিত করে। যুক্ত কর সুশোভিত মস্তকের ওপরে নমস্কারের মুদ্রায় স্থাপিত। অধরে বিশ্বজয়ী হাসির রেখা।

প্রেমার উপস্থিতি যে দর্শকচিত্তের আলোড়ন তা বোঝা গেল করতালির অভিনন্দনে।

বোলের সঙ্গে সঙ্গে স্থির দৃষ্টিতে এল স্পন্দন। যুগল ভ্রূ-লহরী লীলায় ওঠা-নামা করতে লাগল। স্কন্ধের ওপর মুখমণ্ডল দক্ষিণ থেকে বামাবর্তে ধীরে ধীরে হতে লাগল আন্দোলিত।

ভাবনৃত্যনাট্যমের সূচনা অংশ আলারিপ্পু। কুঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠার প্রথম পর্ব। অর্থও তার তাই।

প্রেমা যেনন তার নৃত্য আর মূক অভিনয়ের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

আলারিপ্পুকে অনুসরণ করে এল যতিস্বরম্। তালসংযোগে রাগভিত্তিক স্বরলিপি।

প্রেমা এখন বিশুদ্ধ মুদ্রায় নেচে চলেছে। নয়ন চরণ স্কন্ধ বাহু চকিত আন্দোলিত হচ্ছে। বায়ুতাড়িত নারিকেল পত্র প্লাবিত জ্যোৎস্নার নৃত্যলীলা ফুটে উঠছে চোখের সামনে।

প্রেমা যেনন শুদ্ধ নৃত্যভঙ্গীমায় শ্রেষ্ঠ ভাস্করের তৈরী এক শিল্প-প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

এবার এল সঙ্গীত। সঙ্গীতের কথাবস্তু অনুসরণে চলল অভিনয়। সম্পূর্ণ নতুন নৃত্যভঙ্গীমা। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে শিল্পীর পদচারণা। ভ্রূকুতে নয়নে নব নব মুদ্রার প্রকাশ। ওষ্ঠে অকথিত বাণীর কম্পন। সঞ্চালিত গ্রীবায় অভিনয়ের নিপুণ প্রকাশ। ভাব রাগ আর তালের এ যেন ত্রিবেণী সংগম।

শেষ হল শব্দম্। এল বর্ণম্। শব্দম-এর পরিপূর্ণ প্রকাশ বর্ণমে। আকুল অভিনয়ে ব্যাকুল দেহ। দমকে দমকে বর্ষার বারিধারা ঝরে ঝরে পড়ছে। অমনি চমকে ফুটে উঠছে যুথি, কেতকী কদম্ব। গানের কথা আসছে বর্ষা ধারার মত। প্রেমার দেহের মুদ্রায় সে কথা মুকুলিত পুষ্পিত হয়ে উঠছে।

স্তব্ধগৃহ। স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি দর্শককুল।

প্রেমা এবার মদনের ভূমিকায়। বাম চরণ বাম বাহু সম্মুখে প্রসারিত। দক্ষিণ কর ধনুর জ্যা আকর্ষণের মুদ্রায় স্থাপিত। সমস্ত আননে নয়নে

বিশ্ববিমোহন হাসির রেখা। পুষ্পশর সন্ধান করছে প্রেমের দেবতা অনঙ্গ লীলায়।

একি ! নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে যায়। তালভঙ্গ হতে চলেছে। প্রেমা যেমন স্থির। লক্ষ্য ভেদে উদ্যত। সামনে দর্শক আসনে বসে আছে গ্রীক শিল্পী মাইরন। হাতে তার স্কেচের পেন স্থির হয়ে গেছে। দৃষ্টি তার প্রেমার অচঞ্চল আঁখিতে নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত দুই শিল্পীর দৃষ্টিসংগম থেকে বাস্তব বিশ্ব বিলুপ্ত।

নাচ শেষ হয়ে গেছে। প্যালেস হোটেলের অডিটোরিয়াম থেকে চলে গেছে শেষ উৎসাহী দর্শকটিও। অভিনন্দনের পালা চুকেছে। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে 'সঙ্গম' গোষ্ঠীর শিল্পীরা অভিবাদন করেছে দর্শকদের। করতালি আর সাধুবাদে শব্দিত হয়েছে প্রেক্ষামঞ্চ।

একক শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী দর্শককে সবিনয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ হল গোষ্ঠীর নাচ। এখানে একের উৎকর্ষের স্থান নেই। প্রশংসা যদি কিছু থাকে সে সকলেরই প্রাপ্য।

কর্মীরা নাচের সকল সরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে গেছে কোভালম হোটেলে। শিল্পীরা চলে গেছে দেবনের সঙ্গে। সরিতা ঘরে ফেরার আগে প্রেমার কাছে এল। গ্রীনরুমের ভেতর একটি সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল প্রেমা। এই নাট্যকাহিনীর সব চেয়ে বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল তার ভূমিকা। সারা দিন উপবাস করে আছে সে। অসম্ভব মানসিক শক্তি ছাড়া অভুক্ত অবস্থায় বোধকরি এত বড় একটা পারফরমেন্স সম্ভব নয় কারু পক্ষে। প্রেমার মনোবল চিরদিনই সাধারণের চিন্তার বাইরে।

সরিতা বলল, তুই কি এখন ফিরবি আমার সঙ্গে ?

একটু বসতে দে। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।

জানিস দিদি, সেই বিদেশী আর্টিস্ট তোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল আমরা যখন ওদের কফি সার্ভ করছিলাম।

প্রেমার চোখ দুটো ঝলকে উঠল।

সরিতা আবার বলল, কিন্তু তোরাই তো নিয়ম করেছিলি কোন একক শিল্পীর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হবে না, তাই ওকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রেমা উঠে সোজা হয়ে বসে বলল, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে !

তাইতো হল। দেবন হাতজোড় করে অক্ষমতা জানিয়ে ফিরিয়ে দিলে।

দেবন ফেরাল !

তার অপরাধ কি বল। পরিচালক হলেও নিজেদের তৈরী নিয়ম তো সে আর ভাঙতে পারে না।

প্রেমা আবার সোফায় এলিয়ে দিল দেহ। এই মুহূর্তে তার চোখের ওপর ভেসে উঠল সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মূর্তি। দেহের প্রতিটি রেখায় দীপ্ত পৌরুষের সঙ্গে আশ্চর্য কমনীয়তার মিশ্রণ।

প্রেমা সরিতাকে বলল, আজ আমি নাও ফিরতে পারি। হয়ত মিঃ পিল্লাই-এর সঙ্গে একবার যোগাযোগ করতে হতে পারে। তুই চলে যা। দারুণ খাটুনী গেছে তোর আর ইন্দ্রর ওপর দিয়ে।

সরিতা বলল, তোরও তো ক্লান্তির শেষ নেই।

ও কিছু নয়। দু-চারটে দিন বিশ্রামের ভেতর থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। গুণীজনের সাধুবাদ হল সঞ্জীবনী সুরা। ঐ টনিকেই দেখিস দু-এক দিনের মধ্যে সবাই তাজা হয়ে উঠবে।

সরিতা চলে যেতেই অডিটোরিয়ামের ফোনটা হাতে তুলে নিল প্রেমা। এক্সচেঞ্জকে বলল, থার্ড ফ্লোর—রুম নাম্বার সেভেন।

প্রেমার গলাটা কেন জানি না একটু কেঁপে গেল।

রুম নাম্বাব সেভেন থেকে কথা ভেসে এল।

প্রেমা বলল, আমি প্রেমা মেনন কথা বলছি অডিটোরিয়াম থেকে। তোমার অপূর্ব কার্ডের জন্যে ধন্যবাদ।

ওপার থেকে মাইরন বলল, তোমার ফোনের জন্য ধন্যবাদ। ইণ্ডিয়াতে এসে তোমার নাচ না দেখলে আমার দেশ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

প্রেমা নূপুরের ঝঙ্কারের মত হাসি ছড়িয়ে বলল, এটা কি নর্তকীর পাওনার অতিরিক্ত উপহার নয়?

মাইরন বলল, নানাভাবে বলেও কিন্তু তোমার নাচের উপযুক্ত কমপ্লিমেণ্ট দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রেমা বলল, তোমার অডিটোরিয়ামে বসে আঁকা ছবি আমাকে বিস্মিত করেছে।

আমি তোমার শরসন্ধানের ছবিটা নিয়ে পড়েছি। রাতের ভেতরেই শেষ করে ফেলতে হবে।

প্রেমা বলল, এত তাড়া কিসের?

মর্ণিং-এর ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি। তার আগে শেষ করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছে। দেখা যখন হল না।

এই মুহূর্তে তোমার হাতের তুলির কাজ দেখতে আমার দারুণ ইচ্ছে করছে। চলে এস। এক্ষুনি। অবশ্য যদি তোমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে।

প্রেমা বলল, রাতের মত এখন আমার ছুটি। আসছি তোমার রুমে।

ফোন ছেড়ে দিল প্রেমা কিন্তু সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল না। উত্তেজনায় এখন কাঁপছে তার সারা শরীর। সেই অ্যাপোলো মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাকে। তার রোমাঞ্চকে সে কেমন করে ঢেকে রাখবে। এ কি যোগাযোগ তার জীবনে। এমন ক্ষণিকের অতিথিকে সে বিনিময়ে কিই বা দিতে পারে।

এক সময় মনে হল থাক কাজ নেই গিয়ে। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ যাদের তাদের কাছে যাওয়া মানেই দুঃখ পাওয়া।

আবার মনে হল এ আকর্ষণকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি তার।

উঠে দাঁড়াল প্রেমা মেনন। এক অদৃশ্য শক্তি তাকে টানছে। তার সমস্ত দেহের অণুতে পরমাণুতে সে টান এসে পৌঁছেছে। চাঁদের অদৃশ্য টানে ফুলে ফুলে উঠছে সারা আরব সাগরের প্রতিটি জলবিন্দু।

প্রেমা মেনন অডিটোরিয়াম পেছনে ফেলে জয়কিষণের দেওয়া কাশ্মিরী শাল খানায় যদ্দুর সম্ভব নিজেকে ঢেকে বিশাল প্যালেস হোটেলের থার্ড ফ্লোরে সাত নম্বর রুমের সামনে এসে দাঁড়াল।

না, প্রেমা মেনন এখন একটুও দুর্বল নয়। জীবনে সে সুযোগ এলেই করেছে বিজয়িনীর ভূমিকায় অভিনয়। অপরিচিত চরিত্রের মুখোমুখি হওয়াতেই তো তার আনন্দ। আশ্চর্য এক আবিষ্কারের উত্তেজনা রয়েছে এর ভেতর।

প্রেমা কলিং বেলে হাত দিল।

দরজা খুলে যেতেই প্রেমা ঢুকল। আবার ভেতর থেকে দরজা আপনি লক হয়ে গেল।

শিল্পী মাইরন প্রেমার হাতে নাড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

সোফায় পাশাপাশি বসল দুজনে।

প্রেমার চোখ পড়ল সামনে। একটা ইজেলের ওপর ছবি আঁকা রয়েছে। ছবিটি আকারে খুব ছোট নয়। নীচে আর একখানা ছোট্ট কার্ড পড়ে। প্রেমা কৌতূহলী হয়ে উঠে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে ছোট্ট কার্ডখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। তারই ছবি। প্রেমের দেবতা মদনের ভূমিকায় ধনুতে শর সংযোগ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাশের বড় ছবিটি ওরই অনুকরণে আঁকা.ব ও! শুধু স্কেচ করা হয়েছে রঙ পড়েনি এখনও। কার্পেটের ওপর রঙের সরঞ্জাম। তুলি,

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কখন মাইরন। ছবি দেখা শেষ করে ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে প্রেমা। চমকে তাকাল সেই অ্যাপোলো মূর্তির দিকে।

মাইরনের চোখের দৃষ্টি গভীর। মুখে অদ্ভুত আকর্ষণীয় হাসি। প্রেমার চোখ দুটো যেন চুম্বকের টানে মাইরনের মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল।

সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত। প্রেমা চোখ নামাল।

মাইরন বলল, ভারতীয় মেয়েদের চোখের এক্সপ্রেশান যে এত সুন্দর তা আমার জানা ছিল না।

প্রেমা অমনি একমুখ হাসি হেসে বলল, গ্রীকরা সুন্দর কিন্তু এত সুন্দর তা তোমাকে না দেখলে বোঝা যেত না।

প্রেমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মাইরন। প্রেমা মাইরনের প্রায় অনাবৃত হাতখানা স্পর্শ করে রোমাঞ্চিত হল। মাইরন আর প্রেমা হাত ধরাধরি করে এসে বসল সোফার ওপর।

প্রথম কথা বলল মাইরন, আমি এদেশে আসার আগে শুনেছিলাম ভারতীয় মেয়েরা ভীষণ সাই।

প্রেমা অমনি কথাটা শেষ করল, আমাকে দেখে তোমার-সে ধারণা পাল্টে গেছে—তাই তো?

মাইরন প্রেমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ধরে থাকা হাতখানাতে আলতো করে চাপ দিল।

প্রেমা আবার বলল, কথাটা তুমি প্রায় ঠিকই শুনেছ। তবে ভারতীয় মেয়েরা একবার যাকে মনে মনে বন্ধু বলে মেনে নেয় তার কাছে তাদের কোন সঙ্কোচই থাকে না।

মাইরন আবার প্রেমার হাতে চাপ দিল। বলল, আমি সৌভাগ্যবান বলে ভাবতে পারি মিস মেনন কারণ তুমি বন্ধু বলে আমার হাতে হাত মিলিয়েছ।

প্রেমা রহস্যময় চোখে মাইরনের দিকে চেয়ে হাসল।

মাইরন হঠাৎ বলল, তুমি যে ঐ তীর ছোঁড়ার অভিনয়টা করলে এর অর্থ কি?

প্রেমের দেবতা মদনের পাঁচটি শর আছে। ঐ শর যার হৃদয় লক্ষ্য করে ছোঁড়া হবে তারই হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে ফুটে উঠবে ভালবাসার রক্ত গোলাপ।

মাইরন অমনি বলল, তোমার ঐ অলক্ষ্য তীরগুলো কাকে নিশানা করে ছুঁড়েছিলে প্রেমা?

যে আছে তারই দিকে নিশানা করেছিলাম।

মোহিনী

সে নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান।

প্রেমার মুখে মিষ্টি হাসি। বলল, জানি না কে ভাগ্যবান। যে বাণ ছুঁড়েছে সে না যার হৃদয়ে বাণ বিঁধেছে সে।

মাইরন বলল, তুমি বিদুষী। কথা বলতে জান।

জলতরঙ্গের মত বেজে উঠল প্রেমার হাসি।

তোমার মত সমঝদার পেলে আমার যে কোন বিষয়ে প্রশংসাপত্র পেতে একটুও কষ্ট হবে না।

মাইরন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে একটা অনুরোধ করব ?

বল।

একবার এই পোশাকেই তুমি দাঁড়াবে ঐ শর নিক্ষেপকারীর ভঙ্গীতে; তোমার চোখ আর ঠোঁটের এক্সপ্রেশানটা আর একবার দেখে নিতে চাই।

প্রেমা খুলে ফেলল গায়ে জড়ানো শালখানা। মুণ্ডি না পরে সাদা একখানা শাড়ী পরে এসেছিল সে। শাড়ীর আচল ভাল করে কোমরে জড়িয়ে নিল সী-গ্রীন রঙের অম্বরখানা শুধু রইল প্রেমার উর্ধ্ব অঙ্গ আবৃত করে। প্রেমা আবার সেই নৃত্যের মুদ্রায় ধনুতে শর সংযোগ করল। প্রেমার দৃষ্টিতেও সেই অব্যর্থ লক্ষ্য শরের ছবি ফুটে উঠেছে। অধরের হাসিতে লক্ষ্য ভেদের সুনিশ্চিত প্রত্যয়।

মাইরন স্কেচের ছবিতে দরকারী রেখাগুলো টেনে নিল।

একসময় বলল, আমার প্রয়োজন মিটে গেছে। এখন বস সোফায়। আমি খুব দ্রুত ছবি আঁকতে পারি। রঙ দেওয়া হয়ে গেলে তোমাকে ডাক দেব। তখন ঠিক ঠিক বিচার করতে পারবে।

প্রেমা পিছু হটে আবার এসে বসল সোফায়। সাদার ওপর সারা জমিতে পিঙ্ক ফুল আর পাতার কাজ করা শালখানা গায়ে জড়িয়ে নিল। মাথায় তুলে নিল শালের খানিক অংশ ঘোমটার আকারে। প্রেমা মেননের মুখখানা একটা আধফোটা ম্যাগনোলিয়া ফুল হয়ে গেল।

ছবিতে বেশ কিছু সময় মগ্ন হয়ে রঙ তুলির কাজ করল মাইরন। প্রেমা বসে বসে চিত্রকর মাইরনকে দেখতে লাগল।

কত বয়েস হবে মাইরনের ? কোন মতেই সাতাশের বেশী নয়। সাইড থেকে ওর প্রোফাইলখানা আরও সুন্দর। আচ্ছা ও কি কোন মেয়েকে ভালবাসেনি ? নিশ্চয়ই। আর ওর না বেসে উপায় আছে। মেয়েরাই কি এমন অ্যাপোলো মূর্তিকে স্পর্শ না করে ছেড়ে দেবে ? কালই চলে যাবে ও! কদিন আগে কেন পরিচয় হল না ওর সঙ্গে। ..র। হৃদয়

কথাগুলো মনের ভেতর নাড়াচাড়া করতে করতে একসময় বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল প্রেমার।

এমনি একজন শিল্পীকেই তো তার জীবনের সঙ্গী করতে চেয়েছে সে। একজন নৃত্যশিল্পী অন্যজন চিত্রশিল্পী। প্রেমা নাচবে আর মাইরন আঁকবে সে নাচের ছবি। চারদিকের গুণী সমঝদারেরা বলবে, আশ্চর্য যুগলবন্দী।

মাইরনের কথায় ধ্যান ভাঙল প্রেমার।

কতখানি সময় আর তুমি আমাকে দিতে পারবে মেনন?

অফুরন্ত।

আচমকা কথাটা বলে ফেলেই প্রেমা সোফায় নড়েচড়ে বসল।

মাইরন ছবির থেকে মুখ তুলে তাকাল প্রেমার দিকে।

বলল, এত অঢেল সময় তোমার হাতে আছে মেনন?

প্রেমা বলল, শিল্পীর কাছে বসে বসে তার সৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকাও তো একটা কাজ। আমার সময়টাকে এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারলেই আমি খুশী হই।

মাইরন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমার কাছে এগিয়ে এল। অনেক সময় ধরে গভীর চোখে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

প্রেমা একসময় বলল, কি দেখছ এমন করে?

তোমার এমনি বসে থাকার ছবিখানা আমি মনের ভেতর এঁকে রাখলাম। দেশে ফিরে গিয়েই রূপ দেব।

প্রেমা বলল, তুমি আমার সব কিছুতেই যেমন সুন্দর দেখছ তাতে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কিসের সন্দেহ?

আমি সত্যিই সুন্দর কিনা।

মাইরন বলল, অন্যের চোখ কি বলবে জানি না তবে আমার চোখ যে তোমার দিকে তাকিয়ে বারে বারে তৃপ্তি পাচ্ছে একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

প্রেমা বলল, আমার এই বসে থাকার ছবি যখন আমি কোনদিনও দেখতে পাব না তখন এর ভালমন্দ বিচারের ভার তোমার।

মাইরন আবার প্রেমার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় ধরে নিয়ে বলল, ভারতের মন্দিরের ভাস্কর্য আর নর্তকী মেনন আমার চোখে অভিন্ন। দুটিকেই আমি সমান বিস্ময় আর আগ্রহ নিয়ে দেখেছি।

প্রেমা মাইরনের দুটো হাত মাথায় ঠেকিয়ে আবার বুকের কাছে ধরে রেখে বলল, ও কথা বল না মাইরন। ভারতের ভাস্কররা মন্দিরে মন্দিরে যে মূর্তি সৃষ্টি করেছে তার তুলনা পাওয়া ভার। তাদের মুখের এক্সপ্রেশানগুলোর দিকে শুধু লক্ষ্য করে যাবে। জীবনের গভীরে এমন কোন দুঃখসুখের অনুভূতি নেই যা তাদের সৃষ্টির রেখায় ফুটে ওঠেনি। আমার অভিনয়ে আমি সেইসব অনুভূতির কতটুকুইবা ফোটাতে পেরেছি মাইরন।

তোমার কথা হয়ত ঠিক কিন্তু নাচের সময় তোমার দেহের নানা ফর্ম আর নানা ধরনের এক্সপ্রেশান শিল্পীর চোখ নিয়ে আমি গভীর আগ্রহে দেখেছি মেনন। শিল্পীর সাবজেক্ট হিসেবে তুমি যে কত বড় সম্পদ নিজের ভেতর ধরে রেখেছ তা তুমি জান না।

প্রেমা নত মুখে বসে রইল। এ তার প্রাপ্য কি প্রাপ্যের অতিরিক্ত তা সে বুঝতে পারল না।

মাইরন যে দারুণ মুডি তা বোঝা গেল যখন সে প্রেমাকে বলল, তুমি মাথায় ঐ শালের ব্যাপারখানা তুলে যেমন বসেছিলে তেমনি একটু বসবে কি? আমি তোমার একটা স্কেচ করে নেব। স্মৃতি খুঁড়ে আঁকতে গেলে ঠিক এমনটি তো আর পাওয়া যাবে না।

প্রেমা হাসি ছড়িয়ে বলল, হেরে গেলে তো। তাও বা কি করে বলি। বরং বলব, তোমার মনের গভীরে রেখা ফেলার মত ক্ষমতা আমার নেই। তাহলে স্মৃতি থেকে যা আঁকতে তাই সত্য হত।

মাইরন হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। সে প্রেমার মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে বসে শালখানা প্রেমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে মাথার খানিক অংশ ঢেকে দিলে। অসংকোচে প্রেমার মুখখানা দু-হাতের পাতায় চেপে ধরে ডানদিকে একটুখানি কাৎ করে প্রেস করল। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে নিজের মাথাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

প্রেমা যেন একটি পুতুল। বুকে আর গলার কাছে শালের সুন্দর নিটোল কটি ফোল্ড। মুখখানা অতি নিপুণ হাতে দক্ষ কোন পুতুল-শিল্পী যেন তৈরী করেছে। আর আশ্চর্য! প্রেমা তাকিয়ে আছে মাইরনের দিকে মুগ্ধ চোখে। পাতাটি পড়ছে না, তারাটিও নড়ছে না।

মাইরন কতক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার তোমাকে অবিকল এঁকে নিতে আমার একটুও ভুল হবে না মেনন।

প্রেমা বলল, কথাটা শুনে ভাল লাগল কিন্তু তোমার পরীক্ষা নিতে চাই মাইরন।

মাইরন বলল, পরীক্ষা? কিসের?

আমার দিকে না চেয়ে তুমি এখুনি স্কেচ করে দেখাতে পারবে?

ও এই কথা।

মাইরন আর একবারও তাকাল না প্রেমার দিকে। একখানা ইজেলে সে তন্ময় হয়ে স্কেচ করতে বসে গেল।

প্রেমা তেমনি গায়ে চাদরটি জড়িয়ে চুপচাপ বসে রইল। সারা দিনের উপবাস, এত বড় দীর্ঘ ব্যালেতে অংশ নেওয়া সবকিছু ক্লান্তি তাকে এখন একটা অলস স্বপ্নের জগতে এনে ফেলল। সে যেন ইচ্ছে করলেও আর কোথাও যেতে পারবে না। কোন এক যাদুকর যেন তাকে মন্ত্রের গণ্ডী দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে। সেই যাদুকরটি সামনে বসে সাদা ইজেলের ওপর কিসব আঁকিবুকি কেটে চলেছে। এক আশ্চর্য রহস্যময় যাদুকর বলে মনে হচ্ছে তাকে। কতক্ষণ পরে প্রেমার মনে হল ঐ মানুষটি উঠে দাঁড়াল। আর অমনি জানালার নীচে আরব সাগর থেকে উঠে এল একটা দমকা হাওয়া। সমস্ত দেয়ালগুলো তাসের ঘরের মত উড়ে যাচ্ছে। একটা তুফান থৈথৈ করে এগিয়ে আসছে প্যালেস হোটেলের সংলগ্ন পাহাড়ের চূড়া লক্ষ্য করে। তারপর! প্রেমা দেখতে পাচ্ছে ঐ ঢেউ-এর মাথায় একটা হলুদ রঙের নৌকো। ঐ নৌকোটা এসে মন্ত্রের জোরে থেমে গেল একেবারে ওদের পায়ের কাছে। একি! যাদুকর তাকে বুকে তুলে নিয়ে উঠে পড়ল সেই নৌকোয়। তারপর ঢেউয়ের ভেতর গভীর থেকে অনেক গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল তারা। কানে এসে বাজতে লাগল সারা সাগর জুড়ে অদ্ভুত এক ঘুম পাড়ানিয়া গান।

রাত কত? না ভোর হয়ে এসেছে? ঐ তো অস্পষ্ট গ্রীন বাল্বটা রহস্যময় আলো ছড়াচ্ছে। প্রেমা আচ্ছন্ন আবছায়ার ভেতর থেকে চৈতন্যের জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগল।

সামনের টেবিলে বিয়ার আর হুইস্কির বোতল। পানপত্র তেমনি পড়ে। প্রেমার একটু একটু মনে পড়ছে সে মাইরনের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করেছিল। ঐ তো টিপয়ের ওপর রাখা তারই শাল মুড়ি দেওয়া ছবিখানা।

মনে পড়ছে এখন। স্পষ্ট মনে পড়ছে। মাইরন ছবিখানা এঁকে তার

সামনে তুলে ধরে বলেছিস, মিলিয়ে নাও। আচ্ছা ছবিখানা ধর আমি আসছি।

বলেই মাইরন একখানা আয়না এনে তার মুখের সামনে ধরে রেখে বলেছিল, এবার মিলিয়ে নাও ভাল করে।

বিস্ময়ে কতক্ষণ কথা ছিল না প্রেমার মুখে। শুধু বলেছিল, তুমি অসাধারণ মাইরন।

মাইরনও বলেছিল, তুমি অসাধারণ প্রেমা।

কেন মাইরন?

তুমি সামান্য হলে ছবি অসামান্য হয় কি করে?

প্রেমা কোন কথা আর না বলে, ছবির দিকে না তাকিয়ে শুধু চেয়েছিল মাইরনের মুখের দিকে।

মাইরন ছবিখানা টিপয়ের ওপর প্রেস করে বলেছিল, এস এখন একটু ড্রিঙ্ক করা যাক। আপত্তি আছে নাকি?

প্রেমা মাইরনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুধু মাথাটা নেড়েছিল। অবসাদে তার শরীর তখন নরম সোফার ভেতর ডুবে গিয়েছিল।

মাইরন টেবিলে বোতল আর গ্লাস সাজিয়ে ডাক দিয়েছিল প্রেমাকে। প্রেমা ওঠেনি। সে শুধু বাড়িয়ে দিয়েছিল তার হাতখানা। মাইরন উঠে এসেছিল। প্রেমাকে হাত ধরে তুলে আবার হাতের বেষ্টনে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল।

ওরা দুজনে বসে বসে ড্রিঙ্ক করেছিল কত রাত ধরে।

তারপর! তারপর বিশেষ কিছু মনে নেই প্রেমার। একটা স্বপ্নচালিতের মত সে মাইরনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। মাইরনের উত্তপ্ত একটা প্রস্তাব শুনে সে কতক্ষণ ধরে দ্রুত হারমোনিয়াম বাজানোর মত হেসেছিল। তারপর হঠাৎ হাসি থামতেই কেমন যেন কান্না পেয়ে গিয়েছিল তার। সে দুটো হাতের পাতায় চোখ চেপে ধরেছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটু আগের দেখা স্বপ্নের যাদুকরের মত মাইরন তাকে বুকে ভরে নিয়ে সমুদ্রের অনেক গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল।

প্রেমা মুখ ফিরিয়ে দেখল মাইরন তখনও ঘুমিয়ে।

পশ্চিমের জানালায় চোখ আটকে গেল প্রেমার। পাহাড়টা যেখানে সমুদ্রে

নেমেছে সেখান থেকে আকাশের নীল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো নারকেল গাছ। শেষ রাতের পূর্ণ চাঁদটা তখন পাণ্ডুর হয়ে নারকেল পাতার ঝালরের প্রান্তটুকু ছুঁয়ে আছে। এর পরেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে অথৈ সমুদ্রের বুকে।

প্রেমার সারা বুক ঠেলে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত কান্না উঠে আসতে লাগল। সে বিশ্লেষণ করে জানতে চাইল না, কেন তার এই কান্না।

প্রেমা এক সময় অতি সন্তর্পণে মাইরন-এর দিকে চোখ রেখে উঠে দাঁড়াল। বিস্রস্ত পোশাকগুলো যদ্দূর সম্ভব ঠিক করে নিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ইজেলের দিকে। একটা স্কেচের প্যাড আর পেন্সিল পড়েছিল। হাঁটু গেড়ে বসে লিখতে লাগল।

বিদেশী বন্ধু, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি যখন জেগে উঠে আমাকে খুঁজবে তখন আমি অনেক দূরে। তোমার দস্যুতার চিহ্ন মুছে যাবে কিন্তু তোমার এই ছবির স্মৃতি হয়ত জন্মান্তরেও মুছে ফেলতে পারব না। তোমার ভোরের যাত্রা শুভ হোক।—প্রেমা।

নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্রেমা। প্রশস্ত করিডোর পার হয়ে নীচে নেমে এল। সামনে নারকেল গাছের তলায় খড়ে ছাওয়া দুটো কিয়স্ক। পূর্ণিমার চাঁদ একেবারে পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। তার অস্পষ্ট আলোয় গোলাকার কিয়স্ক রহস্যাবৃত। প্রেমা দাঁড়াল তার তলায়। সমুদ্র থেকে রাত শেষের হাওয়া ঝলকে ঝলকে উঠে আসছে। তীরে ঢেউ-এর আছড়ে পড়ার শব্দ। নারকেল পাতার হঠাৎ হঠাৎ বেজে ওঠা। সব মিলিয়ে প্রেমার অর্ধচেতন মনের কাছে একটা কিসের যেন আমন্ত্রণ পৌঁছে দিল।

প্রেমা সোজা বালি ভেঙে সমুদ্রের দিকে নেমে গেল না। সারা প্যালেস হোটেলের দরজা জানালাগুলো চোখের মত চেয়ে আছে। সে এই মুহূর্তগুলোতে নিজেকে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখতে চায়। প্রেমা সামনের কটেজগুলোর পেছনের সরু রাস্তা ধরে ছুটে চলল। উঁচুনীচু পাথুরে পথ। নারকেল অরণ্যের ছায়ায় অস্পষ্ট। অভ্যস্ত পথে প্রেমা দ্রুত পা ফেলে চলেছে। মানসিক উত্তেজনায় কাঁপছে পা দুটো। দু-তিনবার আছাড় খেয়ে পড়ল প্রেমা।

ডানদিকের নারকেল বাগানের ভেতর ক'ঘর সাধারণ মানুষের বসতি। ছোট শিবমন্দির। বাঁধান একচিলতে পুকুর। কটি মেয়ে মাঝরাত থেকে স্নানে নেমেছিল। বাহুর আঘাতে চঞ্চল করে তুলেছিল জল। এখন তারা

গান গাইতে গাইতে ভিলাক্কু জ্বালিয়ে শিবমন্দিরে পূজো দিতে চলেছে। তিরু আদিরায় ব্রত উদ্‌যাপনের গান।

ধনুমাসত্তিল তিরু আদিরা
ভগবান তণ্ডে
তিরুণাল্ আণ।
ভগবান তণ্ডে
তিরু নালিন নাল্।
ভগবতী কু
তিরু নোলম্বু আন।
ভগবতীড়ে
তিরু নোলম্বিন নাল্।
উন্নারুতে
উরাঙারুতে।

ধনুমাসের শুভ আদ্রা তিথি আজ। ভগবান মহাদেবের শুভ জন্মদিন। ভগবানের জন্মদিনে উপবাস করে আছেন ভগবতী পার্বতী। এদিন উপবাসের দিন। অভুক্ত থেকে জাগরণে নিশি যাপনের দিন।

প্রেমার দারুণ একটা ইচ্ছে হল সেও স্নান করে যোগ দেবে ওদের সঙ্গে পূজোয়। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হল, ঐ সামান্য কায়েলের জলে মিটবে না তার স্নানের তৃষ্ণা।

প্রেমা ছুটে চলল সমুদ্র লক্ষ্য করে। এখন সে খাড়াই একটা টিলার ওপরে আছাড খেতে খেতে উঠে দাঁড়াল। সামনে অনাবৃত সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। তীরে কিসের আক্ষেপে যেন আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে ঢেউগুলো। সেই দিগন্ত ছোঁয়া রঙ্গমঞ্চে শত শত নর্তকীর নাচের মহড়া চলেছে।

প্রেমা সমুদ্রের দিকে নিস্পন্দ চেয়ে রইল। হু হু করে বয়ে আসছে হাওয়া। চুল উড়ছে। শাড়ীর আঁচল কখন লুটিয়ে পড়েছে পায়ের তলায়।

প্রেমা এবার নেমে চলল। নির্জন সৈকতে এসে সে বালির ওপর দিয়ে জলের দিকে ছুটতে লাগল। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে তখন দাঁড়িয়ে আছে রক্তরাঙা গোলাকার চন্দ্র। এখুনি অনন্ত জলরাশির তলায় ডুব দেবে।

প্রেমা মনে মনে উচ্চারণ করল, আমি মোহিনী। অমৃত হরণ করে নিয়ে চলেছি নৃত্যের মায়ায় বিশ্বজনকে ভুলিয়ে। হে সমুদ্র তোমার অমৃত তুমি ফিরিয়ে নাও। থেমে যাক মোহিনীর মিথ্যা মায়ার খেলা।

সমুদ্রের জল ছুঁতে গিয়ে থেমে গেল প্রেমা। কে যেন পেছন থেকে এসে ধরে ফেলল তার একখানা হাত। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমা ফিরে দাঁড়াল।

দুটো বিশাল বাহুতে ততক্ষণে বাঁধা পড়েছে সে।

ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও দেবন, আমি সমুদ্রের কাছে অমৃত ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আমি আজ স্নান করে অতি সাধারণ প্রেমা হয়ে জন্ম 'নতে চাই।

তুমি জাননা প্রেমা আজ সারা দিনরাত্রি আমি অভুক্ত। মনে মনে ইচ্ছা ছিল তোমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিয়ে আজ আমার ব্রত ভাঙব।

ডুকরে কেঁদে উঠল প্রেমা। আমিও তো তাই চেয়েছিলাম দেবন। তোমার উপবাস ভাঙতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু কি হল দেবন! আমার প্রবল একটা ইচ্ছার স্রোতে সব ধ্যান ভেসে গেল।

দেবন আরও নিবিড় করে প্রেমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে নিয়ে বলল, মহাদেবের জন্মলগ্নে আমি ভূমিষ্ট হয়েছি প্রেমা, আমাকে তুমি ভোলাতে পারবে না। আমি জানি, একদিকে তুমি মোহিনী অন্যদিকে তুমি তাপসী।

প্রেমা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, বারে বারে মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে আলোড়িত হৃদয়ের অমৃত হরণ করতে আর প্রাণ চাইছে না দেবন।

দুঃখ পেওনা প্রেমা। আমি আজ সারা রাত এই নারকেল বনের ছায়ার গভীরে বসে নিজের মনকে প্রস্তুত করেছি। চাঁদের আলোয় দেখেছি তোমাকে অডিটোরিয়ামের বাইরে বেরিয়ে এসে আবার প্যালেস হোটেলের ওপরে উঠতে। আমি জেগে বসে সারাটা রাত তোমার ফেরার আশায় প্রতিটি পল অনুপল গুণেছি।

কেন, কেন তুমি বসেছিলে দেবন এ মোহিনীর জন্যে প্রতীক্ষা করে। বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে এমন অমৃত দিতে পারব না যা অন্যের স্পর্শের অতীত।

দেবন প্রেমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েও তৃপ্তি পাচ্ছিল না। সে যেন প্রেমার ভেতর একাকার হয়ে মিশে যেতে চাইছিল।

গভীর আবেগে এক সময় দেবন বলল, অমৃত কখনও কলুষিত হয় না প্রেমা। তাকে পাবার জন্যে দেবাসুর সকলেই উন্মুখ। আর সবাই যদি তোমার কাছ থেকে অমৃতের অংশ পায় তাহলে সে আস্বাদন থেকে আমিই বা কেন বঞ্চিত রইব প্রেমা?

প্রেমা আকুল হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলল, তুমি এত ভালবাস আমাকে দেবন।

দেবন প্রেমাকে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে নিয়ে বলল, ঐ দেখ চাঁদ ডুবে গেছে আর পূর্ব দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখ সূর্যের রঙীন আভা ছড়িয়ে পড়ে আকাশের নীল ছুঁয়ে। এ মুহূর্তে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না প্রেমা আমি মোহিনীর অন্তরে সঞ্চিত স্বর্ণকুম্ভ থেকে অনিঃশেষ অমৃত পান কে মৃত্যুঞ্জয় হতে চাই।

প্রেমার দেহে সোনালী সকালের আলো এসে পড়েছে। সে ধীরে ধী রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অমৃত-প্রতিমায়। তার ঠোঁটের রেখায় বিশ্ববিমোহিনী হাসি আর তার আঁখির তারায় চির তৃষাতুর প্রকৃতির সৃষ্টির আকুতি।

দেবন মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল সেই আশ্চর্য মূর্তির দিকে।

শেষ